

श्रीश्रीरामकृष्णलीलाप्रसङ्ग

द्वितीय खण्ड

गुरुभाव—पूर्वार्द्ध



श्यामी सारदानन्द



उद्घोषण कार्यालय, कलकत्ता

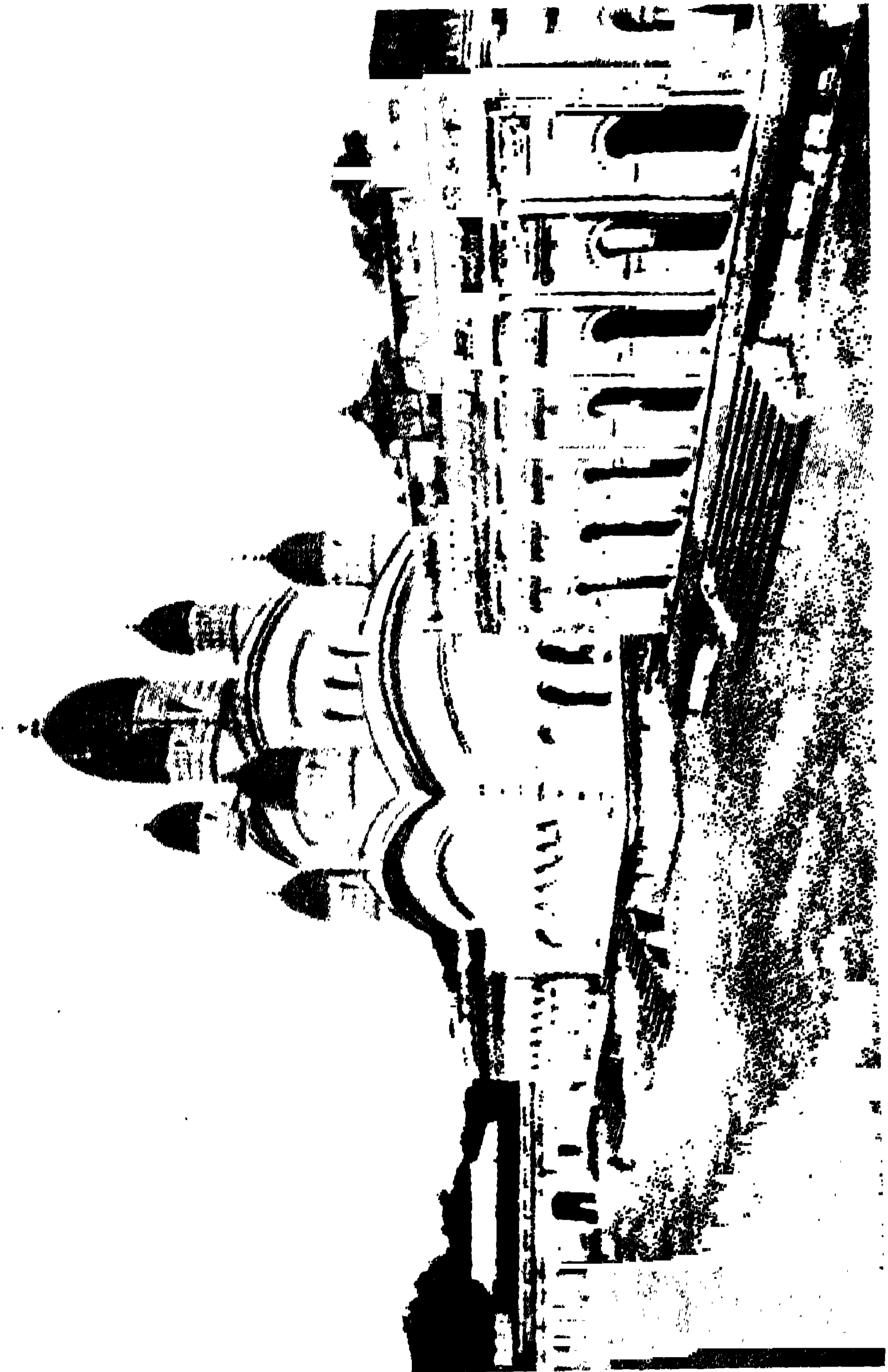
প্রকাশক
স্বামী আত্মবোধানন্দ
উদ্বোধন কার্যালয়
১, উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা—৩

মুদ্রাকর
শ্রীব্রজেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য
ইকনমিক প্রেস
২৫, রায়বাগান স্ট্রীট, কলিকাতা—৬

বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ কর্তৃক সর্বস্বত্ব
সংরক্ষিত

দশম সংস্করণ
চৈত্র, ১৩৬১

দুই টাকা আট আনা



গ্ৰন্থ-পরিচয়

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গে গুরুভাব প্রকাশিত হইল। ঠাকুরের সাধনকালের সময় হইতে বিশেষ প্রকটভাবের পূর্ব পর্য্যন্ত জীবনের ঘটনাবলীই ইহাতে প্রধানতঃ সন্নিবেশিত হইয়াছে। তবে কেবলমাত্র ঐ সকল ঘটনা বা ঠাকুরের ঐ সময়ের কার্যকলাপ লিপিবদ্ধ করিয়াই আমরা ক্ষান্ত হই নাই। যে মনের ভাবের দ্বারা পরিচালিত হইয়া, যে উদ্দেশ্যে, তিনি ঐ সকল কার্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন তাহারও যথাসম্ভব আলোচনা করিয়াছি। কারণ শরীর ও মনের সমষ্টিভূত মানবের জীবনেতিহাস কেবলমাত্র তাহার জড় দেহ ও তৎকৃত কার্যকলাপের পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুশীলনে পাওয়া যায় না। জড়বাদী পাশ্চাত্য জীবনী ও ইতিহাস লিখিতে যাইয়া প্রধানতঃ ঘটনাবলীর সংগ্রহেই দক্ষতার পরিচয় দেয় এবং আত্মবাদী হিন্দু মনোভাবের স্ননিপুণ সংস্থানেই মনোনিবেশ করে। আমাদের ধারণা, ঐ উভয় ভাবের সন্মিলনেই যথার্থ জীবনী বা ইতিহাস সম্ভবে এবং মনের ইতিহাসকে পুরোবর্তী রাখিয়াই সর্বত্র জড়ের কার্যকলাপ লিপিবদ্ধ করা কর্তব্য।

আর এক কথা, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অলৌকিক জীবন আমরা বর্তমান গ্রন্থে শাস্ত্রসহায়েও অনেকস্থলে অনুশীলন করিয়াছি; তাঁহার অসাধারণ মনোভাব, অনুভব ও কার্যকলাপের সহিত ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, শঙ্কর, চৈতন্য প্রভৃতি ভারতের এবং ঈশাদি ভারতেতর দেশের মহাপুরুষগণের অনুভব ও কার্যকলাপের তুলনার আলোচনা করিতে বাধ্য হইয়াছি। কারণ ঠাকুর আমাদের

নিকট স্পষ্টাক্ষরে বারম্বার নির্দেশ করিয়া বলিয়াছেন যে, পূর্ব পূর্ব যুগে “যে রাম, যে কৃষ্ণ (ইত্যাদি হইয়াছিল) সে-ই ইদানীং (নিজ শরীর দেখাইয়া) এই খোলটার ভিতর রহিয়াছে !”—এবং “এখানকার (আমার) অমুভবসকল বেদ-বেদান্ত ছাড়াইয়া গিয়াছে !” বাস্তবিক ‘ভাবমুখে’ অবস্থিত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন যতদূর সম্ভব নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করিতে অগ্রসর হইয়া আমাদেরকে বাধ্য হইয়াই স্বীকার করিতে হইয়াছে যে, ঈদৃশ অলৌকিক জীবন আধ্যাত্মিক জগতে আর ইতিপূর্বে দেখা যায় নাই ।

আবার পূর্ব পূর্ব অবতারসকলের মতামুগ হইয়া সকল প্রকার সাধনমার্গে স্বল্পকালেই সিদ্ধিলাভ করিয়া তিনি ‘যত মত তত পথ’-রূপ যে নূতন তত্ত্বের আবিষ্কার ও লোকহিতার্থ ঘোষণা করিয়াছেন, তদ্বিষয় আলোচনা করিয়া আমরা তাঁহাকে পূর্ব পূর্ব যুগাবিভূত সকল অবতার-পুরুষগণের ঘনীভূত সমষ্টি ও নবাভিব্যক্তি বলিয়া বুঝিতেই বাধ্য হইয়াছি । বাস্তবিক শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অদৃষ্টপূর্ব পবিত্র জীবনের আমরা যতই অনুশীলন করিয়াছি, ততই উহাকে বৈদিক সার্বজনীন ও সনাতন অধ্যাত্ম-ভাববৃক্ষের সারসমষ্টি-সমুদ্ভূত প্রথমোৎপন্ন ফলস্বরূপেই নির্দ্ধারিত করিতে বাধ্য হইয়াছি ।

শ্রীরামকৃষ্ণপদাশ্রিত পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দের ধর্মপ্রচারের পর হইতে শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনকথা জানিবার জন্য সাধারণের আগ্রহ দেখিয়া বর্তমান কালে অনেকে অনেক কথা তৎসম্বন্ধে লিপিবদ্ধ করিলেও ঐ অলোকসামান্য জীবনের সহিত সনাতন হিন্দু বা বৈদিক ধর্মের যে নিগূঢ় সম্বন্ধ রহিয়াছে, তাহা স্পষ্ট নির্দেশ করিয়া কেহই এ পর্য্যন্ত উহার অনুশীলন করেন নাই বলিলেও অত্যাক্তি হয় না । ফলে শ্রীরামকৃষ্ণদেব যেন সনাতন

হিন্দুধর্ম হইতে বিচ্ছিন্ন পৃথক এক ব্যক্তি এবং সাম্প্রদায়িক মতবিশেষেরই সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন—এইরূপ বিপরীত ধারণাই ঐ সকল পুস্তকপাঠে মনে উদ্ভিত হইয়া থাকে। আবার ঐ সকল গ্রন্থের অনেকগুলি ঠাকুরের জীবনাখ্যায়িকা সম্বন্ধে নানা ভ্রম-প্রমাদপূর্ণ এবং অপরগুলিতে ঐ সকল জীবনঘটনার প্রকৃত অর্থ এবং পূর্বাপর সম্বন্ধ ও পারস্পর্য লক্ষিত হয় না। সাধারণের তদভাব কথঞ্চিৎ দূর করিবার জন্য ঐ মহত্মদার জীবন আমাদের নিকটে যে ভাবে প্রতিভাত হইয়াছে এবং যে ভাবোপলব্ধি করিয়া শ্রীবিবেকানন্দ প্রমুখ আমরা ঠাকুরের শ্রীপাদপদে জীবনোৎসর্গ করিয়াছি, তাহারই কিছু স্বামী শ্রীবিবেকানন্দের পদানুগ হইয়া বর্তমান গ্রন্থে পাঠককে বলিবার প্রযত্ন করিয়াছি। ঠাকুরের অলৌকিক জীবনাদর্শ যদি উহাতে কথঞ্চিৎ যথার্থ ভাবেও অঙ্কিত হইয়া থাকে, তবে উহা তাঁহারই গুণে হইয়াছে; এবং যাহা কিছু অসম্পূর্ণতা ও অঙ্গহানিত্ব রহিয়া গিয়াছে, তাহা আমাদের বুঝিবার ও বলিবার দোষেই হইয়াছে, পাঠক এ কথা বুঝিয়া লইবেন। ভবিষ্যতে ঠাকুরের অমূল্য জীবনের পূর্ব ও শেষভাগের পরিচয়ও এইভাবে পাঠককে উপহার দিবার আমাদের ইচ্ছা রহিল। এক্ষণে ‘ভাবমুখে’ অবস্থিত ছুরবগাহী শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের সনাতন বৈদিক ধর্মের সহিত নিগূঢ় সম্বন্ধালোচনা করিয়া স্বামী শ্রীবিবেকানন্দ যে সূত্রগুলি নিবন্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহাই এখানে পাঠকের নয়নগোচর করিয়া আমরা গ্রন্থারম্ভে প্রবৃত্ত হই।

অলমিতি—

বিনীত

গ্রন্থকার

হিন্দুধর্ম ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

আচণ্ডালাপ্রতিহতরয়ো যন্ত প্রেমপ্রবাহঃ
লোকাতীতোহপ্যাহ ন জহৌ লোককল্যাণমার্গম্ ।
ত্রৈলোক্যোহপ্যপ্রতিমমহিমা জানকীপ্রাণবন্ধঃ
ভক্ত্যা জ্ঞানং বৃতবরবপুঃ সীতয়া যো হি রামঃ ॥
স্তকীকৃত্য প্রলয়কলিতম্বাহবোথং মহাস্তম্
হিত্বা রাত্রিং প্রকৃতিসহজামক্কতামিশ্রমিশ্রাম্ ।
গীতং শাস্তং মধুরমপি যঃ সিংহনাদং জগর্জ
সোহয়ং জাতঃ প্রথিতপুরুষো রামকৃষ্ণস্তিদানীম্ ॥^১

শাস্ত্র শব্দে অনাদি অনন্ত 'বেদ' বুঝা যায়। ধর্মশাসনে এই বেদই একমাত্র সক্ষম।

পুরাণাদি অন্যান্য পুস্তক স্মৃতিশব্দবাচ্য, এবং তাহাদের প্রামাণ্য, যে পর্য্যন্ত তাহারা ক্রমিক অমুসরণ করে, সেই পর্য্যন্ত।

- ১ প্রেমের প্রবাহ যার আচণ্ডালে অব্যাহিত।
লোকহিতে রত সদা হয়ে যিনি লোকাতীত ॥
জানকীর প্রাণবন্ধ উপমা নাহিক যার।
ভক্ত্যাবৃত জ্ঞানবপু যিনি রাম অবতার ॥
স্তক করি কুরুক্ষেত্রে প্রলয়ের হৃৎকার।
দূর করি সহজাত মহামোহ-অন্ধকার ॥
উঠেছিল সুগভীর গীতাসিংহনাদ যার।
সেই এবে রামকৃষ্ণ খ্যাতনামা ত্রিসংসার ॥

‘সত্য’ দুই প্রকার :—(১) যাহা মানব-সাধারণ-পঞ্চেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য ও তদুপস্থাপিত অহুমানের দ্বারা গৃহীত ।

(২) যাহা অতীন্দ্রিয় সূক্ষ্ম যোগজ শক্তির গ্রাহ্য ।

প্রথম উপায় দ্বারা সকলিত জ্ঞানকে ‘বিজ্ঞান’ বলা যায় ।
দ্বিতীয় প্রকারের সকলিত জ্ঞানকে ‘বেদ’ বলা যায় ।

‘বেদ’ নামধেয় অনাদি অনন্ত অলৌকিক জ্ঞানরাশি সদা বিদ্যমান ; সৃষ্টিকর্তা স্বয়ং উহার সহায়তায় এই জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করিতেছেন ।

ঐ অতীন্দ্রিয় শক্তি যে পুরুষে আবির্ভূত হন তাহার নাম ঋষি ও সেই শক্তির দ্বারা তিনি যে অলৌকিক সত্য উপলব্ধি করেন তাহার নাম ‘বেদ’ ।

এই ঋষি ও বেদদ্রষ্টৃ লাভ করাই যথার্থ ধর্মাত্মভূতি । সাধকের জীবনে যতদিন উহার উন্মেষ না হয়, ততদিন ‘ধর্ম’ কেবল ‘কথার কথা’ ও ধর্মরাজ্যের প্রথম সোপানেও তাহার পদস্থিতি হয় নাই, জানিতে হইবে ।

সমস্ত দেশ-কাল-পাত্র ব্যাপিয়া বেদের শাসন, অর্থাৎ বেদের প্রভাব দেশবিশেষে, কালবিশেষে বা পাত্রবিশেষে বদ্ধ নহে ।

সার্বজনীন ধর্মের ব্যাখ্যাতা একমাত্র ‘বেদ’ ।

অলৌকিক জ্ঞানবেত্ত্ব কিঞ্চিৎ পরিমাণে অস্বদেশীয় ইতিহাস পুরাণাদি পুস্তকে ও স্নেচ্ছাদিদেশীয় ধর্মপুস্তকসমূহে যদিও বর্তমান, তথাপি অলৌকিক জ্ঞানরাশির সর্বপ্রথম, সম্পূর্ণ এবং অবিকৃত সংগ্রহ বলিয়া আৰ্য্য জাতির মধ্যে প্রসিদ্ধ ‘বেদ’ নামধেয় চতুর্বিভক্ত অক্ষররাশি সর্বতোভাবে সর্বোচ্চ স্থানের অধিকারী, সমগ্র জগতের পূজার্ত এবং আৰ্য্য বা স্নেচ্ছ সমস্ত ধর্মপুস্তকের প্রমাণভূমি ।

আর্য্য জাতির আবিষ্কৃত উক্ত বেদনামক শব্দরাশির সম্বন্ধে ইহাও বুঝিতে হইবে যে, তন্মধ্যে যাহা লৌকিক, অর্থবাদ বা ঐতিহ্য নহে তাহাই 'বেদ'।

এই বেদরাশি জ্ঞানকাণ্ড ও কর্মকাণ্ড দুই ভাগে বিভক্ত। কর্মকাণ্ডের ক্রিয়া ও ফলসমূহ মায়াধিকৃত জগতের মধ্যে সর্বকাল অবস্থিত বলিয়া দেশ, কাল, পাত্রাদি নিয়মাধীনে তাহার পরিবর্তন হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে। সামাজিক রীতিনীতিও এই কর্মকাণ্ডের উপর উপস্থাপিত বলিয়া কালে কালে পরিবর্তিত হইতেছে ও হইবে। লোকাচারসকলও সংশাস্ত্র এবং সদাচারের অবিসম্বাদী হইয়াই কালে কালে গৃহীত হইয়াছে ও হইবে। সংশাস্ত্রবিগর্হিত ও সদাচারবিরোধী একমাত্র লোকাচারের বশবর্তী হওয়াই আর্য্যজাতির অধঃপতনের এক প্রধান কারণ।

জ্ঞানকাণ্ড অথবা বেদান্তভাগই—নিষ্কামকর্ম, যোগ, ভক্তি ও জ্ঞানের সহায়তায়—মুক্তিপ্রদ এবং মায়াপারনেতৃত্ব-পদে সর্বকাল প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে; এবং দেশ, কাল, পাত্রাদির দ্বারা সর্বথা অপ্রতিহত থাকা বিধায় উহাই সার্বলৌকিক, সার্বভৌমিক ও সার্বকালিক ধর্মের একমাত্র উপদেষ্টা।

মহাদি তন্ত্র কর্মকাণ্ডকে আশ্রয় করিয়া দেশ-কাল-পাত্রভেদে সামাজিক কল্যাণকর কর্মের শিক্ষাই প্রধানতঃ দিয়াছেন। পুরাণাদি তন্ত্র বেদান্তনিহিত তন্ত্রসকল লইয়া অবতারাদির মহানু চরিত-বর্ণনামুখে ঐ সকল তন্ত্রের বিস্তৃত ব্যাখ্যানই করিতেছেন; এবং অনন্ত-ভাবময় প্রভু ভগবানের কোন কোন ভাবকে প্রধান করিয়া সেই সেই ভাবের উপদেশ করিয়াছেন।

কিন্তু কালবশে সদাচারভ্রষ্ট, বৈরাগ্যবিহীন, একমাত্র লোকা-

চারনিষ্ঠ ও ক্ষীণবুদ্ধি আৰ্য্যসন্তান—এই সকল ভাববিশেষের বিশেষ শিক্ষা দিবার জন্য আপাতপ্রতিযোগীর গ্ৰাম অবস্থিত, ও অল্প-বুদ্ধি মানবের জন্য স্থূল ও বহুবিস্তৃত ভাষায় স্থূলভাবে বৈদাস্তিক সূক্ষ্মতত্ত্বের প্রচারকারী—পুরাণাদি তন্ত্রেরও মৰ্মগ্রহে অসমর্থ, অনন্তভাবসমষ্টি অথও সনাতন ধর্মকে বহু খণ্ডে বিভক্ত এবং সাম্প্রদায়িক ঈর্ষা ও ক্রোধ প্রজ্জলিত করিয়া তন্মধ্যে পরস্পরকে আহুতি দিবার জন্য সতত চেষ্টিত থাকিয়া যখন এই ধর্মভূমি ভারতবর্ষকে প্রায় নরকভূমিতে পরিণত করিয়াছেন, তখন আৰ্য্য জাতির প্রকৃত ধর্ম কি এবং সতত-বিবদমান, আপাতদৃষ্টে বহুধা-বিভক্ত, সর্বথা-বিপরীত-আচারসকুল সম্প্রদায়ে সমাচ্ছন্ন, স্বদেশীর ভ্রাস্তিস্থান ও বিদেশীর ঘৃণাম্পদ হিন্দুধর্ম নামক যুগ-যুগান্তরব্যাপী বিখণ্ডিত ও দেশকালযোগে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ধর্মখণ্ডসমষ্টির মধ্যে যথার্থ একতা কোথায় তাহা দেখাইতে এবং কালবশে নষ্ট এই সনাতন ধর্মের সার্বলৌকিক ও সার্বদৈশিক স্বরূপ স্বীয় জীবনে নিহিত করিয়া সনাতন ধর্মের জীবন্ত উদাহরণ-স্বরূপ হইয়া লোকহিতায় সর্বসমক্ষে নিজ জীবন প্রদর্শন করিবার জন্য শ্রীভগবান রামকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছেন।

অনাদি বর্তমান, সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কর্তার সহযোগী শাস্ত্র কি প্রকারে সংক্ষিপ্ত-সংস্কার ঋষিহৃদয়ে স্বতঃ আবির্ভূত হন তাহা দেখাইবার জন্য ও এবম্প্রকারে শাস্ত্র প্রমাণীকৃত হইলে ধর্মের পুনরুদ্ধার, পুনঃস্থাপন ও পুনঃপ্রচার হইবে এই জন্য বেদমূর্তি ভগবান এই কলেবরে বহিঃশিক্ষা প্রায় সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করিয়াছেন।

বেদ—অর্থাৎ প্রকৃত ধর্মের, এবং ব্রাহ্মণত্ব—অর্থাৎ ধর্ম-

শিক্ষকত্বের স্বাক্ষর জন্ম ভগবান যে বারম্বার শরীরধারণ করেন, ইহা স্মৃত্যাদিতে প্রসিদ্ধ আছে।

প্রপতিত নদীর জলরাশি সমধিক বেগবান হয়, পুনরুত্থিত তরঙ্গ সমধিক বিস্তারিত হয়, তদ্রূপ প্রত্যেক পতনের পর আৰ্য্য-সমাজও যে শ্রীভগবানের কারুণিক নিয়ন্ত্রণে বিগতায় হইয়া পূর্বাশ্রয় অধিকতর যশস্বী ও বীর্যবান হইতেছে, ইহা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ।

প্রত্যেক পতনের পর আমাদের পুনরুত্থিত সমাজ অন্তর্নিহিত সনাতন পূর্ণত্বকে সমধিক প্রকাশিত করিতেছে এবং সর্ব-ভূতাস্তুর্য্যামী প্রভুও প্রত্যেক অবতारे আত্মস্বরূপ সমধিক অভিব্যক্ত করিতেছেন।

বারম্বার এই ভারতভূমি মূর্ছাপন্ন হইয়াছিলেন এবং বারম্বার ভারতের ভগবান আত্মাভিব্যক্তির দ্বারা ইহাকে পুনরুজ্জীবিতা করিয়াছেন।

কিন্তু ঈশ্নাত্রয়ামা, গতপ্রায়া, বর্তমান গভীর বিষাদরজনীর স্তায় কোনও অমানিশা ইতিপূর্বে এই পুণ্যভূমিকে সমাচ্ছন্ন করে নাই। এ পতনের গভীরতায় প্রাচীন পতন সমস্ত গোপ্পদের তুল্য।

সেইজন্য এই প্রবোধনের সমুজ্জলতায় আৰ্য্য-সমাজের পূর্ব পূর্ব যুগের বোধনসমূহ সূর্যালোকে তারকাবলীর স্তায় মহিমাবিহীন হইবে এবং উহার এই পুনরুত্থানের মহাবীর্য্যের সমক্ষে পূর্ব পূর্ব যুগে পুনঃপুনর্লব্ধ প্রাচীন বীর্য্য বাললীলাপ্রায় হইয়া যাইবে।

সনাতন ধর্ম্মের সমগ্র-ভাবসমষ্টি বর্তমান পতনাবস্থাকালে

অধিকারহীনতায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায়-
আকারে কোথাও আংশিকভাবে পরিরক্ষিত এবং কোথাও বা
সম্পূর্ণ লুপ্ত হইয়াছিল।

এই নবোখানে নববলে বলীয়ান মানবসন্তান যে, সেই
বিখণ্ডিত ও বিক্ষিপ্ত অধ্যাত্মবিজ্ঞা সমষ্টিভূত করিয়া নিজ জীবনে
ধারণা ও অভ্যাস করিতে এবং লুপ্ত বিজ্ঞারও পুনরাবিষ্কার
করিতে সমর্থ হইবে, ইহারই নিদর্শনস্বরূপ পরম কারুণিক শ্রীভগবান
বর্তমান যুগে সর্বযুগাপেক্ষা সমধিক সম্পূর্ণ, সর্বভাবসমম্বিত, সর্ব-
বিজ্ঞাসহায়, পূর্বোক্ত যুগাবতাররূপ প্রকাশ করিলেন।

অতএব এই মহাযুগের প্রভাষে সর্বভাবে সমন্বয় প্রচারিত
হইতেছে এবং এই অসীম অনন্ত ভাব, যাহা সনাতন শাস্ত্র ও ধর্মে
নিহিত থাকিয়াও এতদিন প্রচ্ছন্ন ছিল, তাহা পুনরাবিষ্কৃত হইয়া
উচ্চ নিনাদে জনসমাজে ঘোষিত হইতেছে।

এই নব-যুগধর্ম সমগ্র জগতের, বিশেষতঃ ভারতবর্ষের
কল্যাণের নিদান এবং এই নব-যুগধর্মপ্রবর্তক শ্রীভগবান রামকৃষ্ণ
পূর্বগ শ্রীযুগধর্মপ্রবর্তকদিগের পুনঃসংস্কৃত প্রকাশ!—হে মানব,
ইহা বিশ্বাস কর, ধারণা কর।

হে মানব, মৃতব্যক্তি পুনরাগত হয় না—গতরাত্রি পুনর্বার
আসে না—বিগতোচ্ছ্বাস পূর্বরূপ আর প্রদর্শন করে না—জীবও
দুইবার এক দেহ ধারণ করে না। অতএব অতীতের পূজা হইতে
আমরা তোমাদিগকে প্রত্যেকের পূজাতে আহ্বান করিতেছি—
গতানুশোচনা হইতে বর্তমান প্রযত্নে আহ্বান করিতেছি—লুপ্ত
পন্থার পুনরুদ্ধারে বৃথা শক্তিক্ষয় হইতে সচোনির্মিত বিশাল ও
সন্নিকট পথে আহ্বান করিতেছি; বুদ্ধিমান, বুঝিয়া লও!

যে শক্তির উন্মেষমাতে দিগদিগন্তব্যাপিনী প্রতিধ্বনি জাগরিতা
হইয়াছে, তাহার পূর্ণাবস্থা কল্পনায় অনুভব কর এবং বৃথা সন্দেহ,
দুর্বলতা ও দাসজাতিসুলভ ঈর্ষা-দেষ ত্যাগ করিয়া এই মহাযুগচক্র-
পরিবর্তনের সহায়তা কর !

আমরা প্রভুর দাস, প্রভুর পুত্র, প্রভুর লীলার সহায়ক—এই
বিশ্বাস হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে ধারণ করিয়া কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হও !

বিবেকানন্দ

বিস্তারিত
সূচীপত্র
প্রথম অধ্যায়

শ্রীরামকৃষ্ণ—ভাবমুখে	১—৪২
ঠাকুরের কথার গভীর ভাব	...	১
সকল অবতারপুরুষের কথাই ঐরূপ	...	২
দৃষ্টান্ত—গিরিশকে বকল্‌মা দিতে বলা	...	৩
গিরিশের মনের অবস্থা	...	৪
বকল্‌মা দেওয়ার পর গিরিশের মনের অবস্থা	...	৬
বকল্‌মা ভালবাসার বন্ধন	...	৭
গিরিশের অতঃপর শিক্ষা	...	৮
গিরিশের বকল্‌মার গূঢ় অর্থবোধ	...	৮
অবতারেরাই বকল্‌মার ভার লইতে পারেন	...	৯
তদৃষ্টান্ত	...	১০
বকল্‌মা সম্বন্ধে ঠাকুরের দর্শন	...	১১
ঠাকুরের ধবলকুষ্ঠ আরোগ্য করা	...	১১
বকল্‌মা দেওয়া সহজ নয়	...	১২
কোন অবস্থায় বকল্‌মা দেওয়া চলে	...	১৪
মনের জুয়াচুরি হইতে সাবধান	...	১৪
বকল্‌মার শেষ কথা	...	১৫

ঠাকুরের 'ব্রাহ্মণ ও গোহত্যা'র গল্প	...	১৬
সাধকের মনের উন্নতির সহিত		
ঠাকুরের কথার গভীর অর্থবোধ	...	১৮
'কালে হবে'	...	১৮
সাধনে লাগিয়া থাকা আবশ্যিক	...	১৯
ম্যাদাটে ভক্তি ত্যাগ করা	...	১৯
ভাবঘনমূর্তি ঠাকুরের প্রত্যেক		
ভাবের সহিত দৈহিক পরিবর্তন	...	২০
ঠাকুরের সকলের সকলপ্রকার ভাব ধরিবার ক্ষমতা	...	২১
১ম দৃষ্টান্ত—মণিমোহনের পুত্রশোকের কথা	...	২২
২য় দৃষ্টান্ত—কাম দূর করা সম্বন্ধে ঠাকুরের কথা	...	২৮
৩য় দৃষ্টান্ত—যোগানন্দকে ঐ সম্বন্ধে উপদেশ	...	২৯
৪র্থ দৃষ্টান্ত—মণিমোহনের আত্মীয়ের কথা	...	৩১
ঠাকুরের স্ত্রীজাতির সর্বপ্রকার মনোভাব ধরিবার ক্ষমতা	...	৩২
উহার কারণ	...	৩২
স্ত্রীজাতির ঠাকুরের নিকট সর্বথা		
নিঃসঙ্কোচ ব্যবহারের কারণ	...	৩৩
ঐ সম্বন্ধে দৃষ্টান্ত	...	৩৪
ঐ সম্বন্ধে ২য় দৃষ্টান্ত	...	৩৬
স্ত্রীভক্তিদিগের প্রতি ঠাকুরের সমান কৃপা	...	৩৮
ঠাকুরের স্ত্রীসুলভ হাবভাবের অনুকরণ	...	৪০
ঠাকুরে স্ত্রী-পুরুষ উভয় ভাবের একত্র সমাবেশ	...	৪১
ভাবমুখে থাকাতেই ঠাকুর সকলের		
ভাব বৃদ্ধিতে সমর্থ হইতেন	...	৪১

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভাব, সমাধি ও দর্শন সম্বন্ধে কয়েকটি কথা	৪৩—১০০
সমাধি মস্তিষ্ক-বিকার নহে	... ৪৪
সমাধি দ্বারাই ধর্মলাভ হয় ও চিরশান্তি পাওয়া যায়	৪৪.
দেবমূর্ত্যাदि-দর্শন না হইলেই যে ধর্মপথে	
অগ্রসর হওয়া যায় না, তাহা নহে	... ৪৬.
ত্যাগ, বিশ্বাস এবং চরিত্রের বলই ধর্মলাভের পরিচায়ক	৪৬
‘পাকা আমি’ ও শুদ্ধ বাসনা। জীবমুক্ত,	
আধিকারিক বা ঈশ্বরকোটি ও জীবকোটি	... ৪৭.
অদ্বৈতভাবোপলব্ধির তারতম্য	... ৪৮.
শাস্ত-দাস্তাদি-ভাবের গভীরতায় সবিকল্প সমাধি	... ৪৯
মানসিক ও আধ্যাত্মিক ভাবে শারীরিক বিকার অবশুস্তাবী	৪৯.
উচ্চাচ ভাবসমাধি কিরূপে বুঝা যাইবে	... ৪৯
সর্বপ্রকার ভাব সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিতে অবতারেরাই	
সক্ষম। দৃষ্টান্ত—ঠাকুরের সমাধির কথা	... ৫০.
বেদান্ত-চর্চা করিতে ব্রাহ্মণীয় নিষেধ	... ৫১
ঠাকুরের নির্বিকল্প ভূমিতে সর্বদা	
থাকিবার সর্বল ও উক্ত ভূমির স্বরূপ	... ৫২
ঠাকুরের মনের অন্তত গঠন	... ৫৩
ঠাকুরের সত্যনিষ্ঠা	... ৫৫
ঐ বিষয়ের ১ম দৃষ্টান্ত	... ৫৫
ঐ দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত	... ৫৬
ঐ ৩য় দৃষ্টান্ত	... ৫৭

জগদস্থা 'বেচালে পা পড়িতে' দেন না	...	৫৭
ঠাকুরের নিষিকল্প ভূমিতে উঠিবার পথে অন্তরায়	...	৬০
একুশদিন যে ভাবে থাকিলে শরীর		
নষ্ট হয়, সেইভাবে ছয় মাস থাকা	...	৬১
ঠাকুরের সমাধি সহজে 'কাপ্তেনের' কথা	...	৬২
ঐ সহজে ঠাকুরের নিজের কথা	...	৬৩
মনোভাবপ্রসূত শারীরিক পরিবর্তন		
সহজে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মত	...	৬৪
কুণ্ডলিনীর সঞ্চিত পূর্ব-সংস্কারের		
আবাসস্থান ও ঐ সকলের নাশ কিরূপে হয়	...	৬৫
শরীর ও মনের সহজ	...	৬৫
ভাবসকল সংক্রামক বলিয়াই সাধুসঙ্গ অনুষ্ঠেয়	...	৬৬
একনিষ্ঠাপ্রসূত শারীরিক পরিবর্তন	...	৬৬
ভক্তিপথ ও যোগমার্গের সামঞ্জস্য	...	৬৭
কুণ্ডলিনী কাহাকে বলে ও		
তাহার স্থপ্ত এবং জাগ্রত অবস্থা	...	৬৭
জাগরিতা কুণ্ডলিনীর গতি—ষট্চক্রভেদ ও সমাধি	...	৬৮
ঐ সহজে ঠাকুরের অনুভব	...	৬৯
ঠাকুরের নিষিকল্প সমাধিকালের অনুভব বলিবার চেষ্টা		৭০
সমাধিপথে কুণ্ডলিনীর পাঁচ প্রকারের গতি	...	৭১
বেদান্তের স্থপ্তভূমি ও প্রত্যেক ভূমিলক্ষ		
আধ্যাত্মিক দর্শন সহজে ঠাকুরের কথা	...	৭৩
ঠাকুরের শ্রুতিধরত্ব	...	৭৪
ঠাকুরের অদ্বৈতভাব সহজে বুঝান	...	৭৪

ঐ দৃষ্টান্ত—স্বামী তুরীয়ানন্দ	...	৭৫
বেদান্ত আর কি ? ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা—এই ধারণা		৭৫
ঈশ্বররূপা ভিন্ন ঈশ্বরলাভ হয় না	...	৭৯
শশধর পণ্ডিত ঠাকুরকে যোগশক্তিবলে		
রোগ সারাইতে বলায় ঠাকুরের উত্তর	...	৮০
স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতি ভক্তগণের ঠাকুরকে		
ঐ বিষয়ে অস্মরোধ ও ঠাকুরের উত্তর	...	৮০
ঠাকুরের অদ্বৈতভাবের গভীরতা	...	৮১
ঠাকুরের সকল প্রকার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া	...	৮২
ঠাকুরের ভাবকালে দৃষ্ট বিষয়গুলি		
বাহ্যজগতে সত্য হইতে দেখা	...	৮৩
ঐ দৃষ্টান্ত—পঞ্চবটীর বেড়া ইত্যাদি	...	৮৩
প্রত্যেক ভক্তের সহিত ঠাকুরের বিভিন্ন ভাবের সম্বন্ধ		৮৫
ভক্তদিগের দুই শ্রেণী	...	৮৫
ভক্তদিগের প্রকৃতি দেখিয়া ঠাকুরের		
প্রত্যেকের সহিত ভাব-সম্বন্ধ-পাতান	...	৮৬
ঠাকুর ভক্তদিগকে কত প্রকারে		
ধর্মপথে অগ্রসর করাইতেন	...	৮৭
ভক্তদিগের দেবদেবীর মূর্তিদর্শন	...	৮৮
জনৈক ভক্তের বৈকুণ্ঠ-দর্শন	...	৮৯
সাকারবাদীদের প্রতি ঠাকুরের উপদেশ	...	৮৯
রেশমের দড়ি ও 'জ্যোৎস্না' প্রদীপ	...	৮৯
ধ্যান করবার আগে মনটা ধুয়ে ফেলা	...	৯০
সাকার বড় না নিরাকার বড়	...	৯০

সাকার ও নিরাকারের সামঞ্জস্য	...	২১
স্বামী বিবেকানন্দ ও অন্ধবিশ্বাস	...	২২
নিরাকারবাদীদের প্রতি উপদেশ	...	২৩
ঠাকুরের নিজমূর্তি ধ্যান করিতে উপদেশ	...	২৪
'কাঁচা আমি ও পাকা আমি'; একটা ভাব পাকা করে ধরলে তবে ঈশ্বরের উপর জোর চলে	...	২৪
নষ্ট মেয়ের দৃষ্টান্ত	...	২৫
এজনে ঈশ্বরলাভ করবো—মনে এই জোর রাখা চাই	...	২৫
এক এক করে বাসনাত্যাগ করা চাই	..	২৬
চার করে মাছ ধরার মত অধ্যবসায় চাই	...	২৬
ভগবান 'কানখড়্কে'—সব শুনে	...	২৬
গভীর ভাব-প্রবণতার সহিত ঠাকুরের সকল বিষয়ে দৃষ্টি রাখা	...	২৭
ঐ বিষয়ে দৃষ্টান্ত	...	২৮
ঐ বিষয়ে ২য় দৃষ্টান্ত	...	২৯
ঐ বিষয়ে ৩য় দৃষ্টান্ত—শ্রীশ্রীমার প্রতি উপদেশ	...	২৯
ঐ বিষয়ে শেষ কথা	...	২৯
ঠাকুর ভাবরাজ্যের মূর্তিমান রাজা	...	১০০
মানব-মনের উপর তাহার অপূর্ব আধিপত্য। স্বামী বিবেকানন্দের ঐ বিষয়ক কথা	...	১০০

তৃতীয় অধ্যায়

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের গুরুভাব	১০১—১৩৩
ঠাকুর, 'গুরু' 'বাবা' বা 'কর্তা' বলিয়া সম্বোধিত হইলে		
বিরক্ত হইতেন। তবে গুরুভাব তাঁহাতে কিরূপে সম্ভবে	১০১	
সর্বভূতে নারায়ণ-বুদ্ধি স্থির থাকায় ঠাকুরের দাসভাব সাধারণ	১০২	
কিন্তু দিবা-ভাবাবেশে তাঁহাতে গুরুভাবের		
লীলা নিত্য দেখা যাইত। ঠাকুরের তখনকার		
ব্যবহারে ভক্তদিগের কি মনে হইত	...	১০৩
ভাবময় ঠাকুরের ভাবের ইতি নাই	...	১০৪
সাধারণের বিশ্বাস ঠাকুর ভক্ত ছিলেন, জ্ঞানী		
ছিলেন না। 'ভাবমুখে থাকা' কখন ও		
কিরূপে সম্ভবে বুঝিলে এ কথা আর বলা চলে না		১০৪
'আমি'-বোধাশ্রয়ে মানসিক বৃত্তিসমূহের উদয়। উহার		
আংশিক লোপে সবিকল্প ও পূর্ণ লোপে নির্বিকল্প		
সমাধি হয়। সমাধি, মূর্ছা ও সুষুপ্তির প্রভেদ	...	১০৫
সমাধির ফল জ্ঞান ও আনন্দের বৃদ্ধি এবং ভগবদ্দর্শন	...	১০৬
ঠাকুরের ছয় মাস নির্বিকল্প সমাধিতে		
থাকিবার কালের দর্শন ও অনুভব	...	১০৭
'আমি'-বোধের সম্পূর্ণ লোপে		
ঐ কালে তাঁহার শরীর রহিল কিরূপে	...	১০৭
জনৈক যোগী-সাধুর আগমন ও ঠাকুরের অবস্থা বুঝিয়া		
তাঁহাকে জোর করিয়া আহাৰ করাইয়া দেওয়া	...	১০৮
শ্রীশ্রীজগদম্বার আদেশ 'ভাবমুখে থাক'	...	১০৯

একমেবাদ্বিতীয়ং-বস্তুতে নিগুণ ও সগুণভাবে স্বগত-ভেদ এবং জগদ্ব্যাপী বিরাট আমিত্ব বর্তমান । ঐ বিরাট আমিত্বই ঈশ্বর বা শ্রীশ্রীজগদম্বার আমিত্ব এবং উহার দ্বারাই জগদ্ব্যাপার নিষ্পন্ন হয় ...	১০৯
ঐ বিরাট আমিত্বেরই নাম 'ভাবমুখ', কারণ সংসারের সকল প্রকার ভাবই উহাকে আশ্রয় করিয়া উদ্ভিত হইয়াছে পূর্ণ নির্বিকল্প এবং ঈষৎ সবিকল্প বা 'ভাবমুখ' অবস্থায় ঠাকুরের অনুভব ও দর্শন ...	১১০ ১১১
'ভাবমুখে থাক'—কথার অর্থ ...	১১২
সাধকের আধ্যাত্মিক উন্নতিতে দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও অদ্বৈত-ভাব পর পর আসিয়া উপস্থিত হয় ...	১১২
মহাজ্ঞানী হনুমানের ঐ বিষয়ক কথা ...	১১৩
অদ্বৈতভাব চিন্তা, কল্পনা ও বাক্যাতীত ; যতক্ষণ বলা করা আছে ততক্ষণ নিত্য ও লীলা, ঈশ্বরের উভয় ভাব লইয়া থাকিতেই হইবে ...	১১৪
ঐ বিষয়ে ঠাকুরের কয়েকটি দৃষ্টান্ত । যথা—গানের অনুলোম-বিলোম ; বেল, খোড়, প্যাঞ্জের খোলা ...	১১৪
ভাবমুখে নিগুণ হইতে কয়েকপদ নিম্নে অবস্থিত থাকিলেও ঐ অবস্থায় অদ্বৈত বস্তুর বিশেষ অনুভব থাকে । ঐ অবস্থায় কিরূপ অনুভব হয় । ঠাকুরের দৃষ্টান্ত ...	১১৫
বিদ্যা-মায়ার রাজ্যে আরও নিম্নস্তরে নামিলে তবে ঈশ্বরের দাস, ভক্ত, সন্তান বা অংশ-'আমি'—এইরূপ অনুভব হয় ...	১১৬
ঠাকুরের 'কাঁচা আমি'টার এককালে নাশ হইয়া বিরাট 'পাকা আমিত্বে' অনেক কাল অবস্থিতি । ঐ অবস্থাতেই	

তাঁহাতে গুরুভাব প্রকাশ পাইত । অতএব দীনভাব ও	
গুরুভাব অবস্থানুসারে এক ব্যক্তিতে আসা অসম্ভব নহে	১১৭
গুরুভাবে ঠাকুরের ইচ্ছা ও স্পর্শমাত্রে অপরে ধর্মশক্তি জাগ্রত	
করিয়া দিবার দৃষ্টান্ত—১৮৮৬ খৃঃ ১লা জানুয়ারীর ঘটনা	১১৮
ঠাকুরের ঐরূপ স্পর্শে ভক্তদিগের প্রত্যেকের দর্শন ও অনুভব	১২২
কখন কাহাকে রূপায় ঠাকুর ঐ	
ভাবে স্পর্শ করিবেন তাহা বুঝা যাইত না ।	... ১২৩
‘কাঁচা আমি’টার লোপ বা নাশেই	
গুরুভাব-প্রকাশের কথা সকল ধর্মশাস্ত্রে আছে	... ১২৪
গুরুভাব মানবীয় ভাব নহে—সাক্ষাৎ জগদম্বার ভাব, মানবের	
শরীর ও মনকে যন্ত্র-স্বরূপে অবলম্বন করিয়া প্রকাশিত	১২৪
ঈশ্বর করুণায় ঐ ভাবাবলম্বনে মানব-মনের অজ্ঞান-মোহ	
দূর করেন । সেজন্য গুরুভক্তি ও ঈশ্বরভক্তি একই কথা	১২৫
গুরুভক্তি-বিষয়ে ঠাকুরের উপদেশ—বিভীষণের গুরুভক্তির কথা	১২৭
ঠিক ঠিক ভক্তিতে অতি তুচ্ছ বিষয়েও ঈশ্বরের উদ্দীপন হয় ।	
‘এই মাটিতে খোল হয় !’—বলিয়াই শ্রীচৈতন্যের ভাব	১২৮
অর্জুনের গুরুভক্তির কথা	... ১২৯
ঈশ্বরীয় ভাবরূপে গুরু এক । তথাপি নিজ গুরুতে ভক্তি,	
বিশ্বাস ও নিষ্ঠা চাই । ঐ বিষয়ে হনুমানের কথা	... ১৩০
সকল মানবেই গুরুভাব সুপ্তভাবে বিদ্যমান	... ১৩২
ঠাকুরের কথা “শেষে মনই গুরু হয়”	... ১৩২
“গুরু যেন সখী”	... ১৩৩
“গুরু শেষে ইষ্টে লয় হন । গুরু, কৃষ্ণ, বৈষ্ণব	
—তিনে এক, একে তিন”	... ১৩৩

চতুর্থ অধ্যায়

গুরুভাবের পূর্ববিকাশ	১৩৪—১৫৮
বাল্যাবস্থা হইতেই গুরুভাবের পরিচয় ঠাকুরের জীবনে পাওয়া যায়	...	১৩৪
“আগে ফল, তারপর ফুল।” সকল অবতারপুরুষের জীবনেই এ ভাব	...	১৩৫
ঠাকুরের জীবনে গুরুভাবের প্রথমবিকাশ—কামারপুকুরে		১৩৬
লাহাবাবুদের বাটীতে পণ্ডিত-সভায় শাস্ত্র-বিচার—	...	১৩৭
ঈশার জীবনে ঐরূপ ঘটনা। জেরুজালেমের য্যাভে-মন্দির		১৩৮
সেকালের য্যাভদী তীর্থযাত্রী	...	১৩৮
য্যাভে-মন্দিরে ঈশার শাস্ত্রব্যাখ্যা	...	১৩৯
পণ্ডিত মোক্ষমূলরের মত খণ্ডন	...	১৪০
ঠাকুর বিবাহ করিলেন কেন? আত্মীয়দিগের অনুরোধে?—না		১৪০
ভোগবাসনা ছিল বলিয়া?—না	...	১৪১
বিবাহের পাত্রী-অন্বেষণের সময় ঠাকুরের কথা—“কুঁটো বেঁধে রাখা আছে, দেখ গে যা।” অতএব স্বেচ্ছায় বিবাহ করা		১৪২
প্রারক কর্ম-ভোগের জন্তই কি ঠাকুরের বিবাহ?	...	১৪৩
না—যথার্থ জ্ঞানী পুরুষের প্রারক ভোগ করা-না-করা ইচ্ছাধীন		১৪৪
ঠাকুরের তো কথাই নাই; কারণ তাঁহার কথা—“যে রাম, যে কৃষ্ণ, সে-ই ইদানীং রামকৃষ্ণ”		১৪৫
বিবাহের কথা লইয়া ঠাকুরের রঙ্গরস	...	১৪৬
দশ প্রকারের সংস্কার পূর্ণ করিবার জন্তই সাধারণ আচার্য্যদিগের বিবাহ করা। ঠাকুরের বিবাহও কি সেজন্ত?—না	...	১৪৭

ধর্মান্বিতিক ভোগসহায়ে ত্যাগে		
পৌছাইবার জগুই হিন্দুর বিবাহ	...	১৪৭
বিচার-সংযুক্ত ভোগ করিতে করিতে কালে		
বোধ হয়—‘দুঃখের মুকুট পরিয়া সুখ আসে’	...	১৪৮
ভোগসুখ ত্যাগ করিতে মনকে কি ভাবে		
বুঝাইতে হয়, তদ্বিষয়ে ঠাকুরের উপদেশ	...	১৪৯
বিবাহিত জীবনে ব্রহ্মচর্যপালন করিবার প্রথার		
উচ্ছেদ হওয়াতেই হিন্দুর বর্তমান জাতীয় অবনতি		১৫০
নিজে অনুষ্ঠান করিয়া দেখাইয়া ঐ আদর্শ		
পুনরায় প্রচলনের জগুই ঠাকুরের বিবাহ	...	১৫১
স্ত্রীর সহিত ঠাকুরের শরীর-সম্বন্ধ-রহিত অদৃষ্টপূর্ব		
প্রেম-সম্বন্ধ । শ্রীশ্রীমার ঐ বিষয়ক কথা	...	১৫২
গৃহী মানবের শিক্ষার জগুই ঠাকুরের ঐরূপ প্রেমলীলাভিনয়		১৫৩
ঠাকুরের আদর্শে বিবাহিত জীবন গঠন করিতে এবং		
অন্ততঃ আংশিকভাবেও ব্রহ্মচর্য পালন করিতে		
হইবে । নতুবা আমাদের কল্যাণ নাই	...	১৫৪
বিবাহ করিয়া ঠাকুরের শরীর-সম্বন্ধ সম্পূর্ণ রহিত হইয়া		
থাকা সম্বন্ধে কয়েকটি আপত্তি ও তাহার খণ্ডন	...	১৫৫
গুরুভাবের প্রেরণাতেই যে ঠাকুরের বিবাহ,		
তৎপরিচয় শ্রীশ্রীমাকে ঠাকুরের জগদম্বাজ্ঞানে		
আজীবন পূজা করাতেই বুঝা যায়	...	১৫৬

পঞ্চম অধ্যায়

যৌবনে গুরুভাব	১৫৯—১৭৭
গুরু ও নেতা হওয়া মানবের ইচ্ছাধীন নহে	...	১৫৯
লোকগুরুদিগের ভিতরে বিরাট ভাবমুখী আমিত্বের বিকাশ		
সহজেই আসিয়া উপস্থিত হয়, সাধারণের ঐরূপ হয় না		১৬১
ঠাকুরের জীবনে গুরুভাবের পূর্ণবিকাশ হইয়া		
উহা সহজ-ভাব হইয়া দাঁড়ায় কখন	...	১৬২
সাধনকালে ঐ ভাব—রাণী রাসমণি ও		
তদীয় জামাতা মথুরের সহিত ব্যবহারে	...	১৬২
ঠাকুরের অপূর্ব স্বভাব	...	১৬৩
ধনী ও পণ্ডিতদের ঠাকুরকে চিনিতে		
পারা কঠিন। উহার কারণ	...	১৬৫
বিবাহের পর ঠাকুরের অবস্থা। মথুরের উহা		
লক্ষ্য করিয়া ক্রমশঃ তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট		
হওয়া। অপর সাধারণের ঠাকুরের বিষয়ে মতামত		১৬৬
গুরুভাবে ঠাকুরের রাণী রাসমণিকে দণ্ডবিধান	...	১৬৯
উহার ফল	...	১৭০
শ্রীচৈতন্য ও ঈশার জীবনে ঐরূপ ঘটনা	...	১৭১
গুরুভাবের প্রেরণায় আত্মহারা ঠাকুরের অদ্ভুতপ্রকারে		
শিক্ষাপ্রদান ও রাণী রাসমণির সৌভাগ্য	...	১৭৩
ঈশ্বরে তন্ময় মনের লক্ষণ সম্বন্ধে শাস্ত্রমত	...	১৭৫
লোকগুরুদিগের এবং বিশেষতঃ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের		
ব্যবহার বুঝা এত কঠিন কেন	...	১৭৫

ষষ্ঠ অধ্যায়

গুরুভাব ও মথুরানাথ	১৭৮—২০৭
বড় ফুল ফুটতে দেবী লাগে	...	১৭৮
মথুরের সহিত ঠাকুরের অদ্ভুত		
সম্বন্ধ। মথুর কিরূপ প্রকৃতির লোক ছিল	...	১৭৯
ঠাকুরের গুরুভাব-বিকাশে রাণী রাসমণি ও মথুরের অজ্ঞাত		
ভাবে সহায়তা। বন্ধু বা শত্রুভাবে সম্বন্ধ যাবতীয়		
লোক অবতারপুরুষের শক্তিবিকাশের সহায়তা করে		১৮০
সাধারণ মানবজীবনেও ঐরূপ। কারণ, উহার সহিত		
অবতারপুরুষের জীবনের বিশেষ সৌসাদৃশ্য আছে...		১৮২
মথুর ভক্ত ছিল বলিয়া নির্বোধ ছিল না	...	১৮৩
ঠাকুরের প্রতি মথুরের প্রথমাকর্ষণ কি		
দেখিয়া এবং উহার ক্রমপরিণতি	..	১৮৪
ভক্তির সংক্রামিকা শক্তিতে মথুরের পরিবর্তন	...	১৮৬
বর্তমান ভাবে শিক্ষিত মথুরের ঠাকুরের সহিত		
তর্ক-বিচার। প্রাকৃতিক নিয়মের পরিবর্তন		
ঈশ্বরেচ্ছায় হইয়া থাকে। লাল জবা গাছে সাদা জবা		১৮৭
ঠাকুরের অবস্থা লইয়া মথুরের নিত্য বাধ্য হইয়া আন্দোলন		১৮৮
‘মহিম্ন’স্তোত্র পড়িতে পড়িতে ঠাকুরের সমাধি ও মথুর	...	১৮৯
ঠাকুরের নিকট অপরের সহজে আধ্যাত্মিক		
উন্নতিলাভবিষয়ে দৃষ্টান্ত	...	১৯১
মথুরের ঠাকুরকে একাধারে শিব-শক্তিরূপে দর্শন	...	১৯২
ঐ দর্শনের ফল	...	১৯৪

মথুরের মহাভাগ্য সম্বন্ধে শাস্ত্রপ্রমাণ	...	১৯৫
ঠাকুরের দিন দিন গুরুভাবের অধিকতর বিকাশ ও মথুরের তাঁহাকে পরীক্ষা করিয়া অনুভব	...	১৯৬
মথুরের ভক্তিবৃদ্ধি দেখিয়া হালদার পুরোহিত	...	১৯৯
বেনারসী শালের দুর্দশা	...	২০০
ঠাকুরের নির্লিপ্ততা	...	২০১
হালদার পুরোহিতের শেষ কথা	...	২০২
মথুরানাথ ও তৎপত্নী জগদম্বা দাসীর ঠাকুরের উপর ভক্তি ও ঠাকুরের ঐ পরিবারের সহিত ব্যবহার	...	২০৩
ঠাকুরে বিপরীত ভাবের একত্র সমাবেশ	...	২০৪
দক্ষিণেশ্বরে বিগ্রহমূর্তি ভগ্ন হওয়ায় বিধান লইতে পণ্ডিতসভার আহ্বান	...	২০৫
ঠাকুরের মীমাংসা ও ঐ বিষয়ের শেষ কথা	...	২০৬

সপ্তম অধ্যায়

শুরুভাবে মথুরের প্রতি কৃপা	২০৮—২৪৬
জানবাজারে মথুরের বাটীতে		
ঠাকুরকে লইয়া ৬দুর্গোৎসবের কথা	...	২০৮
ঠাকুরের ভাবসমাধি ও রূপ	...	২১০
কামারপুকুরে ঠাকুরের রূপ-গুণে জনতার কথা	...	২১১
ঠাকুরের রূপ লইয়া ঘটনা ও তাঁহার দীনভাব	...	২১২
ঠাকুরের সমাধি ভাঙ্গাইতে জগদম্বা দাসীর কৌশল	...	২১৪
ঠাকুরের সমাধি হইতে সাধারণ		
অবস্থায় নামিবার প্রকার শাস্ত্রসম্মত	...	২১৫
সখীভাবে ঠাকুরের ৬দুর্গাদেবীকে চামর করা	...	২১৬
মথুরের তাঁহাকে ঐ অবস্থায় চিনিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা		২১৭
বিজয়া দশমী	...	২১৭
মথুরের আনন্দে ঐ বিষয়ে ছাঁশ না থাকা	...	২১৮
দেবীমূর্তি-বিসর্জন দিবে না বলিয়া মথুরের সংকল্প	...	২১৮
সকলে বুঝাইলেও মথুরের উত্তর	...	২১৯
ঠাকুরের মথুরকে বুঝান	...	২২০
ঠাকুরের কথা ও স্পর্শের অদ্ভুত শক্তি	...	২২১
মথুর প্রকৃতিস্থ কিরূপে হইয়াছিল	...	২২২
মথুরের ভক্তিবিশ্বাসের অবিচলতা ঠাকুরকে পরীক্ষার ফলে		২২২
মথুরের ভাবসমাধিলাভের ইচ্ছা	...	২২৩
ঐ জন্ম ঠাকুরের নিকট প্রার্থনা	...	২২৪
উদ্ধব ও গোপীদের দৃষ্টান্তে ঠাকুরের তাহাকে বুঝান	...	২২৪

মথুরের ভাবসমাধি হওয়া ও প্রার্থনা	...	২২৬
ত্যাগী না হইলে ভাবসমাধি স্থায়ী হয় না	...	২২৭
ঐ বিষয়ের দৃষ্টান্ত—কাশীপুরের		
বাগানে আনীত জনৈক ভক্ত-যুবকের কথা	...	২২৭
আধ্যাত্মিক ভাবের আতিশয্যে উপস্থিত বিকারসকল		
চিনিবার ঠাকুরের শক্তি । গুরু যথার্থ ই ভবরোগ-বৈদ্য		২২৮
ঐ যুবকের অবস্থা সম্বন্ধে ঠাকুরের মীমাংসা	...	২৩০
ঠাকুরের মথুরকে সকল বিষয় বালকের		
মত খুলিয়া বলা ও মতামত লওয়া	...	২৩১
মথুরের কল্যাণের দিকে ঠাকুরের কতদূর দৃষ্টি ছিল	...	২৩২
ঐ বিষয়ক দৃষ্টান্ত—ফলহারিণী-পূজার		
প্রসাদ ঠাকুরের চাহিয়া লওয়া	...	২৩৩
বিশেষ বিশেষ পর্কদিনে ঠাকুরের ভিন্ন		
ভিন্ন প্রকারের ভাব-সমাধির স্বভাবতঃ উদয়	...	২৩৪
ঠাকুরের ঐরূপে প্রসাদ চাহিয়া		
লওয়ায় যোগানন্দ স্বামীর চিন্তা	...	২৩৬
ঠাকুরের ঐরূপ করিবার কারণনির্দেশ	...	২৩৭
মথুরের সহিত ঠাকুরের অদ্ভুত সম্বন্ধ	...	২৩৮
মথুরের কামকীটের কথা বলিয়া		
বালকভাবাপন্ন ঠাকুরকে বুঝান	...	২৩৯
মথুরের সহিত ঠাকুরের ভক্তদিগের আগমনের কথা	...	২৪০
ঠাকুরের বালকভাবের দৃষ্টান্ত—স্বনিশাক তোলার কথা		২৪১
সাংসারিক বিপদে মথুরের ঠাকুরের শরণাপন্ন হওয়া	...	২৪২
কৃপণ মথুরের ঠাকুরের জন্ম অজস্র অর্থব্যয়ের দৃষ্টান্ত	...	২৪৩

ঐ বিষয়ক অন্যান্য দৃষ্টান্ত	...	২৪৪
ঠাকুরের ইচ্ছায় মথুরের বৈষ্ণনাথে দরিদ্রসেবা	...	২৪৪
ঠাকুরের সহিত মথুরের সম্বন্ধ দৈবনির্দিষ্ট ; ভোগবাসনা ছিল বলিয়া মথুরের পুনর্জন্ম সম্বন্ধে ঠাকুর	...	২৪৬

অষ্টম অধ্যায়

গুরুভাবে নিজ গুরুগণের সহিত সম্বন্ধ	২৪৭—২৯২
গুরুভাব অবতারপুরুষদিগের নিজস্ব সম্পত্তি	... ২৪৭
ঠাকুরের বহু গুরুর নিকট হইতে দীক্ষাগ্রহণ	... ২৪৮
ভৈরবী ব্রাহ্মণী বা 'বাম্নী'	... ২৪৯
'বাম্নী'র ঠাকুরকে সহায়তা	... ২৫০
'বাম্নী'র বৈষ্ণব-তন্ত্রোক্ত ভাবে অভিজ্ঞতা	... ২৫০
'বাম্নী'র রূপ-গুণ দেখিয়া মথুরের সন্দেহ	... ২৫১
'বাম্নী'র পূর্বপরিচয়	... ২৫২
ব্রাহ্মণী উচ্চদের সাধিকা	... ২৫২
'বাম্নী'র যোগলক্ষ দর্শন	... ২৫৩
ব্রাহ্মণীর শিষ্য চন্দ্রের কথা	... ২৫৩
সিদ্ধাই যোগলক্ষকারী	... ২৫৪
সিদ্ধাইলাভে চন্দ্রের পতন	... ২৫৫
'বাম্নী'র শিষ্য গিরিজার কথা	... ২৫৫
গিরিজার সিদ্ধাই	... ২৫৬
গুরুভাবে ঠাকুরের চন্দ্র ও গিরিজার সিদ্ধাইনাশ	... ২৫৮

সিদ্ধাই ভগবানলাভের অন্তরায় ; ঐ বিষয়ে		
ঠাকুরের 'পায়ে হেঁটে নদী পারের' গল্প	...	২৫৮
সিদ্ধাইয়ে অহকার-বুদ্ধি-বিষয়ে		
ঠাকুরের 'হাতী মরা-বাঁচা'র গল্প	...	২৫৯
'বাম্নী'র নির্বিকল্প অদ্বৈতভাব-লাভ		
হয় নাই ; তদ্বিষয়ে প্রমাণ	...	২৬২
তদ্ব্যক্ত পশু, বীর ও দিব্য ভাব-নির্গম	...	২৬৪
বীর সাধিকা 'বাম্নী' দিব্যভাবের		
অধিকারিণী হইতে তখনও সমর্থ হন নাই	...	২৬৫
ঐ বিষয়ে প্রমাণ	...	২৬৫
ঠাকুরের কৃপায় ব্রাহ্মণীর নিজ আধ্যাত্মিক		
অভাববোধ ও তপস্যা করিতে গমন	...	২৬৭
তোতাপুরী গোস্বামীর কথা	...	২৬৮
ঠাকুর ও পুরী গোস্বামীর পরম্পর		
ভাব-আদান-প্রদানের কথা	...	২৬৯
ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের নির্ভীকতা ও বন্ধনবিমুক্তি সম্বন্ধে শাস্ত্র	...	২৭০
তোতাপুরীর উচ্চ অবস্থা	...	২৭২
তোতার নির্ভীকতা—ভৈরব-দর্শনে	...	২৭৩
তোতাপুরীর গুরুর কথা	...	২৭৪
নিজ গুরুর মঠ ও মণ্ডলীসম্বন্ধে তোতাপুরীর কথা	...	২৭৫
তোতাপুরীর পূর্ব পরিচয়	...	২৭৭
তোতাপুরীর মন	...	২৭৭
তোতাপুরীর ভক্তিমাৰ্গে অনভিজ্ঞতা	...	২৮০
ঐ বিষয়ে প্রমাণ—'কেও রোটা ঠোকতে হো'	...	২৮১

তোতাপুরীর ক্রোধত্যাগের কথা	...	২৮২
মায়া কৃপা করিয়া পথ না ছাড়িলে		
মানবের ঈশ্বরলাভ হয় না	...	২৮৩
ঐ বিষয়ে দৃষ্টান্ত—রাম, সীতা ও		
লক্ষ্মণের বনে পর্যটনের কথা	...	২৮৪
জগদম্বার কৃপায় তাঁহার উচ্চাবস্থা—		
তোতা একথা বুঝেন নাই	...	২৮৫
তোতাপুরীর অসুস্থতা	...	২৮৬
তোতার নিজ মনের সঙ্কেত অগ্রাহ্য করা	...	২৮৬
তোতার ঠাকুরের নিকট বিদায়		
লইতে যাইয়াও না পারা ও রোগবৃদ্ধি	...	২৮৭
মনকে আয়ত্ত করিতে না পারিয়া তোতার গঙ্গায় শরীর-		
বিসর্জন করিতে যাওয়া ও বিশ্বরূপিণী জগদম্বার দর্শন		২৮৮
তোতার পূর্বসংকল্প-ত্যাগ	...	২৯০
অসুস্থতায় তোতার জ্ঞান—ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তি এক	...	২৯০
তোতার জগদম্বাকে মানা ও বিদায়গ্রহণ	...	২৯১
তোতার 'কিমিয়া'-বিদ্যায় অভিজ্ঞতা	...	২৯১
উপসংহার	...	২৯২



শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

প্রথম অধ্যায়

শ্রীরামকৃষ্ণ—ভাবমুখে

যে চৈব সাধিকা ভাবা রাজসাস্ত্রামসাশ্চ যে ।

মন্ত এবোতি তান্ বিদ্ধি ন ত্বহং তেভু তে ময়ি ॥

ত্রিভিগুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্বমিদং জগৎ ।

মোহিতং নাভিজানাতি নামেভ্য পরমব্যয়ম্ ॥

—গীতা, ৭।১২, ১৩

দ্বাদশবর্ষব্যাপী অদৃষ্টপূর্ব অলৌকিক তপশ্রাস্ত্রে শ্রীশ্রীজগদম্বা
ঠাকুরকে বলেন—“ওরে, তুই ভাবমুখে থাক্”; ঠাকুরও তাহাই
করেন—একথা এখন অনেকেই জানিয়াছেন। কিন্তু
ঠাকুরের কথার
গভীর ভাব
ভাবমুখে থাকা যে কি ব্যাপার এবং উহার অর্থ যে
কত গভীর তাহা বুঝা ও বুঝান বড় কঠিন।
আটাশ বৎসর পূর্বে স্বামী বিবেকানন্দ একদিন জনৈক বন্ধুকে^১
বলিয়াছিলেন, “ঠাকুরের এক একটি কথা অবলম্বন করিয়া
ঝুড়ি-ঝুড়ি দর্শন-গ্রন্থ লেখা যাইতে পারে।” বন্ধুটি তৎশ্রবণে অবাক
হইয়া বলেন—“বটে? আমরা তো ঠাকুরের কথার অত গভীর
ভাব বুঝিতে পারি না। তাঁর কোন একটি কথা ঐ ভাবে আমাকে
বুঝিয়ে বলবে?”

১ শ্রীযুত হরমোহন মিত্র

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

স্বামীজি—বোঝবার মাথা থাকলে তবে ত বুঝবি! আচ্ছা, ঠাকুরের যে-কোন-একটি কথা ধর, আমি বুঝি।

বন্ধু—বেশ; সর্বভূতে নারায়ণ দেখা সম্বন্ধে উপদেশ দিয়ে ঠাকুর ‘হাতি-নারায়ণ ও মাহুত-নারায়ণে’র যে গল্পটি বলেন সেইটি বুঝিয়ে বল।

স্বামীজিও তৎক্ষণাৎ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয়বিধ পণ্ডিতদিগের ভিতরে আবহমানকাল ধরিয়া স্বাধীন-ইচ্ছা ও অদৃষ্টবাদ অথবা পুরুষকার ও ভগবদিচ্ছা লইয়া যে বাদানুবাদ চলিয়া আসিতেছে অথচ কোন একটা স্থির মীমাংসা হইতেছে না, সেই সকল কথা উত্থাপন করেন এবং ঠাকুরের ঐ গল্পটি যে ঐ বিবাদের এক অপূর্ব সমাধান, তাহা সরল ভাষায় তিন দিন ধরিয়া বন্ধুটিকে বুঝাইয়া বলেন।

তলাইয়া দেখিলে বাস্তবিকই ঠাকুরের অতি সামান্য-সামান্য দৈনিক ব্যবহার ও উপদেশের ভিতর ঐরূপ গভীর অর্থ দেখিতে

সকল অবতার-
পুরুষদিগের
কথাই ঐরূপ
পাইয়া আশ্চর্য হইতে হয়। অবতারপুরুষদিগের
প্রত্যেকের সম্বন্ধেই কথাটি সত্য। তাঁহাদের
জীবনালোচনায় ইহা স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়।

আচার্য্য শঙ্কর প্রভৃতি যে দুই-এক জন মহাপুরুষকে বিপক্ষদের
কুতর্কজাল ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া ধর্মসংস্থাপন করিতে হইয়াছিল,
তাঁহাদের কথা ছাড়িয়া দিলে অপর সকল মহাপুরুষদিগের
জীবনেই দেখা যায়, তাঁহারা সাদা কথায় মর্মস্পর্শী ছোট-
ছোট গল্প, উপমা বা রূপকের সহায়ে যাহা বলিবার বলিয়া
ও বুঝাইয়া গিয়াছেন। লম্বা-চওড়া কথা, দীর্ঘ দীর্ঘ সমাস

শ্রীরামকৃষ্ণ—ভাবমুখে

প্রভৃতির ধার দিয়াও যান নাই। কিন্তু সে সাদা কথায়, সে ছোট উপমার ভিতর এত ভাব ও মানবসাধারণকে উচ্চ আদর্শে পৌঁছাইয়া দিবার এত শক্তি রহিয়াছে যে, আমরা হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া চেষ্টা করিয়াও তাহাদের ভাবের অন্ত বা শক্তির সীমা এখনও করিতে পারিলাম না। যতই দেখি ততই উচ্চ উচ্চতর ভাব দেখিতে পাই, যতই নাড়াচাড়া তোলাপাড়া করি ততই মন ‘অনিত্য অশুভ’ সংসারের রাজত্ব ছাড়িয়া উর্দ্ধে উর্দ্ধতর দেশে উঠিতে থাকে এবং ‘পরমপদপ্রাপ্তি’ ‘ব্রাহ্মীস্থিতি’ ‘মোক্ষ’ বা ‘ভগবদ্দর্শনে’র দিকে—কারণ এক বস্তুকেই নানাভাবে দেখিয়া মহাপুরুষেরা ঐসকল নানা নামে নির্দেশ করিয়াছেন—যতই কেহ অগ্রসর হইতে থাকে, ততই ঐসকল সাদা কথার গভীর ভাব প্রাণে প্রাণে বৃদ্ধিতে থাকে।

ইহাই নিয়ম। ঠাকুরের কথা ও ব্যবহারের সম্বন্ধেও ঐ নিয়মের ব্যতিক্রম দেখি না। তাঁহার যে কথাগুলি আগে যে ভাবে বৃদ্ধিতাম, এখন সেইগুলিরই আরও কতই না গভীর ভাব দেখিতে পাই! দৃষ্টান্তস্বরূপ এখানে একটি কথা বলিলেই চলিবে। শ্রীযুত গিরিশ বকল্‌মা দিতে বলা ঠাকুরের নিকট কয়েকবার আসা-যাওয়ার পর এক দিন তাঁহাকে সর্বতোভাবে আত্মসমর্পণ করিয়া বলিলেন—“এখন থেকে আমি কি করব?”

ঠাকুর—“যা করচ তাই করে যাও। এখন এদিক (ভগবান) ওদিক (সংসার) ছুদিক রেখে চল, তারপর যখন একদিক ভাঙ্গবে তখন যা হয় হবে। তবে সকালে-বিকালে তাঁর স্মরণ-মননটা

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

বেখে।—এই বলিয়া গিরিশের দিকে চাহিলেন, যেন তাঁহার উত্তর প্রতীক্ষা করিতেছেন।

গিরিশ শুনিয়া বিষণ্ণমনে ভাবিতে লাগিলেন, ‘আমার যে
গিরিশের কাজ তাহাতে জ্ঞান-আহার-নিদ্রা প্রভৃতি নিত্য-
মনের কর্মেরই একটা নিয়মিত সময় রাখিতে পারি
অবস্থা না। সকালে-বিকালে স্মরণ-মনন করিতে নিশ্চয়ই
ভুলিয়া যাইব। তাহা হইলে ত মুশকিল—শ্রীগুরুর আজ্ঞালঙ্ঘনে
মহা দোষ ও অনিষ্ট হইবে। অতএব এ কথা কি করিয়া স্বীকার
করি? সংসারে অন্য কাহারও কাছে কথা দিয়াই সে কথা
না রাখিতে পারিলে দোষ হয়, তা যাহাকে পরকালের নেতা
বলিয়া গ্রহণ করিতেছি তাঁহার কাছে—!’ গিরিশ মনের কথা-
গুলি বলিতেও কুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন। আবার ভাবিলেন,
‘কিন্তু ঠাকুর আমাকে তো আর কোন একটা বিশেষ কঠিন
কাজ করিতে বলেন নাই। অপরকে এ কথা বলিলে এখনি
আনন্দের সহিত স্বীকার পাইত।’ কিন্তু তিনি কি করিবেন,
আপনার একান্ত বহিষ্কৃত অবস্থা ঠিক ঠিক দেখিতে পাইয়াই
বুঝিতেছিলেন যে, ধর্মকর্মের অতটুকুও প্রতিদিন করা যেন তাঁহার
সামর্থ্যের অতীত! আবার নিজের স্বভাবের দিকে চাহিয়া
দেখিতে পাইলেন—‘কোনরূপ ব্রত বা নিয়মে চিরকালের নিমিত্ত
আবদ্ধ হইলাম’—এ কথা মনে করিতে গেলেও যেন হাঁপাইয়া
উঠেন এবং ষতক্ষণ না ঐ নিয়ম ভঙ্গ হয় ততক্ষণ যেন প্রাণে
অশান্তি! আজীবন এইরূপে ঘটিয়া আসিয়াছে। নিজের ইচ্ছায়
ভাল-মন্দ যাহা হয় করিতে কোন গোল নাই, কিন্তু যেমন

শ্রীরামকৃষ্ণ—ভাবমুখে

মনে হইল—বাধ্য হইয়া অমুক কাজটা আমাকে করিতে হইতেছে বা হইবে, অমনি মন বাঁকিয়া দাঁড়াইল ! কাজেই আপনার নিতান্ত অপারক ও অসহায় অবস্থা উপলব্ধি করিতে করিতে কাতর হইয়া চুপ করিয়া রহিলেন—‘করিব’ বা ‘করিতে পারিব না’ কোন কথাই বলিতে পারিলেন না ! আর অত সোজা কাজটা করিতে পারিবেন না, একথা লজ্জার মাথা খাইয়া বলেনই বা কিরূপে—বলিলেও ঠাকুর ও উপস্থিত সকলে মনে করিবেনই বা কি ? তাঁহার একান্ত অসহায় অবস্থার কথা হয়ত বুঝিতেই পারিবেন না, আর মুখ ফুটিয়া না বলিলেও মনে নিশ্চয় করিবেন—তিনি একটা চণ্ড করিয়া কথাগুলি বলিতেছেন ।

ঠাকুর গিরিশকে ঐরূপ নীরব দেখিয়া তাঁহার দিকে চাহিলেন এবং তাঁহার মনোগত ভাব বুঝিয়া বলিলেন, “আচ্ছা, তা যদি না পার ত খাবার শোবার আগে তাঁহার একবার স্মরণ করে’ নিও ।”

গিরিশ নীরব । ভাবিলেন উহাই কি করিতে পারিবেন ! দেখিলেন—কোন দিন খান বেলা দশটায়, আর কোন দিন বৈকালে পাঁচটায় ; রাত্রির খাওয়া সম্বন্ধেও ঐ নিয়ম । আবার মামলা-মোকদ্দমার ফ্যাসাদে পড়িয়া এমন দিন গিয়াছে যে, খাইতে বসিয়াছেন বলিয়াই হুঁশ নাই ! কেবলই উদ্বিগ্নচিত্তে ভাবিতেছেন—‘ব্যারিষ্টারকে যে ফি পাঠাইয়াছি তাহা ঠিক সময়ে তাঁহার হাতে পৌঁছিল কিনা খবরটা পাইলাম না, মোকদ্দমার সময় যদি তিনি উপস্থিত না হন তাহা হইলেই তো বিপদ’ ইত্যাদি । কার্যগতিকে ঐরূপ দিন যদি আবার আসে—আর আসাও কিছু অসম্ভব নয়—তাহা হইলে সেদিন ভগবানের স্মরণ-মনন করিতে

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

তো নিশ্চয় ভুলিবেন ! হায় হায়, ঠাকুর এত সোজা কাজ করিতে বলিতেছেন, আর তিনি 'করিব' বলিতে পারিতেছেন না ! গিরিশ বিষম ফাঁপরে পড়িয়া স্থির, নীরব রহিলেন, আর তাঁহার প্রাণের ভিতরে যেন একটা চিন্তা, ভয় ও নৈরাশ্যের বাড় বহিতে লাগিল । ঠাকুর গিরিশের দিকে আবার চাহিয়া হাসিতে হাসিতে এইবার বলিলেন—“তুই বলবি, 'তাও যদি না পারি'—আচ্ছা, তবে আমায় বকলমা^১ দে ।” ঠাকুরের তখন অর্দ্ধবাহুদশা ।

কথাটি মনের মত হইল । গিরিশের প্রাণ ঠাণ্ডা হইল । শুধু ঠাণ্ডা হইল না, ঠাকুরের অপার দয়ার কথা ভাবিয়া তাঁহার উপর ভালবাসা ও বিশ্বাস একেবারে অনস্তধারে উছলিয়া উঠিল । গিরিশ ভাবিলেন, 'যাক্—নিয়মবন্ধন-গুলিকে বাঘ মনে হয়, তাহার ভিতর আর পড়িতে হইল না । এখন যাহাই করি না কেন এইটি মনে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করিলেই হইল যে, ঠাকুর তাঁহার অসীম দিব্যশক্তিবলে কোন-না-কোন উপায়ে তাঁহাকে উদ্ধার করিবেন ।' শ্রীযুত গিরিশ তখন বকলমা বা ঠাকুরের উপর সমস্ত ভার দেওয়ার এইটুকু অর্থই বুঝিলেন ;—বুঝিলেন তাঁহাকে নিজে চেষ্টা বা সাধন-ভজন করিয়া কোন বিষয় ছাড়িতে হইবে না, ঠাকুরই তাঁহার মন হইতে সকল বিষয় নিজশক্তিবলে ছাড়াইয়া

^১ অর্থাৎ ভার দাও । বিষয়কর্মে একব্যক্তি তাহার হইয়া কাজ করিবার ক্ষমতা বা অধিকার অপর কোন ব্যক্তিকে দিলে সে ব্যক্তি তাহার হইয়া সমস্ত লেন-দেন করে, রসিদ চিঠিপত্র লিখে এবং তাহার নামে ঐসকলে সই করিয়া নিয়ে 'বঃ (অর্থাৎ বকলম)—অমুক' বলিয়া নিজের নাম লিখিয়া দেয় ।

শ্রীরামকৃষ্ণ—ভাবমুখে

লইবেন। কিন্তু নিয়মের বন্ধন গলায় পরা অসহ্য বোধ করিয়া
তাহার পরিবর্তে যে তদপেক্ষা শতগুণে অধিক ভালবাসার
বন্ধন স্বেচ্ছায় গলায় তুলিয়া লইলেন তাহা
বকলমা তখন বুঝিতে পারিলেন না। ভাল মন্দ যে
ভালবাসার অবস্থায় পড়ুন না কেন, যশ অপযশ যাহাই আসুক
বন্ধন না কেন, দুঃখ-কষ্ট যতই উপস্থিত হউক না কেন,
নিঃশঙ্কে তাহা সহ করা ভিন্ন তাহার বিরুদ্ধে তাঁহার যে
আর বলিবার বা করিবার কিছুই রহিল না, সে কথা তখন
আর তলাইয়া দেখিলেন না;—দেখিবার শক্তিও হইল না।
অন্য সকল চিন্তা মন হইতে সরিয়া যাইয়া কেবল দেখিতে
লাগিলেন—শ্রীরামকৃষ্ণের অপার করুণা! আর বাড়িয়া
উঠিল—শ্রীরামকৃষ্ণকে ধরিয়া শতগুণে অহঙ্কার। মনে হইল—
'সংসারে যে যা বলে বলুক, যতই ঘৃণা করুক, ইনি তো
সকল সময়ে সকল অবস্থায় আমার—তবে আর কি? কাহাকে
ডরাই?' ভক্তিশাস্ত্র^১ এ অহঙ্কারকে যে সাধনের মধ্য গণ্য
করেন এবং মানবের বহুভাগ্যে আসে বলেন—তাহাই বা তখন
কেমন করিয়া জানিবেন? যাহাই হউক, শ্রীযুত গিরিশ এখন
নিশ্চিন্ত এবং খাইতে-শুইতে-বসিতে ঐ এক' চিন্তা—'শ্রীরামকৃষ্ণ
আমার সম্পূর্ণ ভার লইয়াছেন'—সর্বদা মনে উদ্ভিত থাকিয়া
তাঁহাকে যে ঠাকুরের ধ্যান করাইয়া লইতেছে এবং তাঁহার
সকল কৰ্ম ও মনোভাবের উপর একটা ছাপ দিয়া আধিপত্য
বিস্তার করিয়া আমূল পরিবর্তন আনিয়া দিতেছে তাহা বুঝিতে

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

না পারিলেও সুখী—কারণ তিনি (শ্রীরামকৃষ্ণদেব) যে তাঁহাকে ভালবাসেন এবং আপনার হইতেও আপনার !

ঠাকুর চিরকাল শিক্ষা দিয়াছেন, 'কখন কাহারও ভাব নষ্ট করিতে নাই' এবং প্রত্যেক ভক্তের সহিত ঐরূপ ব্যবহারও নিত্য

গিরিশের

অন্তঃপর

শিক্ষা

করিতেন। শ্রীযুত গিরিশকে পূর্বেও ভাব দিয়া

ধরিয়া এখন হইতে ঐ ভাবের উপযোগী শিক্ষা-

সকলও তাঁহাকে দিতে লাগিলেন। একদিন শ্রীযুত

গিরিশ ঠাকুরের সম্মুখে কোন একটি সামান্য বিষয়ে 'আমি করিব'

বলায় ঠাকুর বলিয়া উঠিলেন, "ও কি গো? অমন করে 'আমি

করুব' বল কেন? যদি না করতে পার? বলবে—ঈশ্বরের ইচ্ছা

হয় তো করবে।" গিরিশও বুঝিলেন, 'ঠিক কথা; আমি যখন

ভগবানের উপর সকল বিষয়ে সম্পূর্ণ ভার দিয়াছি এবং তিনিও

সেই ভার লইয়াছেন, তখন তিনি যদি ঐ কার্য আমার পক্ষে

করা উচিত বা মঙ্গলকর বলিয়া করিতে দেন তবেই তো করিতে

পারিব; নতুবা উহা কেমন করিয়া আপনার সামর্থ্য করিতে

পারিব?'—বুঝিয়া তদবধি আমি করিব, যাইব, ইত্যাদি বলা ও

ভাবগুলো ত্যাগ করিতে লাগিলেন।

এইরূপে দিনের পর দিন যাইতে লাগিল। ক্রমে ঠাকুরের

অদর্শন হইল; স্ত্রী-পুত্রাদির বিয়োগরূপ নানা দুঃখ-

গিরিশের

বকল্‌মার গুঢ়

অর্থবোধ

কষ্ট আসিয়া উপস্থিত হইল; তাঁহার মন কিন্তু

পূর্বের ন্যায় প্রতি ব্যাপারে বলিয়া উঠিতে

লাগিল—'তিনি (শ্রীরামকৃষ্ণদেব) ঐরূপ হওয়া

তোমার পক্ষে মঙ্গলকর বলিয়াই ঐ সকল হইতে দিয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—ভাবমুখে .

তুই তাঁহার উপর ভার দিয়াছিস্, তিনিও লইয়াছেন; কিন্তু কোন্ পথ দিয়া তিনি তোকে লইয়া যাইবেন, তাহা তো আর তোকে লেখাপড়া করিয়া বলেন নাই? তিনি এই পথই তোমর পক্ষে সহজ বুঝিয়া লইয়া যাইতেছেন, তাহাতে তোমর 'না' বলিবার বা বিরক্ত হইবার তো কথা নাই। তবে কি তাঁহার উপর বকল্‌মা বা ভার দেওয়াটা একটা মুখের কথামাত্র বলিয়াছিলি?' ইত্যাদি। এইরূপে যত দিন যাইতে লাগিল ততই গিরিশের বকল্‌মা দেওয়ার গূঢ় অর্থ হৃদয়ঙ্গম হইতে লাগিল। এখনই কি উহার সম্পূর্ণ অর্থ বুঝিতে পারা গিয়াছে? শ্রীযুত গিরিশকে জিজ্ঞাসা করিলে বলেন, "এখনও ঢের বাকি আছে! বকল্‌মা দেওয়ার ভিতর যে এতটা আছে তখন কি তা বুঝেছি! এখন দেখি যে সাধন-ভজন-জপ-তপরূপ কাজের একটা সময়ে অস্ত আছে, কিন্তু যে বকল্‌মা দিয়াছে তার কাজের আর অস্ত নাই—তাকে প্রতি পদে, প্রতি নিঃশ্বাসে দেখতে হয় তাঁর (ভগবানের) উপর ভার রেখে তাঁর জোরে পা-টি, নিঃশ্বাসটি ফেললে, না এই হতচ্ছাড়া 'আমি'টার জোরে সেটি করলে।"

বকল্‌মার প্রসঙ্গে নানা কথা মনে উদয় হইতেছে। জগতের
অবতারেরাই ইতিহাসে দেখিতে পাই ভগবান যীশু, চৈতন্য
বকল্‌মার প্রভৃতি মহাপুরুষগণই কখন কখন কাহাকেও
ভার লইতে ঐরূপে অভয় দিয়াছেন। সাধারণ গুরু ঐরূপ
পারেন

করিবার সামর্থ্য বা অধিকার নাই। সাধারণ গুরু
বা সাধুরা মন্ত্র-তন্ত্র বা ক্রিয়াবিশেষ, যাহা দ্বারা তাঁহারা নিজে
আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করিয়াছেন, তাহাই বড় জোর অপরকে

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

বলিয়া দিতে পারেন। অথবা পবিত্রভাবে নিজ জীবন যাপন করিয়া লোককে পবিত্রতার দিকে আকৃষ্ট করিতে পারেন। কিন্তু নানা বন্ধনে জড়ীভূত হইয়া মানুষ যখন একেবারে অসহায় অবস্থায় উপস্থিত হয়, যখন 'এইরূপ কর' বলিলে সে হতাশ হইয়া বলিয়া উঠে, 'করিব কিরূপে? করিবার শক্তি দাও তো করি' তখন তাহাকে সাহায্য করা সাধারণ গুরুর সাধ্যাতীত। 'তোমার দুষ্কৃতির সকল ভার লইলাম, আমি তোমার হইয়া ঐ সকলের ফলভোগ করিব'—একথা মানবকে মানবের বলা ও তদ্রূপ করা সাধ্যাতীত। মানব-হৃদয়ে ধর্মের ঐরূপ গ্লানি উপস্থিত হইলেই কৃপায় শ্রীভগবান অবতীর্ণ হন এবং তাহার হইয়া ফলভোগ করিয়া তাহাকে সেই বন্ধনের আবর্ত হইতে উদ্ধার করেন। কিন্তু ঐরূপ করিলেও তিনি তাহাকে একেবারে রেহাই দেন না। শিক্ষার নিমিত্ত তাহাকে দিয়া কিছু-না-কিছু করাইয়া লন। ঠাকুর যেমন বলিতেন—

"তাদের (অবতারপুরুষদিগের) কৃপায় মানবের দশ জন্মের ভোগটা এক জন্মে হয়ে যায়।" ব্যক্তির সম্বন্ধে যে রূপ, জাতির সম্বন্ধেও উহা সেইরূপ সত্য। ইহাই গীতায়—

সদৃষ্টান্ত

বিশ্বরূপ-দর্শনের জন্য অর্জুনের দিব্যচক্ষুলাভ বলিয়া, পুরাণে—শ্রীভগবানের কৃপালাভ বলিয়া, বৈষ্ণবশাস্ত্রে—জগাই-মাধাইয়ের উদ্ধারসাধন বা পাষাণদলন বলিয়া এবং খ্রিস্টান-ধর্মে—ঈশ্বরের অপরের ভোগটা নিজের ঘাড়ে লইয়া ভগবানের কোপশমন করা (Atonement) বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণজীবনে যদি ইহার আভাস না পাইতাম, তাহা

শ্রীরামকৃষ্ণ—ভাবমুখে

হইলে কথাটিতে যে সত্য আছে তাহা কখনই বুঝিতে পারিতাম না।

কলিকাতার শ্যামপুকুরে চিকিৎসার জন্ত আসিয়া ঠাকুর যখন থাকেন, তখন একদিন দেখিয়াছিলেন—তাঁহার বকলমা সম্বন্ধে ঠাকুরের দর্শন নিজের সূক্ষ্মশরীরটা স্কুলশরীর হইতে বাহিরে আসিয়া বেড়াইয়া বেড়াইতেছে! ঠাকুর বলিয়াছিলেন, “দেখলুম তার পিঠময় ঘা হয়েছে! ভাব্‌চি কেন এমন হোল? আর মা দেখিয়ে দিচ্ছে—যা তা করে এসে যত লোক ছোঁয়, আর তাদের দুর্দশা দেখে মনে দয়া হয়—সেইগুলো (দুষ্কর্মের ফল) নিতে হয়! সেই সব নিয়ে নিয়ে ঐরূপ হয়েছে। সেইজন্তই তো (নিজের গলা দেখাইয়া) এই হয়েছে। নইলে এ শরীর কখনও কিছু অন্ডায় করে নি—এত (রোগ) ভোগ কেন?” আমরা শুনিয়া অবাক! ভাবিতে লাগিলাম—বাস্তবিকই তবে একজন অপরের কৃতকর্মের ফলভোগ করিয়া তাহাকে ধর্মপথে অগ্রসর করিয়া দিতে পারে? অনেকে তখন ঠাকুরের ঐ কথা শুনিয়া তাঁহার প্রতি ভালবাসায় ভাবিয়াছিলেন—‘হায় হায়, কেন আমরা ঠাকুরকে মিথ্যা-প্রবঞ্চনাদি নানা দুষ্কর্ম করিয়া আসিয়া ছুঁইয়াছি! আমাদের জন্ত তাঁহার এত ভোগ, এত কষ্ট! আর কখনও ঠাকুরের দেবশরীর স্পর্শ করিব না।’

এ সম্বন্ধে ঠাকুরের আর একটি কথা এখানে মনে পড়িতেছে। ঠাকুরের ধবলকুষ্ঠ কোন সময় একটি কুষ্ঠরোগাক্রান্ত (ধবল বা আরোগ্য করা শ্বেতকুষ্ঠ) ব্যক্তি আসিয়া ঠাকুরকে কাতর হইয়া ধরে ও বলে যে, তিনি একবার হাত বুলাইয়া দিলেই তাহার

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

ঐ রোগ হইতে নিষ্কৃতি হয়। ঠাকুর তাহার প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া বলিলেন, “আমি তো কিছু জানি না, বাবু ; তবে তুমি বল্ছ, আচ্ছা, হাত বুলিয়ে দিচ্ছি। মার ইচ্ছা হয় তো সেরে যাবে।”—এই বলিয়া হাত বুলাইয়া দেন। সে দিন সমস্ত দিন ধরিয়া ঠাকুরের হাতে এমন যন্ত্রণা হয় যে, তিনি অস্থির হইয়া জগদম্বাকে বলেন, “মা, আর কখন এমন কাজ কর্ব না।” ঠাকুর বলিতেন, “তার রোগ সেরে গেল— কিন্তু তার ভোগটা (নিজের দেহ দেখাইয়া) এইটের উপর দিয়ে হয়ে গেল।” ঠাকুরের জীবনের ঐ সকল ঘটনা হইতেই মনে হয়, বেদ বাইবেল পুরাণ কোরান তন্ত্র মন্ত্র প্রভৃতি আধ্যাত্মিক শাস্ত্রসকল শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনালোক-সহায়ে বুঝিলে এ যুগে অতি সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে। ঠাকুরও আমাদের বলিয়াছেন—“ওরে, নবাবি আমলের টাকা বাদশাই আমলে চলে না!”

আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, বকল্মা দেওয়াটা বড় সোজা

কথা—দিলেই হইল আর কি। মানুষ প্রবৃত্তির

বকল্মা দেওয়া
সহজ নয়

দাস, ধর্মকর্ম করিতে আসিয়াও কেবল সুবিধাই

খোঁজে—কিরাপে এদিক-ওদিক, সংসারসুখ ও

ভগবদানন্দ, দুইটাই পাইতে পারে তাহাই কেবল দেখিতে থাকে।

সংসারের ভোগসুখগুলোকে এত মধুর, এত অমৃতোপম বলিয়া

বোধ করে যে, সেগুলোকে ছাড়িতে হইবে মনে হইলেও দশদিক

শূন্য দেখে, মনে করে তাহা হইলে কি লইয়া থাকিবে!

সেজন্য আধ্যাত্মিক জগতে বকল্মা দেওয়া চলে গুনিয়াই সে

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ—ভাবমুখে

লাফাইয়া উঠে! মনে করে, তবে আর কি?—আমি চুরি জুয়াচুরি বাটপারি যাহা ইচ্ছা তাহা করিয়া যতটা পারি সংসারে সুখভোগ করি, আর শ্রীচৈতন্য, যীশু বা শ্রীরামকৃষ্ণ আমি পরকালটায়—কারণ মরিতে ত একদিন হইবেই—যাহাতে সুখী হইতে পারি তাহা দেখুন। সে তখন বোঝে না যে, উহা আর কিছুই নহে, কেবল পাঞ্জি মনের জুয়াচুরি—বোঝে না যে ঐরূপে সে নিরন্তর আপনাকে আপনি ঠকাইতেছে। বোঝে না যে উহা আর কিছুই নহে, কেবল আপনার দুষ্কৃতিসকলের ভীষণ মূর্তি দেখিতে হইবে বলিয়া সাধ করিয়া চক্ষে ঠুলি পরিয়া সর্ব-নাশের দিকে অগ্রসর হওয়া—বোঝে না যে ঐ ঠুলি একদিন জোর করিয়া একজন খুলিয়া দিবে এবং সে অকূল পাথার দেখিবে—দেখিবে জুয়াচোরের বকলুমা কেহ লয় নাই! হায় মানব! কত রকমেই না তুমি আপনাকে আপনি ঠকাইতেছ এবং মনে করিতেছ যে, ‘বড় জিতিয়াছি!’ আর ধন্য মহামায়া! তুমি কি ভেঙ্কিই না মানবমনে লাগাইয়াছ! শ্রীরামপ্রসাদ স্বরচিত গীতে তোমায় সম্বোধন করিয়া যাহা বলিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই সম্পূর্ণ সত্য—

সাবাস্ মা দক্ষিণাকালী,

ভুবন ভেঙ্কি লাগিয়ে দিলি

তোর ভেঙ্কির গুটি চরণ ছুটি ভবের ভাগ্যে ফেলে দিলি

এমন বাজিকরের মেরে,

রাখলি বাবারে পাগল সাজারে

নিজে গুণময়ী হয়ে পুরুষ প্রকৃতি হলি।

মনেতে তাই সন্দ করি,

যে চরণ পায়নি ত্রিপুরারি,

প্রসাদ রে সেই চরণ পাবি, তুইও বুঝি পাগল হলি!

বকলুমা অমনি দিলেই দেওয়া যায় না, নানা উচ্চম-অধ্যবসায়ের

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

ফলে মনে বকলুমা দিবার অবস্থা আসিয়া উপস্থিত হইলে,
কোন অবস্থায় তবেই মানব উহা ঠিক ঠিক দিতে পারে; আর
বকলুমা দেওয়া তখনই শ্রীভগবান তাহার ভার লইয়া থাকেন।
চলে সুখী হইবার আশায় সংসারের নানাকাজে ছুটাছুটি

দৌড়াদৌড়ি করিয়া মানব যখন বাস্তবিকই দেখে—“প্রাণহীন
ধরেছি ছায়ায়”, সাধন-ভজন-জপ-তপ করিয়া মানব যখন প্রাণে
প্রাণে বুঝে অনন্ত ভগবানকে পাইবার উহা কখনই উপযুক্ত
মূল্য হইতে পারে না, অদম্য উত্তমে পাহাড় কাটিয়া পথ
করিয়া লইব ভাবিয়া সকল বিষয়ে লাগিয়া মানব যখন বুঝিতে
পারে তাহার কোন ক্ষমতাই নাই তখন সে ‘কে কোথায়
আছ গো, রক্ষা কর’ বলিয়া কাতর কণ্ঠে ডাকিতে থাকে, আর
তখনই শ্রীভগবান তাহার বকলুমা লইয়া থাকেন! নতুবা সাধন

ভজন করিতে বা শ্রীভগবানকে ডাকিতে আমার
মনের জুয়াচুরি ভাল লাগে না, যথেষ্টাচার করিতেই ভাল লাগে,
হইতে সাবধান অতএব তাহাই করিব, আর কেহ ঐ বিষয়ে
প্রতিবাদ করিলে বলিব ‘কেন? আমি ত ভগবানকে বকলুমা
দিয়াছি। তিনি আমায় ঐরূপ করাইতেছেন তা কি করিব?
মনটি কেন তিনি ফিরাইয়া দেন না?’—এ বকলুমা কেবল পরকে
ফাঁকি দিবার এবং নিজেও ফাঁকিতে পড়িবার বকলুমা; উহাতে
‘ইতো নষ্টস্ততো ব্রষ্টঃ’ হইতে হয়।

আর একদিক দিয়া কথাটির আলোচনা করিলে আরও
পরীক্ষার বুঝিতে পারা যাইবে। আচ্ছা বুঝিলাম—তুমি বকলুমা
দিয়াছ, তোমার শ্রীভগবানকে ডাকিবার বা সাধন-ভজন

শ্রীরামকৃষ্ণ—ভাবমুখে

করিবার কোন আবশ্যকতা নাই। কিন্তু ঠিক ঠিক বকল্মা দিলে তোমার প্রাণে প্রাণে সর্বক্ষণ তাঁহার করুণার কথা উদ্ভিত হইতে থাকিবেই থাকিবে—মনে হইবে যে, এই অপার সংসারসমুদ্রে পড়িয়া এতদিন হাবু-ডুবু খাইতেছিলাম, আহা! তিনি আমায় রূপা করিয়া উদ্ধার করিয়াছেন! বল দেখি, ঐরূপ অনুভবে তাঁহার উপর তোমার কতটা ভক্তি-ভালবাসার উদয় হইবে! তোমার হৃদয় তাঁহার উপর কৃতজ্ঞতা ভালবাসায় পূর্ণ হইয়া সর্বদাই যে তাঁহার কথা ভাবিতে ও তাঁহার নাম লইতে থাকিবে—উহা করিতে তোমাকে কি আর বলিয়া দিতে হইবে? সর্পের গ্নায় ক্রুর প্রাণীও আশ্রয়দাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হইয়া বাস্তুসাপ হয় ও বাটীর কাহাকেও দংশন করে না। তোমার হৃদয় কি উহা অপেক্ষাও নীচ যে, যিনি তোমার ইহকাল পরকালের ভার লইলেন, তত্রাচ তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা ভালবাসায় মন পূর্ণ হইল না? অতএব বকল্মা দিয়া যদি বকল্মার শেষ কথা দেখ—তোমার ভগবানকে ডাকিতে ভাল লাগে না, তাহা হইলে বুঝিও তোমার বকল্মা দেওয়া হয় নাই এবং তিনিও তোমার ভার গ্রহণ করেন নাই। ‘বকল্মা দিয়াছি’ বলিয়া আর আপনাকে ঠকাইও না এবং অপাপবিক্র, নিষ্কলঙ্ক ভগবানে নিজকৃত দুষ্কৃতির কালিমা অর্পণ করিও না। উহাতে আপনারই সমূহ ক্ষতি ও অমঙ্গল। ঠাকুরের ‘ব্রাহ্মণের গোহত্যা’ গল্পটি মনে রাখিও :

এক ব্রাহ্মণ অনেক ঘর ও পরিশ্রমে একখানি সুন্দর বাগান করিয়াছিল। নানাজাতীয় ফল-ফুলের গাছ পুঁতিয়াছিল ও

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

সেগুলি দিন দিন নধর হইয়া বাড়িয়া উঠিতেছে দেখিয়া ব্রাহ্মণের
আনন্দের আর সীমা ছিল না। এখন একদিন
ঠাকুরের 'ব্রাহ্মণ
ও গোহত্যা'র
গল্প
দরজা খোলা পাইয়া একটা গরু ঢুকিয়া সেই গাছ-
গুলি মুড়াইয়া খাইতে লাগিল। ব্রাহ্মণ কার্যাস্তরে
গিয়াছিল। আসিয়া দেখে তখনও গরুটা গাছ
খাইতেছে! বিষম কোপে তাড়া করিয়া সেটাকে যেমন এক ঘা
লাঠি মারিয়াছে, আর অমনি মর্ষস্থানে আঘাত লাগায় গরুটা
মরিয়া গেল! ব্রাহ্মণের তখন প্রাণে ভয়—তাইতো হিন্দু হইয়া
গোহত্যা করিলাম? গোহত্যার তুল্য যে পাপ নাই! ব্রাহ্মণ
একটু-আধটু বেদান্ত পড়িয়াছিল। দেখিয়াছিল তাহাতে লেখা
আছে যে, বিশেষ বিশেষ দেবতার শক্তিতে শক্তিমান হইয়া
মানবের ইন্দ্রিয়সকল স্ব-স্ব কার্য করে। যথা—সূর্যের শক্তিতে
চক্ষু দেখে, পবনের শক্তিতে কণ শুনে, ইন্দ্রের শক্তিতে হস্ত
কার্য করে, ইত্যাদি। ব্রাহ্মণের সেই কথাগুলি এখন মনে
পড়ায় ভাবিল—‘তবে তো আমি গোহত্যা করি নাই। ইন্দ্রের
শক্তিতে হস্ত চালিত হইয়াছে—ইন্দ্রই তবে তো গোহত্যা
করিয়াছে!’ কথাটি মনে মনে পাকা করিয়া ব্রাহ্মণ নিশ্চিত
হইল।

এদিকে গোহত্যা-পাপ ব্রাহ্মণের শরীরে প্রবেশ করিতে
আসিল কিন্তু ব্রাহ্মণের মন তাহাকে তাড়াইয়া দিল। বলিল,
“যাও, এখানে তোমার স্থান নাই; গোহত্যা ইন্দ্র করিয়াছে,
তাহার কাছে যাও।” কাজেই পাপ ইন্দ্রকে ধরিতে গেল।
ইন্দ্র পাপকে বলিলেন, “একটু অপেক্ষা কর, আমি ব্রাহ্মণের

শ্রীরামকৃষ্ণ—ভাবমুখে

সহিত দুটো কথা কহিয়া আসি, তারপর আমায় ধরিও।' ঐকথা বলিয়া ইন্দ্র মানবরূপ ধারণ করিয়া ব্রাহ্মণের উত্থানের ভিতর প্রবেশ করিলেন ও দেখিলেন ব্রাহ্মণ অদূরে দাঁড়াইয়া গাছপালার তদারক করিতেছে। ইন্দ্র উত্থানের শোভা দেখিয়া ব্রাহ্মণের যাহাতে কানে যায় এমনভাবে প্রশংসা করিতে করিতে ধীরপদে ব্রাহ্মণের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন; বলিলেন—“আহা, কি সুন্দর বাগান, কি রুচির সহিত গাছপালাগুলি লাগান হইয়াছে, যেখানে যেটি দরকার ঠিক সেখানে সেটি পোতা রহিয়াছে!” এই প্রকার বলিতে বলিতে ব্রাহ্মণের কাছে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—“মহাশয়, বলিতে পারেন বাগানখানি কার? এমন সুন্দরভাবে গাছপালাগুলি কে লাগাইয়াছে?” ব্রাহ্মণ উত্থানের প্রশংসা শুনিয়া আহ্লাদে গদগদ হইয়া বলিল—“আজ্ঞা, এখানি আমার; আমিই এগুলি সব পুঁতিয়াছি। আসুন না, ভাল করিয়া বেড়াইয়া দেখুন না।” এই বলিয়া উত্থান সম্বন্ধে নানাকথা বলিতে বলিতে ইন্দ্রকে উত্থানমধ্যস্থ সব দেখাইয়া বেড়াইতে লাগিল এবং ক্রমে ভুলিয়া মৃত গরুটা যথায় পড়িয়াছিল তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন ইন্দ্র যেন একেবারে চমকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—“রাম, রাম, এখানে গোহত্যা করিল কে?” ব্রাহ্মণ এতক্ষণ উত্থানের সকল পদার্থ ই ‘আমি করিয়াছি, আমি করিয়াছি’ বলিয়া আসিয়াছে; কাজেই গোহত্যা কে করিল জিজ্ঞাসায় বিষম ফাঁপরে পড়িয়া একেবারে নির্বাক—চুপ! তখন ইন্দ্র নিজরূপ পরিগ্রহ করিয়া ব্রাহ্মণকে বলিলেন, “তবে রে ভণ্ড?

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

উড়ানোর যাহা কিছু ভাল সব তুমি করিয়াছ, আর গোহত্যাটাই কেবল আমি করিয়াছি, বটে ? নে তোর গোহত্যা-কৃত পাপ !” এই বলিয়া ইন্দ্র অন্তর্হিত হইলেন এবং পাপও আসিয়া ব্রাহ্মণের শরীর অধিকার করিল ।

যাক্ এখন বকল্‌মার কথা, আমরা পূর্বপ্রসঙ্গের অমুসরণ
সাধকের মনের
উন্নতির সহিত
ঠাকুরের কথার
গভীর অর্থবোধ
করি । ঠাকুরের প্রত্যেক ভক্তকে জিজ্ঞাসা করিলেই
তঁাহারা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন, ঠাকুরের কথা-
গুলির পূর্বে তঁাহারা যে অর্থগ্রহণে সমর্থ হইতেন,
এখন যত দিন যাইতেছে তত সেইগুলির ভিতর
আরও কত গভীর অর্থ তঁাহার কৃপায় বৃদ্ধিতে পারিতেছেন ।
আবার ঠাকুরের অনেক কথা বা ব্যবহার, যাহার অর্থ আমরা তখন
কিছুই বুঝিতে পারি নাই, কেবল হাঁ করিয়া শুনিয়া গিয়াছি মাত্র,
তাহাদের ভিতর এখন অপূর্ব অর্থ ও ভাব উপলব্ধি করিয়া অবাক
হইয়া থাকিতে হয় ! ঠাকুরের কথাই ছিল—“ওরে, কালে হবে,
কালে বুঝবি । বিচিটা পুঁতলেই কি অমনি ফল
‘কালে হবে’
পাওয়া যায় ? আগে অঙ্কুর হবে, তারপর চারা গাছ
হবে, তারপর সেই গাছ বড় হয়ে তাতে ফুল ধরবে, তারপর ফল—
সেই রকম । তবে লেগে থাকতে হবে, ছাড়লে হবে না ; এই গানটায়
কি বল্‌ছে শোন ।” এই বলিয়া ঠাকুর মধুরকণ্ঠে গান ধরিতেন—

হরিষে লাগি রহো রে ভাই ।

তেরা বনত বনত বনি যাই—তেরা বিগড় বাত বনি যাই ॥

অঙ্ক তারে বঙ্ক তারে তারে সুজন কসাই

(আওর্) শুগা পড়ায়কে গণিকা তারে, তারে মীরাবাই ।

দৌলত হুনিয়া মাল খাজানা, বেনিয়া বয়েল চালাই
 (আওর্) এক বাতকো টাণ্টা পড়ে তো খোজ খবর না পাই ।
 এয়সী ভক্তি কর যট ভিতর, ছোড় কপট চতুরাঈ
 সেবা বন্দি আওর্ অধীনতা সহজ মিলি রঘুরাঈ ॥

—গান গাহিয়া আবার বলিতেন, “তঁার সেবা, বন্দনা ও অধীনতা—
 কি না দীনভাব ; এই নিয়ে বিখাস করে পড়ে থাকতে থাকতে
 সব হবে, তঁার দর্শন পাওয়া যাবেই যাবে ।
 সাধনে লাগিয়া তা’ না করে ছেড়ে দিলে কিন্তু ঐ পর্য্যন্তই
 থাকি আবশ্যক হ’ল । একজন চাকরি করে কষ্টে-স্বষ্টে কিছু
 কিছু করে টাকা জমাত । একদিন গুণে দেখে যে হাজার
 টাকা জমেছে । অমনি আহ্লাদে আটখানা হয়ে মনে করলে,
 তবে আর কেন চাকরি করা ? হাজার টাকা ত জমেছে, আর
 কি ? এই বলে চাকরি ছেড়ে দিলে । এতটুকু আধার, এতটুকু
 আশা ! ঐ পেয়েই সে ফুলে উঠলো, ধরাকে সরাখানা দেখতে
 লাগল । তারপর—হাজার টাকা খরচ হতে আর ক’দিন
 লাগে ? অল্প দিনেই ফুরিয়ে গেল । তখন দুঃখ-কষ্টে আবার
 চাকরির জন্ম ফ্যা-ফ্যা করে বেড়াতে লাগল । ও রকম করলে
 চলবে না, তঁার (ভগবানের) দ্বারে পড়ে থাকতে হবে ; তবে
 ত হবে !”

আবার কখন কখন গানটির দ্বিতীয় চরণ—‘তেরা বনত
 ম্যাদাটে ভক্তি বনত বনি যাই’ অর্থাৎ ভক্তি করিতে করিতে
 ত্যাগ করা ফল পাওয়া যাইবে ; গাহিতে গাহিতে বলিয়া
 উঠিলেন—“দূর শালা ! ‘বনত বনত’ কি ? অমন ম্যাদাটে

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

ভক্তি করতে নাই। মনে জোর করতে হয়—এখনি হবে, এখনি তাঁকে পাব। ম্যাদাটে ভক্তির কৰ্ম কি তাঁকে পাওয়া?”

ঠাকুরকে দেখিলেই বাস্তবিকই মনে হইত, যেন একটি জলন্ত ভাবঘনমূর্তি!—যেন পুঞ্জীকৃত ধর্মভাবরাশি একত্র সম্বদ্ধ হইয়া

ভাবঘনমূর্তি
ঠাকুরের
প্রত্যেক ভাবের
সহিত দৈহিক
পরিবর্তন

জমাট বাঁধিয়া রহিয়াছে বলিয়াই আমরা তাঁহার একটা আকার ও রূপ দেখিতে পাইতেছি! মনের ভাবপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শরীরটার পরিবর্তন হওয়ার কথা আমরা বলিয়াই থাকি ও কালে-ভদ্রে কখন একটু-আধটু প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি; কিন্তু

মনের ভাবতরঙ্গ যে শরীরে এতটা পরিবর্তন আনিয়া দিতে পারে, তাহা কখন স্বপ্নেও ভাবি নাই। নির্বিকল্প সমাধিতে ‘আমি’-জ্ঞানের একেবারে লোপ হইল—আর অমনি সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুরের হাতের নাড়ি, হৃদয়ের স্পন্দন, সব বন্ধ হইয়া গেল; শ্রীযুত মহেন্দ্র লাল সরকার প্রভৃতি ডাক্তারেরা যন্ত্রসহায়ে পরীক্ষা করিয়াও হৃৎপিণ্ডের কার্য কিছুই পাইলেন না।^১ তাহাতেও সন্দেহ না হইয়া জনৈক ডাক্তারবন্ধু ঠাকুরের চক্ষুর তারা বা মণি অঙ্গুলির দ্বারা স্পর্শ করিলেন—তথাচ উহা মৃত ব্যক্তির গায় কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হইল না! ‘সখীভাব’-সাধনকালে আপনাকে শ্রীকৃষ্ণের দাসী ভাবিতে ভাবিতে মন তন্ময় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শরীরেও স্ত্রী-সুলভ

১ গলরোগের চিকিৎসার জন্য শ্রামপুকুরের বাসায় যখন ঠাকুর থাকেন, তখন আমাদের সম্মুখে এই পরীক্ষা হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ—ভাবমুখে

ভাব, উঠা-বসা, দাঁড়ান, কথাকথা প্রভৃতি প্রত্যেক কার্যে এমন প্রকাশ পাইতে লাগিল যে, শ্রীযুত মথুরানাথ মাদ্র প্রভৃতি যাহারা চব্বিশঘণ্টা ঠাকুরের সঙ্গে উঠা-বসা করিত, তাহারাও তাঁহাকে দেখিয়া অনেকবার কোন আগন্তুক স্ত্রীলোক হইবে বলিয়া ভ্রমে পড়িল ! এইরূপ কত ঘটনাই না আমরা দেখিয়াছি ও ঠাকুরের নিজ মুখ হইতে শুনিয়াছি—যাহাতে বর্তমানে মনোবিজ্ঞান ও শরীরবিজ্ঞানের বাঁধা-ধরা নিয়মগুলিকে পাল্টাইয়া বাঁধিতে হয়। সে সব কথা বলিলেও কি লোকে বিশ্বাস করিবে ?

কিন্তু সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যের বিষয় দেখিয়াছি ঠাকুরের ভাবরাজ্যের সর্বত্র বিচরণ করিবার ক্ষমতা—ছোট-বড় সব রকম ভাব বুঝিতে পারা ! বালক, যুবা, বৃদ্ধ, সকলের ঠাকুরের সকলের মনোভাব—বিষয়ী, সাধু, জ্ঞানী, ভক্ত, স্ত্রী, সকলপ্রকার ভাব ধরিবার ক্ষমতা পুরুষ সকলের হৃদগত ভাব ধরিয়া কে কোন্ পথে কতদূর ধর্মরাজ্যে অগ্রসর হইয়াছে, পূর্ব সংস্কারানুযায়ী ঐ পথ দিয়া অগ্রসর হইতে তাহার কিরূপ সাধনেরই বা বর্তমানে প্রয়োজন, সকল কথা বুঝিতে পারা ও তাহাদের প্রত্যেকের অবস্থানুযায়ী ঠিক ঠিক ব্যবস্থা করা ! দেখিয়া শুনিয়া মনে হয়, ঠাকুর যেন মানবমনে যতপ্রকার ভাব উঠিয়াছে, উঠিতে পারে বা পরে উঠিবে, সে সকল ভাবই নিজ জীবনে অনুভব করিয়া বসিয়া আছেন এবং ঐ সকল ভাবের প্রত্যেকটির তাঁহার নিজের মনের ভিতর আবির্ভাব হইতে তিরোভাবকাল পর্য্যন্ত পর পর তাঁহার যে যে অবস্থা হইয়াছিল, তাহাও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে স্মরণ করিয়া রাখিতে পারিয়াছেন ! আর

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

তজ্জগুই ইতরসাধারণ মানব যে যখন আসিয়া যে ভাবের কথা বলিতেছে, নিজের ঐ সকল পূর্বানুভূত ভাবের সহিত মিলাইয়া তখনি তাহা ধরিতেছেন, বুঝিতেছেন ও তদুপযোগী বিধান করিতেছেন। সকল বিষয়েই যেন এইরূপ। মায়ামোহ, সংসার-তাড়না, ত্যাগ-বৈরাগ্যের অনুষ্ঠান প্রভৃতি সকল বিষয়েই কেহ কোন অবস্থায় পড়িয়া উহা হইতে উদ্ধার পাইবার পথ খুঁজিয়া না পাইয়া কাতর-জিজ্ঞাসু হইয়া আসিলে ঠাকুর পথের সন্ধান ত দিয়া দিতেনই, আবার অনেক সময়েই সঙ্গে সঙ্গে নিজের ঐ অবস্থায় পড়িয়া যে রূপ অনুভূতি হইয়াছিল তাহাও বলিতেন। বলিতেন, “ওগো, তখন এইরূপ হইয়াছিল ও এইরূপ করিয়া-ছিলাম” ইত্যাদি। বলিতে হইবে না—এরূপ করায় জিজ্ঞাসুর মনে কত ভরসার উদয় হইত এবং ঠাকুর তাহার জগু যে পথ নির্দিষ্ট করিয়া দিতেন, কতদূর বিশ্বাস ও উৎসাহে সে সেই পথে অগ্রসর হইত! শুধু তাহাই নহে, এইরূপে নিজ জীবনের ঘটনা বলায় জিজ্ঞাসুর মনে হইত ঠাকুর তাহাকে কত ভাল-বাসেন!—আপনার মনের কথাগুলি পর্য্যন্ত বলেন! দুই একটি দৃষ্টান্তেই বিষয়টি সম্যক বুঝিতে পারা যাইবে।

সিঁছুরিয়াপটির শ্রীযুত মণিমোহন মল্লিকের একটি উপযুক্ত পুত্রের মৃত্যু হইল। মণিমোহন পুত্রের সংকার করিয়াই ঠাকুরের নিকট আসিয়া উপস্থিত। ঠাকুরকে ১ম দৃষ্টান্ত— মণিমোহনের পুত্রশোকের কথা অভিবাদন করিয়া বিমর্ষভাবে ঘরের একপাশে বসিলেন। দেখিলেন, ঘরে স্ত্রী-পুরুষ অনেক-গুলি জিজ্ঞাসু ভক্ত বসিয়া রহিয়াছেন এবং ঠাকুর তাঁহাদের

শ্রীরামকৃষ্ণ—ভাবমুখে

সহিত নানা সংপ্রসঙ্গ করিতেছেন। বসিবার অল্পক্ষণ পরেই ঠাকুরের দৃষ্টি তাঁহার উপর পড়িল এবং ঘাড় নাড়িয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি গো? আজ এমন শুকনো দেখছি কেন?”

মণিমোহন বাষ্পগদগদ কণ্ঠে উত্তর করিলেন—(পুত্রের নাম করিয়া) “অমুক আজ মারা পড়িয়াছে।”

বৃদ্ধ মণিমোহনের সেই রুক্ষবেশ ও শোকনিরুদ্ধ কণ্ঠস্বর শুনিয়া গৃহাভ্যন্তরস্থ সকলেই স্তম্ভিত, নীরব! সকলেই বুঝিলেন, বৃদ্ধের হৃদয়ের সেই গভীর মর্ষবেদনা ও উথলিত শোকাবেগ বাক্যে রুদ্ধ হইবার নহে। তথাচ বৃদ্ধের বিলাপ ও ক্রন্দনে ব্যথিত হইয়া—সংসারের ধারাই ঐ প্রকার, সকলকেই একদিন মরিতে হইবে, যাহা হইয়াছে সংশ্র ক্রন্দনেও তাহা ফিরিবার নহে, অতএব শোক পরিত্যাগ কর, সহ কর—এইরূপ নানা কথায় তাঁহাকে শান্ত করিতে লাগিলেন। সৃষ্টির প্রাক্কাল হইতেই মানব শোকসন্তপ্ত নরনারীকে ঐ সকল কথা বলিয়া আসিয়া আসিতেছে; কিন্তু হায়, কয়টা লোকের প্রাণ তাহাতে শান্ত হইতেছে? কেনই বা হইবে? মন, মুখ এবং অনুষ্ঠিত কর্ম—তিনটি পদার্থ একই ভাবে ভাবিতে থাকিলে তবেই আমাদের উচ্চারিত বাক্যসমূহ অপরের প্রাণস্পর্শ করিয়া তাহাতে সমভাবের তরঙ্গ উত্থাপিত করিতে পারে। এখানে যে তাহার একান্তাভাব! আমরা মুখে সংসার অনিত্য বলিয়া প্রতি চিন্তায় ও কার্যে তাহার বিপরীত অনুষ্ঠান করিয়া থাকি; নিশার স্বপ্নসম সংসারটা অনিত্য বলিয়া ভাবিতে অপরকে উপদেশ করিয়া নিজে সর্বদা প্রাণে প্রাণে উহাকে নিত্য বলিয়া ভাবি এবং

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

চিরকালের মত এখানে থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়া থাকি ।
আমাদের কথায় সে শক্তি কোথা হইতে আসিবে ?

অপর সকলে মণিমোহনকে ঐরূপে নানা কথা कहিলেও
ঠাকুর এক্ষেত্রে অনেকক্ষণ কোন কথাই না कहিয়া মণিমোহনের
শোকোচ্ছ্বাস কেবল শুনিয়াই যাইতে লাগিলেন । তাঁহার তখনকার
সেই উদাসীন ভাব দেখিয়া কেহ কেহ বিস্মিত হইয়া ভাবিতেও
লাগিলেন—ইহার হৃদয় কি কঠোর, কি করুণাশূন্য !

বৃদ্ধের কথা শুনিতে শুনিতে কতক্ষণ পরে ঠাকুর অর্দ্ধবাহু-
দশা প্রাপ্ত হইলেন এবং সহসা তাল ঠুকিয়া দাঁড়াইয়া শ্রীযুক্ত
মণিমোহনকে লক্ষ্য করিয়া অপূর্ব তেজের সহিত গান ধরিলেন—

জীব সাজ সমরে

ঐ দেখ্ রণবেশে কাল প্রবেশে তোর ঘরে ।

আরোহণ করি মহাপুণ্য-রথে ভজন-সাধন ছুটো অথ জুড়ে তাতে

দিয়ে জ্ঞান-ধনুকে টান ভক্তি-ব্রহ্মবাণ সংযোগ কর রে ।

আর এক যুক্তি আছে শুন সুসঙ্গতি,

সব শত্রু নাশের চাইনে রথরথী

রণভূমি যদি করেন দাশরথি ভাগীরথীর তীরে ॥

গানের বীরত্বব্যঞ্জক সুর ও তদনুরূপ অঙ্গভঙ্গী ঠাকুরের নয়ন
হইতে নিঃসৃত বৈরাগ্য ও তেজের সহিত মিলিত হইয়া সকলের
প্রাণে তখন এক অপূর্ব আশা ও উত্তমের স্রোত প্রবাহিত করিল ।
সকলেরই মন তখন শোক-মোহের রাজ্য হইতে উখিত হইয়া এক
অপূর্ব ইন্দ্রিয়াতীত, সংসারাতীত, বিমল ঈশ্বরীয় আনন্দে পূর্ণ
হইল । মণিমোহনও উহা প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়া এখন
শোক-তাপ ভুলিয়া স্থির, গম্ভীর, শান্ত !

শ্রীরামকৃষ্ণ—ভাবমুখে

গীত শাস্ত্র হইল—কিন্তু গীতোক্ত কয়েকটি বাক্যের সহায়ে ঠাকুর যে দিব্য ভাবতরঙ্গ উত্থাপিত করিয়াছিলেন, তাহাতে ঘর অনেকক্ষণ অবধি জম্জম্ করিতে লাগিল! ঈশ্বরই একমাত্র আপনার, মন-প্রাণ তাঁহাকে অর্পণ করিলাম—তিনি কৃপা করুন, দর্শন দিন—এইভাবে আত্মহারা হইয়া সকলে স্থির হইয়া বসিয়া রহিলেন। কিয়ৎকাল পরে ঠাকুরের সমাধিভঙ্গ হইলে তিনি মণিমোহনের নিকটে বসিয়া বলিতে লাগিলেন—

“আহা! পুত্রশোকের মত কি আর জালা আছে? খোলটা (দেহ) থেকে বেরোয় কি না? খোলটার সঙ্গে সম্বন্ধ—যত দিন খোলটা থাকে ততদিন থাকে।”

এই বলিয়া ঠাকুর নিজ ভ্রাতৃপুত্র অক্ষয়ের মৃত্যুর কথা দৃষ্টান্ত-স্বরূপে তাহাকে বলিতে লাগিলেন। এমন বিমর্ষ-গম্ভীরভাবে ঠাকুর কথাগুলি বলিতে লাগিলেন যে, স্পষ্ট বোধ হইতে লাগিল তিনি যেন আপনার আত্মীয়ের মৃত্যু পুনরায় চক্ষুর সম্মুখে দেখিতেছেন! বলিলেন, “অক্ষয় মলো—তখন কিছু হল না। কেমন করে মানুষ মরে, বেশ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলুম। দেখলুম—যেন খাপের ভেতর তলোয়ারখানা ছিল, সেটাকে খাপ থেকে বার করে নিলে; তলোয়ারের কিছু হলো না—যেমন তেমনি থাকল, খাপটা পড়ে রইল! দেখে খুব আনন্দ হলো—খুব হাসলুম, গান করলুম, নাচলুম! তার শরীরটাকে তো পুড়িয়ে-ঝুড়িয়ে এল! তার পরদিন (ঘরের পূর্বে, কালীবাড়ীর উঠানের সামনের বারাণ্ডার দিকে দেখাইয়া) ঐখানে দাঁড়িয়ে আছি আর দেখছি কি যেন প্রাণের ভিতরটায় গামছা

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

যেমন নেংড়ায় তেমনি নেংড়াচ্ছে, অক্ষয়ের জন্ত প্রাণটা এমনি কচ্ছে! ভাবলুম, মা, এখানে (আমার) পরনের কাপড়ের সঙ্গেই সম্বন্ধ নাই, তা ভাইপোর সঙ্গে তো কতই ছিল! এখানেই (আমার) যখন এরকম হচ্ছে তখন গৃহীদের শোকে কি না হয়!—তাই দেখাচ্ছি, বটে!”

কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর আবার বলিতে লাগিলেন, “তবে কি জান? যারা তাঁকে (ভগবানকে) ধরে থাকে তারা এই বিষম শোকেও একেবারে তলিয়ে যায় না। একটু নাড়াচাড়া খেয়েই সামলে যায়। চুনোপুঁটির মত আধারগুলো একেবারে অস্থির হয়ে ওঠে বা তলিয়ে যায়। দেখনি? গঙ্গায় ষ্টীমারগুলো গেলে ছেলেডিম্বিগুলো কি করে? মনে হয় যেন একেবারে গেল—আর সামলাতে পারলে না। কোনখানা বা উন্টেই গেল! আর বড় বড় হাজারমুণে কিস্তিগুলো ছুঁচারবার টাল্-মাটাল্ হয়েই যেমন তেমনি—স্থির হলো। ছুঁচারবার নাড়াচাড়া কিন্তু খেতেই হবে।”

আবার কিছুক্ষণ বিমর্ষ-গস্তীরভাবে থাকিয়া ঠাকুর বলিতে লাগিলেন, “কয়দিনের জন্তেই বা সংসারের এ সকলের (পুত্রাদির) সঙ্গে সম্বন্ধ! মানুষ স্থখের আশায় সংসার করতে যায়—বিয়ে করলে, ছেলে হলো, সেই ছেলে আবার বড় হলো, তার বিয়ে দিলে—দিন কতক বেশ চললো। তারপর এটার অস্থখ, ওটা মলো, এটা ব’য়ে গেল—ভাবনায়, চিন্তায় একেবারে ব্যতিব্যস্ত; যত রস মরে তত একেবারে ‘দশ ডাক’ ছাড়তে থাকে। দেখনি?—ভিয়েনের উত্তনে কাঁচা

শ্রীরামকৃষ্ণ—ভাবমুখে

সুন্দরীর চেলাগুলো প্রথমটা বেশ জলে। তারপর কাঠখানা যত পুড়ে আসে কাঠের সব রসটা পেছনের দিক দিয়ে ঠেলে বেরিয়ে গাঁজলার মত হয়ে ফুটতে থাকে আর চুঁ-টা, ফুস্-ফাস্ নানা-রকম আওয়াজ হতে থাকে—সেই রকম।” এইপ্রকারে সংসারের অনিত্যতা ও অসারতা এবং শ্রীভগবানের শরণাপন্ন হওয়াতেই একমাত্র সুখ—ইত্যাদি বিষয়ে নানাকথা कहিয়া মণিমোহনকে বুঝাইতে লাগিলেন। মণিমোহনও সামলাইয়া বলিলেন, “এই-জগুই তো আপনার কাছে ছুটে এলুম। বুলুম—এ জালা আর কেউ শাস্ত করতে পারবে না।”

আমরা তখন ঠাকুরের এই অদৃষ্টপূর্ব ব্যবহার দেখিয়া অবাক হইয়া ভাবিতে লাগিলাম—ইহাকেই আমরা পূর্বে কঠোর উদাসীন ভাবিতেছিলাম। যিনি যথার্থ মহৎ, তাঁহার ছোট ছোট কাজগুলিও অপর সাধারণের ন্যায় হয় না। ছোট-বড় প্রত্যেক কার্যেই তাঁহার মহত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। এইমাত্র কিছুক্ষণ পূর্বে সমাধি বা ঈশ্বরের সহিত নৈকট্য-উপলব্ধিতে যাহার হৃদয়ের স্পন্দন পর্যন্ত রহিত হইয়া গিয়াছিল, ইনি কি তিনি? সেই ঠাকুরই কি বাস্তবিক মণিমোহনের অবস্থার সহিত সহানুভূতিতে একেবারে সাধারণ মানবের ন্যায় হইয়াছেন? ‘মায়া হায়’—ছোট কথা বলিয়া বৃদ্ধের কথা ইনি তো উড়াইয়া দিতে পারিতেন? সে ক্ষমতা যে ইহার নাই তাহা ত নহে? কিন্তু ঐরূপে মহত্বখ্যাপন করিলে বুঝিতাম, ইনি বড় হন বা আর যাহা কিছু হন, লোকগুরু—জগদগুরু ঠাকুর নহেন। বুঝিতাম, মানবসাধারণের ভাব বুঝিবার ইহার ক্ষমতা নাই এবং বলিতাম, স্ত্রী-পুত্রের প্রতি

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

মমতায় দুর্বল মানব আমাদের মত অসহায় অবস্থায় ইনি যদি একবার পড়িতেন, তবে কেমন করিয়া মায়ার খেলায় উদাসীন থাকিতে পারিতেন তাহা দেখিতাম !

পরক্ষণেই আবার হয়ত কোন যুবক আসিয়া বিষণ্ণচিত্তে ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিল, “মশায়, কাম কি করে যায় ? এত চেষ্টা করি, তবুও মধ্যে মধ্যে ইন্দ্রিয়চঞ্চল্য ও কুভাব মনে উপস্থিত হয়ে বড় অশান্তি আসে।”

ঠাকুর—“ওরে, ভগবদর্শন না হলে কাম একেবারে যায় না। তা (ভগবানের দর্শন) হলেও শরীর যতদিন থাকে

২য় দৃষ্টান্ত—
কাম দূর করা
সম্বন্ধে ঠাকুরের
কথা

ততদিন একটু-আধটু থাকে, তবে মাথা তুলতে পারে না। তুই কি মনে করিস্ আমারই একেবারে গেছে ? এক সময়ে মনে হয়েছিল যে কামটাকে জয় করেছি। তারপর পঞ্চবটীতে বসে আছি,

আর এমনি কামের তোড় এল যে আর যেন সামলাতে পারি নি ! তারপর ধুলোয় মুখ ঘসড়ে কাঁদি আর মাকে বলি, ‘মা, বড় অগ্র্যায় করেছি, আর কখন ভাবব না যে কাম জয় করেছি’—তবে যায়। কি জানিস্—(তোদের) এখন ঘোঁবনের বগা এসেছে ! তাই বাঁধ দিতে পাচ্ছি না। বান যখন আসে তখন কি আর বাঁধ-টাঁধ মানে ? বাঁধ উছলে ভেঙ্গে জল ছুটতে থাকে। লোকের ধান-ক্ষেতের ওপর এক বাঁশ সমান জল দাঁড়িয়ে যায় ! তবে বলে—কলিতে মনের পাপ, পাপ নয়। আর মনে একবার আধবার কখন কুভাব এসে পড়ে তো—‘কেন এল’ বলে’ বসে বসে তাই ভাবতে থাকবি কেন ? ওগুলো কখন কখন শরীরের ধর্মে

শ্রীরামকৃষ্ণ—ভাবমুখে

আসে যায়—শৌচ-পেছাপের চেষ্টার মত মনে করবি। শৌচ-পেছাপের চেষ্টা হয়েছিল বলে লোকে কি মাথায় হাত দিয়ে ভাবতে বসে? সেই রকম ঐ ভাবগুলোকে অতি সামান্য, তুচ্ছ, হয়ে জ্ঞান করে মনে আর আনবি না। আর তাঁর নিকটে খুব প্রার্থনা করবি, হরিনাম করবি ও তাঁর কথাই ভাববি। ও ভাব-গুলো এল কি গেল—সেদিকে নজর দিবি না। এরপর ওগুলো ক্রমে ক্রমে বাঁধ মানবে।” যুবকের কাছে ঠাকুর যেন এখন যুবকই হইয়া গিয়াছেন!

এই প্রসঙ্গে শ্রীযুত যোগেনের কথা মনে পড়িতেছে। স্বামী যোগানন্দ ঠাহার মত ইন্দ্রিয়জিৎ পুরুষ বিরল দেখিয়াছি,

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে একদিন ঐ প্রশ্ন করেন।

৩য় দৃষ্টান্ত—

যোগানন্দকে ঐ

সম্বন্ধে উপদেশ

ঠাহার বয়স তখন অল্প, বোধ হয় ১৪।১৫ হইবে

এবং অল্পদিনই ঠাকুরের নিকট গতয়াত

করিতেছেন। সে সময় নারায়ণ নামে এক

হঠযোগীও দক্ষিণেশ্বরে পঞ্চবটীতলে কুটীরে থাকিয়া নেতি-ধৌতি^১

ইত্যাদি ক্রিয়া দেখাইয়া কাহাকেও কাহাকেও কোতূহলাকৃষ্ট

করিতেছে। যোগেন স্বামীজি বলিতেন, তিনিও তাহাদের মধ্যে

একজন ছিলেন এবং ঐ সকল ক্রিয়া দেখিয়া ভাবিয়াছিলেন, ঐ

১ দুই অঙ্গুলি চণ্ডা ও প্রায় দশ-পনের হাত লম্বা একটা স্ফাকড়ার ফালি ভিজাইয়া আন্তে আন্তে গিলিয়া ফেলা ও পরে তাহা আবার টানিয়া বাহির করার নাম নেতি। আর ২।৩ সের জল খাইয়া পুনরায় বমন করিয়া ফেলার নাম ধৌতি। গুহ্বার দিয়া জল টানিয়া বাহির করাকেও ধৌতি বলে। হঠযোগীরা এইরূপে শরীর-মধ্যস্থ সমস্ত প্লেথাদি বাহির করিয়া ফেলেন। ঠাহারা বলেন—ইহাতে শরীরে রোগ আসিতে পারে না এবং উহা দৃঢ় হয়।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

সকল না করিলে বোধ হয় কাম যায় না এবং ভগবদর্শন হয় না। তাই প্রশ্ন করিয়া বড় আশায় ভাবিয়াছিলেন, ঠাকুর কোন একটা আসন-টাসন বলিয়া দিবেন, বা হরিতকী কি অন্য কিছু খাইতে বলিবেন, বা প্রাণায়ামের কোন ক্রিয়া শিখাইয়া দিবেন। যোগেন স্বামীজি বলিতেন—“ঠাকুর আমার প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন, ‘খুব হরিনাম করবি, তা হলে যাবে’। কথাটা আমার একটুও মনের মত হলো না। মনে মনে ভাবলুম—উনি কোন ক্রিয়া-ট্রিয়া জানেন না কিনা, তাই একটা যা তা বলে দিলেন। হরিনাম করলে আবার কাম যায়!—তা হলে এত লোক ত কচ্ছে, যাচ্ছে না কেন? তারপর একদিন কালীবাটীর বাগানে এসে ঠাকুরের কাছে আগে না গিয়ে পঞ্চবটীতে হঠযোগীর কাছে দাঁড়িয়ে তার কথাবার্তা মুগ্ধ হয়ে শুনছি, এমন সময় দেখি ঠাকুর স্বয়ং সেখানে এসে উপস্থিত! আমাকে দেখেই ডেকে আমার হাত ধরে নিজের ঘরের দিকে যেতে যেতে বলতে লাগলেন, ‘তুই ওখানে গিয়েছিলি কেন? ওখানে যাসু নি। ওসব (হঠযোগের ক্রিয়া) শিখলে ও করলে শরীরের উপরেই মন পড়ে থাকবে। ভগবানের দিকে যাবে না।’ আমি কিন্তু ঠাকুরের কথাগুলি শুনে ভাবলুম—পাছে আমি ঠাকুর (ঠাকুরের) কাছে আর না আসি, তাই এই সব বলছেন। আমার বরাবরই আপনাকে বড় বুদ্ধিমান বলে ধারণা, কাজেই বুদ্ধির দৌড়ে ঐরূপ ভাবলুম আর কি! আমি তাঁর কাছে আসি বা না-ই আসি তাতে তাঁর (ঠাকুরের) যে কিছুই লাভ-লোকমান নাই—একথা তখন মনেও এল না! এমন পাজি সন্দিক্ধ মন ছিল! ঠাকুরের কৃপার শেষ নাই, তাই এত

শ্রীরামকৃষ্ণ—ভাবমুখে

সব অণ্ডায় ভাব মনে এনেও স্থান পেয়েছিলাম। তারপর ভাবলুম—উনি (ঠাকুর) যা বলেছেন, তা করেই দেখি না কেন—কি হয়? এই বলে একমনে খুব হরিনাম করতে লাগলুম। আর বাস্তবিকই অল্পদিনেই, ঠাকুর যেমন বলেছিলেন, প্রত্যক্ষ ফল পেতে লাগলুম।”

এইরূপে সকলের সকল অবস্থা ও ভাব ধরিবার কথার কতই না দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। সিঁড়ুরিয়াপটির মল্লিকমহাশয়ের কথা পূর্বেই বলিয়াছি। তাঁহার ভক্তিমতী জনৈকা আত্মীয়াও ঠাকুরের নিকট যাওয়া-আসা করিতেন। একদিন আসিয়া তিনি বিশেষ কাতরভাবে জানাইলেন যে, ভগবানের ধ্যান করিতে বসিলে সংসারের চিন্তা, এর কথা, তার মুখ ইত্যাদি মনে পড়িয়া বড়ই অশান্তি আসে। ঠাকুর অমনি তাঁর ভাব ধরিলেন; বুঝিলেন, ইনি কাহাকেও ভালবাসেন—যাহার কথা ও মুখ মনে পড়ে। জিজ্ঞাসা করিলেন, “কার মুখ মনে পড়ে গো? সংসারে কাকে ভালবাস বল দেখি?” তিনি উত্তর করিলেন, “একটি ছোট ভ্রাতৃপুত্রকে”—যাহাকে তিনি মাহুষ করিতেছিলেন। ঠাকুর বলিলেন, “বেশ তো, তার জন্ম যা কিছু করবে, তাকে খাওয়ান-পরান ইত্যাদি সব, গোপাল ভেবে করো। যেন গোপাল-রূপী ভগবান তার ভেতরে রয়েছেন—তুমি তাঁকেই খাওয়াচ্ছ, পরাচ্ছ, সেবা করচ্ছ—এই রকম ভাব নিয়ে করো। মাহুষের করুচি ভাববি কেন গো? যেমন ভাব তেমন লাভ।” শুনিতে পাই ঐরূপ করার ফলে অল্পদিনেই তাঁহার বিশেষ মানসিক উন্নতি, এমন কি ভাবসমাধি পর্য্যন্ত হইয়াছিল।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

ঠাকুরের নিজের পুরুষ শরীর ছিল, সেজন্য তাঁহার পুরুষের ভাব বুঝা ও ধরাটা কতক বুদ্ধিতে পারা যায়। কিন্তু স্ত্রীজাতি—

ঠাকুরের
স্ত্রী-জাতির
সর্বপ্রকার
মনোভাব
ধরিবার
ক্ষমতা

কোমলতা, সন্তানবাৎসল্য প্রভৃতি মনোভাবের জন্য ভগবান তাহাদের পুরুষ অপেক্ষা একটা অঙ্গই অধিক দিয়াছেন—তাহাদের সকল ভাব ঠাকুর কি করিয়া ঠিক ঠিক ধরিতেন, তাহা ভাবিলে আর আশ্চর্যের সীমা থাকে না। ঠাকুরের স্ত্রী-ভক্তেরা বলেন, “ঠাকুরকে আমাদের পুরুষ বলিয়াই অনেক

সময় মনে হইত না। মনে হইত—যেন আমাদেরই একজন। সেজন্য পুরুষের নিকটে আমাদের যেমন সঙ্কোচ-লজ্জা আসে, ঠাকুরের নিকটে তাহার কিছুই আসিত না। যদি বা কখন আসিত তো তৎক্ষণাৎ আবার ভুলিয়া যাইতাম ও আবার নিঃসঙ্কোচে মনের কথা খুলিয়া বলিতাম।” ‘ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সখী বা দাসী আমি’—এই ভাবনা দীর্ঘকাল ধরিয়া ভাবিয়া ভাবিয়া তন্ময় হইয়া

উহার কারণ ‘পুরুষ আমি’ এ ভাবটি ঠাকুর একেবারে ভুলিয়া

গিয়াছিলেন বলিয়াই কি ঐরূপ হইত? পতঞ্জলি তাঁহার যোগসূত্রে বলিয়াছেন, ‘তোমার মন হইতে হিংসা যদি একেবারে ত্যাগ হয়, তো মানুষের ত কথাই নাই, জগতে কেহই—বাঘ সাপ প্রভৃতিও—তোমাকে আর হিংসা করিবে না। তোমাকে দেখিয়া তাহাদের মনে হিংসা-প্রবৃত্তিরই উদয় হইবে না।’ হিংসার ন্যায় কাম ক্রোধাদি অগ্র সকল বিষয়েও তদ্রূপ বুদ্ধিতে হইবে। পুরাণে এ বিষয়ের অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। একটি বলিলেই চলিবে। মায়াহীন নিষ্কলঙ্ক যুবক শুক ভগবদ্ভাবে অহরহঃ

শ্রীরামকৃষ্ণ—ভাবমুখে

নিমগ্ন থাকিয়া সংসার ছাড়িয়া যাইতেছেন, আর বৃদ্ধ পিতা ব্যাস পুত্রমায়ায় অন্ধ হইয়া ‘কোথা যাও, কোথা যাও’ বলিতে বলিতে পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিয়াছেন। পশ্চিমধ্যে সরোবর-তীরে বস্ত্র রাখিয়া অঙ্গরাগণ স্নান করিতেছিলেন। শুককে দেখিয়া তাঁহাদের মনে কিছুমাত্র সঙ্কোচ বা লজ্জার উদয় হইল না—যেমন স্নান করিতে-ছিলেন তেমনই করিতে লাগিলেন। কিন্তু বৃদ্ধ ব্যাস তথায় উপস্থিত হইবামাত্র সকলে সসম্মুখে শরীর বস্ত্রাচ্ছাদিত করিলেন ! ব্যাস ভাবিলেন—‘এতো বেশ ! আমার যুবক পুত্র অগ্রে যাইল, তাহাতে কেহ একটু নড়িলও না, আর আমি বৃদ্ধ, আমাকে দেখিয়া এত লজ্জা !’ কারণ-জিজ্ঞাসায় রমণীরা বলিলেন, “শুক এত পবিত্র যে ‘তিনি আত্মা’ এই চিন্তাই তাঁহার সর্বক্ষণ রহিয়াছে। তাঁহার নিজের স্ত্রীশরীর কি পুরুষশরীর সে বিষয়ে আদৌ ছঁশই নাই। কাজেই তাঁহাকে দেখিয়া লজ্জা আসিল না। আর তুমি বৃদ্ধ, রমণীর হাবভাব কটাক্ষের অনেক পরিচয় পাইয়াছ ও রূপ-লাবণ্যের অনেক বর্ণনাও করিয়াছ ; তোমার শুকের মত স্ত্রীপুরুষে আত্মদৃষ্টি নাই এবং হইবেও না, কাজেই তোমাকে দেখিয়া আমাদের পুরুষবুদ্ধির উদয় হইয়া সঙ্গে সঙ্গে লজ্জা আসিল।”

ঠাকুরের সম্বন্ধে ঠিক ঐ কথাই মনে হয়। তাঁহার জলন্ত

স্ত্রীজাতির ঠাকুরের
নিকট সর্বথা
নিঃসঙ্কোচ ব্যব-
হারের কারণ
আত্মজ্ঞান ও স্ত্রী-পুরুষ সকলের ভিতর, সর্বভূতে
আত্মদৃষ্টি তাঁহার নিকটে যতক্ষণ থাকা যাইত
ততক্ষণ সকলের মন এত উচ্চে উঠাইয়া রাখিত
যে, ‘আমি পুরুষ’, ‘তিনি স্ত্রী’—এসকল ভাব অনেক

সময়ে মনেই উঠিত না। কাজেই পুরুষের গ্যায় স্ত্রীজাতিরও

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

তাঁহার নিকট সঙ্কোচাদি না হইবারই কথা। শুধু তাহাই নহে, ঠাকুরের সংসর্গে ঐ আত্মদৃষ্টি তাঁহাদের ভিতর তৎকালে এত বদ্ধমূল হইয়া যাইত যে, যে-সকল কাজকে মেয়েরা অসীম সাহসের কাজ বলেন ও কখনও কাহারও দ্বারা আদিষ্ট হইয়া করিতে পারেন না, ঠাকুরের কথায় সেই-সকল কাজ অবাধে অনায়াসে সম্পন্ন করিয়া আসিতেন! সম্ভ্রাস্তবংশীয়া স্ত্রীলোক যাঁহারা গাড়ী-পাকী ভিন্ন কোথাও কখন গমনাগমন করিতেন না, ঠাকুরের আজ্ঞায় তাঁহারাও কখন কখন তাঁহার সহিত দিনের বেলায় পদব্রজে সদর রাস্তা দিয়া গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত অনায়াসে হাঁটিয়া আসিয়া নৌকা করিয়া দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে গমন করিয়াছেন; শুধু তাহাই নহে, সেখানে যাইয়া হয়ত আবার ঠাকুরের আজ্ঞায় নিকটস্থ বাজার হইতে বাজার করিয়া আনিয়াছেন এবং সন্ধ্যার সময় পুনরায় হাঁটিয়া কলিকাতায় নিজ বাড়ীতে ফিরিয়াছেন। ঐ বিষয়ে দু-একটি দৃষ্টান্ত এখানে দিলেই কথাটি বেশ বুঝিতে পারা যাইবে।

১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের ভাদ্র বা আশ্বিন মাস, শ্রীশ্রীমা তখন পিত্রালয় জয়রামবাড়ীতে গিয়াছেন। শ্রীযুত বলরাম বসু ঐ সম্বন্ধে দৃষ্টান্ত তাঁহার পিতার সহিত বৃন্দাবন গিয়াছেন। সঙ্গে শ্রীযুত রাখাল (ব্রহ্মানন্দ স্বামীজি), শ্রীযুত গোপাল (অষ্টৈতানন্দ স্বামী) প্রভৃতি ও অন্যান্য অনেকগুলি স্ত্রী-পুরুষ গিয়াছেন। বাগবাজারের একটি সম্ভ্রাস্তবংশীয়া স্ত্রীলোকের— যিনি ঠাকুরকে কখন দেখেন নাই, কথামাত্রই শুনিয়াছেন— ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসিবার বিশেষ ইচ্ছা হইল; পরিচিতা

শ্রীরামকৃষ্ণ—ভাবমুখে

আর একটি স্ত্রীলোককে ঐ কথা বলিলেন। পরিচিতা স্ত্রী-ভক্তটি দুই বৎসর পূর্ব হইতে ঠাকুরের নিকট যাওয়া-আসা করিতেছেন, সেজন্যই তাঁহাকে বলা। পরামর্শ স্থির হইল; পরদিন অপরাহ্নে নৌকায় করিয়া উভয়ে দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত। দেখিলেন—ঠাকুরের ঘরের দ্বার রুদ্ধ। ঘরের উত্তরের দেয়ালে দুটি ফোকর আছে, তাহার ভিতর দিয়া উঁকি মারিয়া দেখিলেন—ঠাকুর বিশ্রাম করিতেছেন। কাজেই নহবতে, যেখানে শ্রীশ্রীমা থাকিতেন, গিয়া বসিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। একটু পরেই ঠাকুর উঠিলেন এবং উত্তরের দরজা খুলিয়া নহবতের দ্বিতলের বারাণ্ডায় তাঁহারা বসিয়া আছেন দেখিতে পাইয়া “ওগো, তোরা এখানে আয়” বলিয়া ডাকিলেন। স্ত্রী-ভক্তেরা আসিয়া আসন গ্রহণ করিলে ঠাকুর তক্তা হইতে নামিয়া পরিচিতা স্ত্রী-ভক্তটির নিকট যাইয়া বসিলেন। তিনি তাহাতে সঙ্কুচিতা হইয়া সরিয়া বসিবার উপক্রম করিলে ঠাকুর বলিলেন, “লজ্জা কি গো? লজ্জা ঘণা ভয়—তিন থাকতে নয়। (হাত নাড়িয়া) তোরাও যা, আমিও তাই। তবে (দাড়ির চুলগুলি দেখাইয়া) এইগুলি আছে বলে লজ্জা হচ্ছে—না?”

এই বলিয়া ভগবৎপ্রসঙ্গ পাড়িয়া নানা কথার উপদেশ করিতে লাগিলেন। স্ত্রী-ভক্তেরাও স্ত্রী-পুরুষ-ভেদ ভুলিয়া যাইয়া নিঃসঙ্কোচে প্রশ্ন করিতে ও শুনিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ কথাবার্তার পর বিদায়কালে ঠাকুর বলিলেন, “সপ্তাহে একবার করে আসবে। নূতন নূতন এখানে আসা-যাওয়াটা বেশী রাখতে হয়।” আবার সম্ভ্রান্তবংশীয়া হইলেও গরীব দেখিয়া নৌকা বা

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

গাড়ীর ভাড়া নিত্য নিত্য কোথা পাইবেন ভাবিয়া ঠাকুর আবার বলিতে লাগিলেন, “আসবার সময় তিন-চার জনে মিলে নৌকায় করে আসবে। আর যাবার সময় এখান থেকে হেঁটে বরানগরে গিয়ে ‘সেয়ারে’ গাড়ী করবে।” বলা বাহুল্য, স্ত্রী-ভক্তেরা তদবধি তাহাই করিতে লাগিলেন।

আর একজন আমাদের একদিন বলিয়াছিলেন—“ভোলা ময়রার দোকানে বেশ সর করেছিল। ঠাকুর সর খেতে ভাল-বাসতেন জানতুম, তাই বড় একখানি সর কিনে ঐ সম্বন্ধে ২য় দৃষ্টান্ত আমরা পাঁচজনে মিলে নৌকা করে দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত। ও মা, এসেই শুনলুম কলিকাতায় গিয়াছেন! সকলে তো একেবারে বসে পড়লুম। কি হবে? রামলাল দাদা ছিলেন—তাকে ঠাকুর কোথায় গিয়াছেন জিজ্ঞাসা করায় বলে দিলেন, ‘কম্বুলেটোলায় মাষ্টার মহাশয়ের বাড়ীতে।’ অ—র মা শুনে বললে, ‘সে বাড়ী আমি জানি, আমার বাপের বাড়ীর কাছে—যাবি? চল্ যাই; এখানে বসে আর কি করব?’ সকলেই তাই মত করলে। রামলাল দাদার হাতে সরখানি দিয়ে বলে গেলুম, ‘ঠাকুর এলে দিও।’ নৌকা তো ছেড়ে দিয়েছিলুম—হেঁটে হেঁটেই সকলে চললুম। কিন্তু এমনি ঠাকুরের ইচ্ছে, আলমবাজারটুকু গিয়েই একখানা ফেরতা গাড়ী পাওয়া গেল। ভাড়া করে তো শ্রামপুকুরে সব এলুম। এসে আবার বিপদ। অ—র মা বাড়ী চিনতে পারলে না। শেষে ঘুরে ঘুরে তার বাপের বাড়ীর সামনে গাড়ী দাঁড় করিয়ে একটা চাকরকে ডেকে আনলে। সে সঙ্গে এসে দেখিয়ে দেয়, তবে

শ্রীরামকৃষ্ণ—ভাবমুখে

হয়! অ—র মা'রই বা দোষ দেব কি, আমাদের চেয়ে ৩৪ বছরের ছোট তো? তখন ছাব্বিশ-সাতাশ বছরের হবে। বৌ মানুষ, রাস্তাঘাটে কখনও বেরোয় নি, আর গলির ভেতরে বাড়ী^১—সে চিনবেই বা কেমন করে গা?

“যা হোক করে তো পৌছলুম। তখন মাষ্টারদের (পরিবারের) সঙ্গেও চেনাশুনা হয় নি। বাড়ী ঢুকে দেখি একখানি ছোট ঘরে তক্তাপোশের ওপর ঠাকুর বসে, কাছে কেউ নাই। আমাদের দেখেই হেসে বলে উঠলেন, ‘তোরা এখানে কেমন করে এলি গো?’ আমরা তাঁকে প্রণাম করে সব কথা বললুম। তিনি খুব খুশী, ঘরের ভেতর বসতে বললেন, আর অনেক কথাবার্তা কইতে লাগলেন। এখন সকলে বলে, মেয়েদের তিনি ছুঁতে দিতেন না—কাছে যেতে দিতেন না! আমরা শুনে হাসি ও মনে করি—তবু আমরা এখনও মরি নি! তাঁর যে কি দয়া ছিল, তা কে জানবে! স্ত্রী-পুরুষে সমান ভাব! তবে স্ত্রীলোকের হাওয়া অনেকক্ষণ সহ্য করতে পারতেন না, অনেকক্ষণ থাকলে বলতেন, ‘যা গো’ এইবার একবার মন্দিরে দর্শন করে আয়।’ পুরুষদেরও ঐরূপ বলতে আমরা শুনেছি।

“যা'ক। আমরা তো বসে কথা কইছি। আমাদের ভেতর যে দুজনের বেশী বয়েস ছিল তারা দরজার সামনেই বসেছে,

১ ঠাকুরের পরম ভক্ত শ্রীযুত মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত—যিনি ‘শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত’ প্রকাশ করিয়া সাধারণের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন—তখন কলিকাতা কল্লিয়ারাটোলায় একটি ভাড়াটিয়া বাড়ীতে থাকিতেন।

শ্রী শ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

আর আমরা তিন জনে ঘরের ভেতর, এককোণে ; এমন সময়ে ঠাকুর যাকে ‘মোটী বামুন’ বলতেন (শ্রীযুত প্রাণকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়) তিনি এসে উপস্থিত । বেরিয়ে যাব—তারও জ্ঞো নেই ! কোথায় যাই ! বড়ীরা দরজার সামনেই একটা জানালা ছিল তাইতে বসে রইল । আর আমরা তিনটেই ঠাকুর যে তক্তাপোশে বসেছিলেন তার নীচে ঢুকে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে রইলুম ! মশার কামড়ে সর্ব্বাঙ্গ ফুলে উঠলো, কি করি—নড়বার জ্ঞো নেই, স্থির হয়ে পড়ে রইলুম । কথাবার্তা কয়ে বামুন প্রায় এক ঘণ্টা বাদে চলে গেল, তখন বেরুই আর হাসি !

“তারপর বাড়ীর ভেতর জল খাবার জন্ত ঠাকুরকে নিয়ে গেল । তখন তাঁর সঙ্গে—বাড়ীর ভেতর গেলুম । তারপর খেয়ে-দেয়ে কতক্ষণ বাদে ঠাকুর গাড়ীতে উঠলেন (দক্ষিণেশ্বরে ফিরিবেন বলিয়া) ; তখন সকলে হেঁটে বাড়ী ফিরি । রাত তখন ৯টা হবে ।

“তার পরদিন আবার দক্ষিণেশ্বরে গেলুম । যাবামাত্র ঠাকুর কাছে এসে বল্লেন, ‘ওগো, তোমার সর প্রায় সবটা খেয়েছিলুম, একটু বাকি ছিল ; কোন অসুখ করে নি, পেটটা একটু সামান্য গরম হয়েছে ।’

আমি তো শুনে অবাক ! তাঁর পেটে কিছু সর না, আর একখানা সর তিনি একেবারে খেয়েছেন ! তারপর শুন্লুম—ভাবাবস্থায় খেয়েছেন । শুন্লুম—মাষ্টার মহাশয়ের বাড়ী থেকে ঠাকুর খেয়ে-দেয়ে তো রাত্রি সাড়ে দশটায় এসে

শ্রীরামকৃষ্ণ—ভাবমুখে

পৌছলেন ; এসে খানিক বাদে তাঁর ভাব হয় ও অর্ধবাহু দশায় রামলাল দাদাকে বলেন, 'বড় ক্ষুধা পেয়েছে, ঘরে কি আছে দে ত রে।' রামলাল দাদা শুনে আমার সেই সরখানি এনে সামনে দেন ও ঠাকুর তা প্রায় সব খেয়ে ফেলেন ! ভাবের ঘোরে তাঁর কখন কখন অমন অসম্ভব খাওয়াও খেয়ে হজম করার কথা মা-র কাছে ও লক্ষ্মীদিদির কাছে শুনেছিলুম, সেই সব কথা মনে পড়ল। এত রুপা আমরা তাঁর কাছ থেকে পেয়েছি ! সে যে কি দয়া, তা বলে বোঝাবার নয় ! আর সে কি টান ! কেমন করে যে আমরা সব যেতুম, করতুম—তা আমরাই জানি না, বুঝি না। কই—এখন তো আর সে রকম করে কোথাও হেঁটে বলা নেই কওয়া নেই অচেনা লোকের বাড়ীতে সাধু দেখতে বা ধর্মকথা শুনতে যেতে পারি না ! সে যার শক্তিতে করতুম তাঁর সঙ্গে গিয়েছে ! তাঁকে হারিয়ে এখনও কেন যে বেঁচে আছি, তা জানি না !”

এইরূপ আরও কতই না দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। ঝাঁহারা কখনও বাটীর বাহির হন নাই—তাঁহাদের দিয়া বাজার করাইয়া আনিয়াছেন, অভিমান অহঙ্কার দূরে যাইবে বলিয়া সাধারণ ভিখারীর গায় লোকের বাড়ী বাড়ী ভিক্ষা করাইয়াছেন, সঙ্গে লইয়া পেনেটির মহোৎসব ইত্যাদি দেখাইয়া আনিয়াছেন—আর তাঁহারাও মনে কোন দ্বিধা না করিয়া মহানন্দে যাহা ঠাকুর বলিয়াছেন, তাহাই করিয়াছেন ! ভাবিয়া দেখিলে ইহা একটি কম ব্যাপার বলিয়া মনে হয় না ; সে প্রবল জ্ঞানতরঙ্গের সম্মুখে সকলেরই ভেদজ্ঞানপ্রসূত দ্বিধাভাব তখনকার মত ভাসিয়া

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

গিয়াছে। সে উজ্জ্বল ভাবঘনতম ঠাকুরের ভিতর সকলেই নিজ নিজ ভাবের পূর্ণাদর্শ দেখিতে পাইয়া আপনাদের কৃতার্থ জ্ঞান করিয়াছে। পুরুষ পুরুষের পূর্ণবিকাশ দেখিয়া নতশির হইয়াছে ; স্ত্রী স্ত্রীজনমূলভ সকল ভাবের বিকাশ তাঁহাতে দেখিতে পাইয়া নিঃসঙ্কোচে তাঁহাকে আপনার হইতেও আপনার জ্ঞান করিয়াছে।

স্ত্রীজাতিমূলভ হাবভাবাদি ঠাকুর কখন কখন আমাদের সাক্ষাতে নকল করিতেন। উহা এত ঠিক ঠিক হইত যে, আমরা অবাক হইতাম। জনৈকা স্ত্রী-ভক্ত ঐ সম্বন্ধে ঠাকুরের একদিন আমাদের বলিয়াছিলেন, ঠাকুর একদিন স্ত্রীমূলভ হাবভাবের অনুকরণ তাঁহাদের সামনে স্ত্রীলোকেরা পুরুষ দেখিলে যেরূপ হাবভাব করে তাহা দেখাইতে আরম্ভ করিলেন—“সে মাথায় কাপড় টানা, কানের পাশে চুল সরিয়ে দেওয়া, বুকে কাপড় টানা, ঢং করে নানারূপ কথা কওয়া—একেবারে ছবছ ঠিক। দেখে আমরা হাসতে লাগলুম, কিন্তু মনে মনে লজ্জা আর কষ্টও হল যে, ঠাকুর মেয়েদের এই রকম করে হয় জ্ঞান করছেন। ভাবলুম—কেন, সকল স্ত্রীলোকেরাই কি ওই রকম? হাজার হোক আমরা মেয়ে কিনা, মেয়েদের ওরকম করে কেউ ব্যাখ্যানা করলে মনে কষ্ট হতেই পারে। ওমা, ঠাকুর অমনি আমাদের মনের ভাব বুঝতে পেরেছেন। আর বলছেন, ‘ওগো, তোদের বল্চি না। তোরা তো অবিদ্যাশক্তি নোস্; ওসব অবিদ্যাশক্তিগুলো করে!’”

শ্রীরামকৃষ্ণ—ভাবমুখে

ঠাকুরের স্ত্রী-পুরুষ উভয় ভাবের এইরূপ একত্র সমাবেশ তাঁহার প্রত্যেক ভক্তই কিছু-না-কিছু উপলব্ধি করিয়াছে। শ্রীযুক্ত গিরিশ ঐরূপ উপলব্ধি করিয়া একদিন ঠাকুরকে জিজ্ঞাসাই করিয়া ফেলেন, ‘মশাই, আপনি পুরুষ না প্রকৃতি?’ ঠাকুর হাসিয়া তদুত্তরে বলিলেন, “জানি না।” ঠাকুর ঐ কথাটি আত্মজ্ঞ পুরুষেরা যেমন বলেন, ‘আমি পুরুষও নহি, স্ত্রীও নহি’—সেইভাবে বলিলেন, অথবা নিজের ভিতর উভয় ভাবের সমান সমাবেশ দেখিয়া বলিলেন, সে কথা এখন কে মীমাংসা করিবে?

এইরূপে ভাবময় ঠাকুর ভাবমুখে থাকিয়া স্ত্রীর কাছে স্ত্রী ও পুরুষের কাছে পুরুষ হইয়া তাহাদের প্রত্যেকের সকল ভাব ঠিক ঠিক ধরিতেন। আমাদের কাহারও কাহারও কাছে একথা তিনি স্বয়ংই ব্যক্ত করিয়াছেন। পরম ভক্তিমতী জনৈকা স্ত্রীভক্ত^১ আমাদিগকে বলিয়াছেন, ঠাকুর তাঁহাকে একদিন বলিতেছেন, “লোকের দিকে চেয়েই—কে কেমন বুঝতে পারি; কে ভাল কে মন্দ, কে সুজন্মা কে বেজন্মা, কে জ্ঞানী কে ভক্ত, কার হবে (ধর্মলাভ)—কার হবে না—সব জানতে পারি; কিন্তু বলি না—তাদের মনে কষ্ট হবে, তাই!” ভাবমুখে থাকায় সমগ্র জগৎটাই তাঁহার নিকট সদা সর্বক্ষণ ভাবময় বলিয়াই প্রতীত হইত। বোধ হইত—স্ত্রী-পুরুষ, গরু-ঘোড়া, কাঠ-মাটি সকলই যেন বিরাট মনে এক-একটি ভিন্ন ভিন্ন ভাবসমষ্টিরূপে

১ স্বামী প্রেমানন্দজীর মাতাঠাকুরাণী

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

উঠিতেছে, ভাসিতেছে—আর ঐ ভাবাবরণের ভিতর দিয়া অনন্ত অখণ্ড সচ্চিদাকাশ কোথাও অল্প, কোথাও অধিক পরিমাণে প্রকাশিত রহিয়াছে ; আবার কোথাও বা আবরণের নিবিড়তায় একেবারে আচ্ছন্ন হইয়া যেন নাই বলিয়া বোধ হইতেছে । আনন্দময়ীর নিষ্কলঙ্ক মানসপুত্র ঠাকুর জগদম্বার পাদপদ্মে স্বেচ্ছায় শরীর-মন, চিত্তবৃত্তি, সর্বস্ব অর্পণ করিয়া সমাধিবলে অশরীরী আনন্দস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার সহিত চিরকালের নিমিত্ত মিলিত হইতে যাত্রা করিয়াছিলেন, কিন্তু তথায় পৌঁছিয়া জগন্মাতার অন্তরূপ ইচ্ছা জানিতে পারিলেন এবং তাঁহারই আশ্রয় শিরোধার্য করিয়া দ্বৈতাদ্বৈতবিবাজিত অনির্বচনীয় অবস্থায় লীন আপনার মনকে জোর করিয়া আবার বিচার আবরণে আবরিত করিয়া নিয়ত মা-র আদেশ পালন করিতে থাকিলেন । অনন্তভাবময়ী জগজ্জননীও ঠাকুরের প্রতি প্রসন্ন হইয়া ঠাকুরকে শরীরী করিয়া রাখিয়াও একত্বের এত উচ্চপদে তাঁহার মনটি সর্বক্ষণ রাখিয়া দিলেন যে, অনন্ত বিরাট মনে যতকিছু ভাবের উদয় হইতেছে, তৎসকলই সেখান হইতে তাঁহার নিজস্ব বলিয়া সর্বকালে অনুভূত হইত এবং এতদূর আয়ত্তীভূত হইয়া থাকিত যে, দেখিলেই মনে হইত—যিনি মাতা তিনিই সন্তান এবং যিনি সন্তান তিনিই মাতা—‘চিন্ময় ধাম, চিন্ময় নাম, চিন্ময় শ্যাম !’

আমরা যতটুকু বলিতে পারিলাম বলিলাম ; পাঠক, এইবার তুমি ভাবিয়া দেখ অনন্তভাবরূপী এ ঠাকুর কে ?

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভাব, সমাধি ও দর্শন সম্বন্ধে কয়েকটি কথা

সর্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ ।

ইষ্টোহসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্ ॥

—গীতা, ১৮।৬৪

ঠাকুরের আবির্ভাব বা প্রকাশের পূর্বে কলিকাতায় শিক্ষিত বা অশিক্ষিত সকলেই যে ভাব সমাধি বা আধ্যাত্মিক রাজ্যের অপূর্ব দর্শন ও উপলক্ষিসমূহ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিল, একথা বলিলে অত্যাক্তি হইবে না। অশিক্ষিত জনসাধারণের ঐ সম্বন্ধে ভয়-বিশ্বয়-সম্ভূত একটা কিঙ্কৃতকিমাকার ধারণা ছিল এবং নবীন শিক্ষিতসম্প্রদায় তখন ধর্মজ্ঞানবিবর্জিত বিদেশী শিক্ষার শ্রোতে সম্পূর্ণরূপে অন্ধ ঢালিয়া ঐরূপ দর্শনাদি হওয়া অসম্ভব বা মস্তিষ্কের বিকারপ্রসূত বলিয়া মনে করিতেন। আধ্যাত্মিক রাজ্যের ভাবসমাধি হইতে উৎপন্ন শারীরিক বিকারসমূহ তাঁহাদের নয়নে মূর্ছা ও শারীরিক রোগবিশেষ বলিয়াই প্রতিভাত হইত। বর্তমান কালে ঐ অবস্থার অনেকটা পরিবর্তন হইলেও ভাব এবং সমাধি-বহু যথাযথ বুঝিতে এখনও অতি অল্প লোকেই সক্ষম। আবার শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাবমুখাবস্থা কিঞ্চিন্নাত্রও বুঝিতে হইলে সমাধিতত্ত্ব সম্বন্ধে একটা মোটামুটি জ্ঞান থাকার

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

নিতাস্ত প্রয়োজন। সেজ্ঞ ঐ বিষয়েই কিছু-কিছু আমরা এখন পাঠককে বুঝাইবার প্রয়াস পাইব।

সাধারণ মানবে যাহা উপলব্ধি করে না তাহাকেই আমরা সচরাচর ‘বিকার’ বলিয়া থাকি। ধর্মজগতের সূক্ষ্ম উপলব্ধি-

সমূহ কিন্তু কখনই সাধারণ মানবমনের অনুভবের
সমাধি মস্তিষ্ক-
বিকার নহে
বিষয় হইতে পারে না; উহাতে শিক্ষা, দীক্ষা ও

নিরন্তর অভ্যাসাদির প্রয়োজন। ঐ সকল

অসাধারণ দর্শন ও অনুভবাদি সাধককে দিন দিন পবিত্র করে ও
নিত্য নূতন বলে বলীয়ান এবং নব নব ভাবে পূর্ণ করিয়া ক্রমে
চিরশান্তির অধিকারী করে। অতএব ঐ সকল দর্শনাদিকে
‘বিকার’ বলা যুক্তিসঙ্গত কি? ‘বিকার’ মাত্রই যে মানবকে
দুর্বল করে ও তাহার বুদ্ধি-ভুক্তি হ্রাস করে, এ কথা সকলকেই
স্বীকার করিতে হইবে। ধর্মজগতের দর্শনানুভূতিসকলের ফল
যখন উহার সম্পূর্ণ বিপরীত তখন ঐ সকলের কারণও সম্পূর্ণ
বিপরীত বলিতে হইবে এবং তজ্জন্ম ঐ সকলকে মস্তিষ্ক-বিকার
বা রোগ কখনও বলা চলে না।

বিশেষ বিশেষ ধর্ম্যানুভূতিসকল ঐরূপ দর্শনাদি দ্বারাই
চিরকাল অনুভূত হইয়া আসিয়াছে। তবে যতক্ষণ না মনের

সকল বৃত্তি নিরুদ্ধ হইয়া মানব নির্বিকল্প অবস্থায়
সমাধি দ্বারাই
ধর্মলাভ হয়
উপনীত ও অদ্বৈতভাবে অবস্থিত হয়, ততক্ষণ সে
ও চিরশান্তি
পাওয়া যায়
আধ্যাত্মিক জগতের চিরশান্তির অধিকারী হইতে
পারে না। শ্রীরামকৃষ্ণদেব যেমন বলিতেন—

“একটা কাঁটা ফুটেছে, আর একটা কাঁটা দিয়ে পূর্বের সেই

ভাব, সমাধি ও দর্শন সম্বন্ধে কয়েকটি কথা

কাঁটাটা তুলে ফেলে ছোটো কাঁটাই ফেলে দিতে হয়।” শ্রীভগবানকে ভুলিয়া এই জগৎ-রূপ বিকার উপস্থিত হইয়াছে। এই সকল নানা রূপ-রসাদির অনুভবরূপ বিকার ধর্মজগতের পূর্বোক্ত দর্শনানুভবাদির দ্বারা প্রতিহত হইয়া মানবকে ক্রমশঃ ঐ অদ্বৈতানুভূতিতে উপস্থিত করে। তখন ‘রসো বৈ সঃ’—এই ঋষিবাক্যের উপলব্ধি হইয়া মানব ধন্য হয়; ইহাই প্রণালী। ধর্ম-জগতের যত কিছু মত, অনুভব, দর্শনাদি সব ঐ লক্ষ্যেই মানবকে অগ্রসর করে। শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজি ঐ সকল দর্শনাদিকে সাধক লক্ষ্যাভিমুখে কতদূর অগ্রসর হইল তাহারই পরিচায়ক-স্বরূপ (mile-stones on the way to progress) বলিয়া নির্দেশ করিতেন। অতএব পাঠক যেন না মনে করেন, ভাব-বিশেষের কিঞ্চিৎ প্রাবল্যে অথবা ধ্যানসহায়ে দুই-একটি দেবমূর্তি-দর্শনাদিতেই ধর্মের ‘ইতি’ হইল; তাহা হইলে বিষম ভ্রমে পতিত হইতে হইবে। সাধকেরা ধর্মজগতে ঐরূপ বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াই লক্ষ্য হারাইয়া থাকেন এবং লক্ষ্য হারাইয়া একদেশীভাবাপন্ন হইয়া পরম্পরের প্রতি ঘেঁষ, হিংসাদিতে পূর্ণ হইয়া পড়েন। শ্রীভগবানে ভক্তি করিতে যাইয়া ঐ ভ্রম উপস্থিত হইলেই মানুষ ‘গোঁড়া’ ‘একঘেয়ে’ হয়। ঐ দোষই ভক্তি-পথের বিষম কণ্টক-স্বরূপ এবং মানবের ‘হীনবুদ্ধি’-প্রসূত।

আবার ঐরূপ দর্শনাদিতে বিশ্বাসী হইয়া অনেকে বুঝিয়া বসেন, যাহার ঐরূপ দর্শনাদি হয় নাই সে আর ধার্মিক নহে। ধর্ম ও লক্ষ্য-বিহীন অদ্ভুতদর্শন-পিপাসা (miracle-mongering) তাঁহাদের নিকট একই ব্যাপার বলিয়া প্রতিভাত হয়। কিন্তু

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

ঐরূপ পিপাসায় ধর্মলাভ না হইয়া মানব দিন দিন সকল বিষয়ে
 দুর্বলই হইয়া পড়ে। যাহাতে একনিষ্ঠ বুদ্ধি ও
 দেবমূর্ত্যাদি-
 দর্শন না হই-
 লেই যে ধর্ম-
 পথে অগ্রসর
 হওয়া যায় না,
 তাহা নহে

হইয়া মানব দিন দিন নানা বাসনা-কামনায়
 জড়ীভূত হয়, তাহা ধর্মরাজ্যের বহির্ভূত। অপূর্ব

দর্শনাদি যদি তোমার জীবনে ঐরূপ ফল প্রসব না করিয়া
 থাকে, অথচ দর্শনাদিও হইতে থাকে, তবে জানিতে হইবে—তুমি
 এখনও ধর্মরাজ্যের বাহিরে রহিয়াছ, তোমার ঐ সকল দর্শনাদি
 মস্তিষ্ক-বিকারজনিত, উহার কোন মূল্য নাই। আর যদি অপূর্ব
 দর্শনাদি না করিয়াও তুমি ঐরূপ বলে বলীয়ান হইতেছ দেখ,
 তবে বুঝিবে তুমি ঠিক পথে চলিয়াছ, কালে যথার্থ দর্শনাদিও
 তোমার উপস্থিত হইবে।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভক্তদিগের মধ্যে অনেকের ভাবসমাধি

হইতেছে অথচ তাঁহার অনেকদিন গতায়ত

ত্যাগ, বিশ্বাস

এবং চরিত্রের

বলই ধর্ম-

লাভের পরি-

চায়ক

করিয়াও ওরূপ কিছু হইল না দেখিয়া আমাদের

জনৈক বন্ধু^১ কোন সময়ে বিশেষ ব্যাকুল হন

এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিকট সজলনয়নে উপস্থিত

হইয়া প্রাণের কাতরতা নিবেদন করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাহাতে তাঁহাকে বুঝাইয়া বলেন, “তুই ছোড়া ত

ভাব, সমাধি ও দর্শন সম্বন্ধে কয়েকটি কথা

ভারি বোকা, ভাবচিস্ বুঝি ঐটে হলেই সব হল? ঐটেই ভারি বড়? ঠিক ত্যাগ, বিশ্বাস ওর চেয়ে ঢের বড় জিনিস জান্‌বি। নরেন্দরের (স্বামী বিবেকানন্দের) ত ওসব বড় একটা হয় না; কিন্তু দেখ দেখি—তার কি ত্যাগ, কি বিশ্বাস, কি মনের তেজ ও নিষ্ঠা!”

একনিষ্ঠ বুদ্ধি, দৃঢ় বিশ্বাস ও ঐকান্তিক ভক্তিসহায়ে সাধকের যখন বাসনাসমূহ ক্ষীণ হইয়া শ্রীভগবানের সহিত অধৈতভাবে অবস্থানের সময় আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন পূর্বসংস্কারবশে

কাহারও কাহারও মনে কখন কখন ‘আমি লোক-
‘পাকা আমি’ কল্যাণ সাধন করিব, যাহাতে বহুজন সুখী হইতে
ও শুদ্ধ পারে তাহা করিব’—এইরূপ শুদ্ধ বাসনার
বাসনা। উদয় হইয়া থাকে। ঐ বাসনাবশে সে আর তখন
জীবমুক্ত, পূর্ণরূপে অধৈতভাবে অবস্থান করিতে পারে না।
আধিকারিক বা ঈশ্বরকোটি ঐ উচ্চ ভাবভূমি হইতে কিঞ্চিন্মাত্র নামিয়া আসিয়া
ও জীবকোটি ‘আমি, আমার’-রাজ্যে পুনরায় আগমন করে।

কিন্তু সে ‘আমি’ শ্রীভগবানের দাস, সন্তান বা অংশ ‘আমি’ এইরূপে শ্রীভগবানের সহিত একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ লইয়াই অনুক্ষণ থাকে। সে ‘আমি’-দ্বারায় আর অহর্নিশি কাম-কাঙ্ক্ষার সেবা করা চলে না। সে ‘আমি’ শ্রীভগবানকে সারাৎসার জানিয়া আর সংসারের রূপ-রসাদি-ভোগের জন্ম লালায়িত হয় না। যতটুকু রূপ-রসাদিবিষয়-গ্রহণ তাঁহার উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যের সহায়ক, ততটুকুই সে ইচ্ছামত গ্রহণ করিয়া থাকে; এই পর্য্যন্ত। যাহারা পূর্বে বদ্ধ ছিলেন, পরে সাধন করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন এবং

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

জীবনের অবশিষ্টকাল কোনরূপ ভগবদ্ভাবে কাটাইতেছেন, তাঁহাদিগকেই 'জীবমুক্ত' কহে। যাহারা ঈশ্বরের সহিত ঐরূপ বিশিষ্ট সম্বন্ধের ভাব লইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং এ জন্মে কোন সময়েই সাধারণ মানবের গ্ৰায় বন্ধনযুক্ত হইয়া পড়েন নাই, তাঁহারাি শাস্ত্রে 'আধিকারিক পুরুষ', 'ঈশ্বরকোটি' বা 'নিত্যমুক্ত' প্রভৃতি শব্দে অভিহিত হইয়াছেন। আবার একদল সাধক আছেন, যাহারা অদ্বৈতভাব লাভ করিবার পরে এ জন্মে বা পরজন্মে সংসারে লোককল্যাণ করিতেও আর ফিরিলেন না, ইহারাি 'জীবকোটি' বলিয়া অভিহিত হন এবং ইহাদের সংখ্যাই অধিক বলিয়া আমরা গুরুমুখে শ্রুত আছি।

আবার যাহারা পূর্বোক্তরূপে অদ্বৈতভাব-লাভের পর লোক-কল্যাণের জন্ত সমাধিভূমি হইতে নামিয়া আসেন, সে সকল সাধকদিগের মধ্যেও অখণ্ডসচ্চিদানন্দস্বরূপ জগৎ-অদ্বৈতভাবো-পলঙ্কির কারণের সহিত অদ্বৈতভাব উপলব্ধি করিবার তারতম্য তারতম্য আছে। কেহ ঐ ভাবসমুদ্র দূর হইতে দর্শন করিয়াছেন মাত্র, কেহ বা উহা আরো নিকটে অগ্রসর হইয়া স্পর্শ করিয়াছেন, আবার কেহ বা ঐ সমুদ্রের জল অল্প-স্বল্প পান করিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব যেমন বলিতেন, "দেবর্ষি নারদ দূর হ'তে ঐ সমুদ্র দেখেই ফিরেছেন, শুকদেব তিনবার স্পর্শমাত্র করেছেন, আর জগদগুরু শিব তিন গণ্ডুয জল খেয়ে শব হয়ে পড়ে আছেন!" এই অদ্বৈতভাবে অল্পক্ষণের নিমিত্তও তন্ময় হওয়াকেই 'নির্বিকল্প সমাধি' কহে।

অদ্বৈতভাব-উপলব্ধির যেমন তারতম্য আছে, সেইরূপ

ভাব, সমাধি ও দর্শন সম্বন্ধে কয়েকটি কথা

নিম্নস্তরের শাস্ত্র, দাস্ত্র, সখ্য, বাৎসল্যাদি ভাব সমূহের অথবা যে
শাস্ত্র, দাস্ত্রাদি ভাবের গভীর-তার সবিকল্প সমাধি ভাবসমূহ অধৈতভাবে সাধককে উপনীত করে
সে সকলের উপলব্ধি করিবার মধ্যেও আবার
তারতম্য আছে। কেহ বা উহার কোনটি সম্পূর্ণ-
ভাবে উপলব্ধি করিয়া কৃতার্থ হন, আবার কেহ বা
উহার আভাসমাত্রই পাইয়া থাকেন। এই নিম্নোক্ত ভাবসকলের
মধ্যে কোন একটির সম্পূর্ণ উপলব্ধিই 'সবিকল্প সমাধি' নামে
যোগশাস্ত্রে নির্দিষ্ট হইয়াছে।

উচ্চাঙ্গের অধৈতভাব বা নিম্নোক্তের সবিকল্পভাব—সকল
প্রকার ভাবেই সাধকের অপূর্ব শারীরিক পরিবর্তন এবং অদ্ভুত
দর্শনাদি আসিয়া উপস্থিত হয়। ঐ শরীরবিকার
ও অদ্ভুত দর্শনাদির প্রকার আবার ভিন্ন ভিন্ন জনে
ভিন্ন ভিন্ন রূপে লক্ষিত হয়। কাহারও অল্প
উপলব্ধিতেই শারীরিক বিকার ও দর্শনাদি দেখা যায়,
আবার কাহারও বা অতি গভীরভাবে ঐসকল
ভাবোপলব্ধিতেও শারীরিক বিকার এবং দর্শনাদি অতি অল্পই
দেখা যায়। শ্রীরামকৃষ্ণদেব যেমন বলিতেন, “গেড়ে ডোবার
অল্প জলে যদি দু-একটা হাতী নামে তো জল
ওছল্-পাছল্ হয়ে তোলপাড় হয়ে উঠে; কিন্তু
সায়ের দীঘিতে অমন বিশগুণা হাতী নামলেও
যেমন জল স্থির তেমনই থাকে।” অতএব
শারীরিক বিকার এবং দর্শনাদিই যে ভাবের গভীরতার ফল লক্ষণ,
তাহাও নহে। ভাবের গভীরতার যদি পরিমাণের আবশ্যক হয়,

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

তবে পূর্বে যে রূপ বলিয়াছি—নিষ্ঠা, ত্যাগ, চরিত্রবল, বিষ্ণু-কামনার হ্রাস প্রভৃতি দেখিয়াই অসুমান করিতে হইবে। ভাবসমাধিতে কত খাদ আছে তাহা কেবল ঐ কষ্টিপাথরেই পরীক্ষিত হইতে পারে, নতুবা আর অন্য উপায় নাই। অতএব বেশ বুঝা যাইতেছে যে, যাহারা সকল প্রকার বিষয়বাসনা-বর্জিত হইয়া শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের ভিতরেই কেবল শাস্ত, দাস্ত, সখ্য, বাৎসল্য বা মধুর—যে কোন ভাবের যথাযথ সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ ছবি দেখিতে পাওয়া সম্ভব, যাহারা কামকাঞ্চন-বাসনাবিজড়িত তাহাদের ভিতর নহে। কামাক্ষ কামনার টানই বুঝে—কামগন্ধরহিত যে মনের আবেগ, তাহা কেমন করিয়া বুঝিবে ?

ভাবসমাধির দার্শনিক তত্ত্ব শ্রীগুরুর মুখ হইতে আমরা যে রূপ শুনিয়াছি, তাহাই সংক্ষেপে এখানে বিবৃত করিতে চেষ্টা করিতেছি।

আরও কয়েকটি কথা ঐ সম্বন্ধে এখানে বলা প্রয়োজন—

<p>সর্ব্বপ্রকার ভাব সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিতে অবতারেরাই সক্ষম। দৃষ্টান্ত— ঠাকুরের সমাধির কথা</p>	<p>তবেই পাঠক উহা বিশদরূপে বুঝিতে পারিবেন। সাধকদিগের মধ্যে শাস্ত দাস্তাদি ও অর্ষেত- ভাবোপলব্ধির তারতম্য লক্ষিত হওয়া সম্বন্ধে যেসকল কথা পূর্বে বলা হইল, তাহাতে যেন কেহ মনে না করেন যে, ঈশ্বরবতারেরাও ভাবরাজ্যে কোনরূপ গণ্ডীর ভিতর আবদ্ধ থাকেন। তাঁহারা</p>
---	---

শাস্ত-দাস্তাদি যখন যে ভাব ইচ্ছা পূর্ণমাত্রায় নিজ জীবনে প্রদর্শন করিতে পারেন, আবার অর্ষেতভাবাবলম্বনে শ্রীভগবানের সহিত একত্বাত্মকভাবে এতদূর অগ্রসর হইতে

ভাব, সমাধি ও দর্শন সম্বন্ধে কয়েকটি কথা

পারেন যে, জীবমুক্ত, নিত্যমুক্ত বা ঈশ্বরকোটি কোনপ্রকার জীবেরই তাহা সাধ্যায়ত্ত নহে। রসস্বরূপ, আনন্দস্বরূপের সহিত অতদূর একত্বে অগ্রসর হইয়া আবার তাহা হইতে বিযুক্ত হওয়া এবং 'আমি' 'আমার' রাজ্যে পুনরায় নামিয়া আসা জীবের কখনই সম্ভবপর নহে। উহা কেবল একমাত্র অবতারপ্রথিত পুরুষসকলে সম্ভবে। তাঁহাদের অদৃষ্টপূর্ব উপলক্ষিসমূহ লিপিবদ্ধ করিয়াই আধ্যাত্মিক জগতে বেদাদি সর্বশাস্ত্রের উৎপত্তি হইয়াছে ; অতএব তাঁহাদের আধ্যাত্মিক উপলক্ষিসকল অনেক স্থলে যে বেদাদিশাস্ত্রনিবদ্ধ উপলক্ষিসকল অতিক্রম করিবে—ইহাতে বিচিত্রতা কি আছে? শ্রীরামকৃষ্ণদেব যেমন বলিতেন, “এখানকার অবস্থা (আমার উপলক্ষি) বেদ বেদান্তে যা লেখা আছে, সে সকলকে ঢের ছাড়িয়ে চলে গেছে।” শ্রীরামকৃষ্ণদেব ঐ শ্রেণীর পুরুষসকলের অগ্রণী ছিলেন বলিয়াই নিরন্তর ছয়মাস কাল অর্ধৈত-ভাবে পূর্ণরূপে অবস্থান করিবার পরেও আবার 'বহুজনহিতায়' 'লোকশিক্ষা'র জন্ত 'আমি' 'আমার' রাজ্যে ফিরিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সে বড় অদ্ভুত কথা। ঐ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা পাঠককে এখানে বলা অসঙ্গত হইবে না।

শ্রীমৎ তোতাপুরীর নিকট হইতে সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার পর ঠাকুরের তৃতীয় দিবসে বেদান্ত-শাস্ত্রোক্ত নির্বিবকল্প সমাধি বা শ্রীভগবানের সহিত অর্ধৈতভাবে অবস্থানের চরম উপলক্ষি হয়। সে সময় ঠাকুরের তত্ত্বোক্ত সকলপ্রকার সাধন হইয়া গিয়াছে এবং যিনি ঐসকল সাধনার সময় বৈধ দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া এবং ঐ

বেদান্ত-চর্চা
করিতে
ব্রাহ্মণীর
নিষেধ

শ্রী শ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

সকল দ্রব্যের ব্যবহারপ্রণালী প্রভৃতি দেখাইয়া তাঁহাকে সহায়তা করিয়াছিলেন, সেই বিদুষী ভৈরবীও (ঠাকুর ইহাকে আমাদের নিকট 'বাম্নী' বলিয়া নির্দেশ করিতেন) দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকট বাস করিতেছেন। কারণ ঠাকুরের শ্রীমুখ হইতে আমরা শুনিয়াছি, উক্ত 'বাম্নী' বা ভৈরবী তাঁহাকে শ্রীমৎ তোতাপুরীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেশামিশি করিতে নিষেধ করিয়া বলিতেন— "বাবা, ওর সঙ্গে অত মেশামিশি করো না, ওদের সব শুকনো ভাব; ওর অত সঙ্গ করলে তোমার ভাব-প্রেম আর কিছু থাকবে না।" ঠাকুর কিন্তু ঐ কথায় কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া অহর্নিশ তখন বেদান্ত-বিচার ও উপলক্ষিতে নিমগ্ন থাকিতেন।

এগার মাস দক্ষিণেশ্বরে অবস্থান করিয়া শ্রীমৎ তোতাপুরী চলিয়া গেলেন। ঠাকুরের তখন দৃঢ়সঙ্কল্প হইল—'আমি, আমার'

রাজ্যে আর না থাকিয়া নিরন্তর শ্রীভগবানের সহিত

ঠাকুরের

নির্বিবর্তন

ভূমিতে সর্বদা

থাকিবার

সঙ্কল্প ও উক্ত

ভূমির স্বরূপ

একাত্মরূপে বা অদ্বৈতজ্ঞানে অবস্থান করিব।

তিনি তদ্রূপ আচরণও করিতে লাগিলেন। সে বড়

অপূর্ব কথা! তখন ঠাকুরের শরীরটা যে আছে,

সে বিষয়ে আদৌ হুঁশ ছিল না। খাইব, শুইব,

শৌচাদি করিব—এসকল কথাও মনে উদ্ভিত হইত

না, তা অপরের সহিত কথাবার্তা করিব, সে তো অনেক দূরের

কথা! সে অবস্থায় 'আমি আমার'ও নাই, আর 'তুমি তোমার'ও

নাই! 'দুই'ও নাই, 'এক'ও নাই! কারণ 'দুই'-এর স্মৃতি থাকিলে

তবে তো 'একের' উপলক্ষি হইবে। সেখানে মনের সব বৃত্তি

স্থির—শান্ত। কেবল—

ভাব, সমাধি ও দর্শন সম্বন্ধে কয়েকটি কথা

কিমপি সততবোধং কেবলানন্দরূপং
নিরূপমমতিবেলং নিত্যযুক্তং নিরীহম্
নিরবধিগগনাতং নিষ্কলং নির্বিকল্পং
হৃদি কলয়তি বিদ্বান ব্রহ্মপূর্ণং সমাধৌ ॥
প্রকৃতি-বিকৃতিশূন্যং ভাবনাতীতভাবং ।১

* * * *

—কেবল আনন্দ ! আনন্দ !—তার দিক নাই, দেশ নাই, আলম্বন নাই, রূপ নাই, নাম নাই ! কেবল অশরীরী আত্মা আপনার অনির্বিচনীয় আনন্দময় অবস্থায়, মনবুদ্ধির গোচরে অবস্থিত যত প্রকার ভাবরাশি আছে সে সকলের অতীত এক প্রকার ভাবাতীত ভাবে অবস্থিত ! যাহাকে শাস্ত্র ‘আত্মায় আত্মায় রমণ’ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন !—এইপ্রকার এক অনির্বিচনীয় অবস্থার উপলব্ধিই ঠাকুরের তখন নিরন্তর হইয়াছিল ।

ঠাকুর বলিতেন, বেদান্তের নির্বিকল্প সমাধি-উপলব্ধিতে উঠিবার পথে সংসারের কোনও পদার্থ বা কোন সম্বন্ধই তাঁহার অন্তরায় হয় নাই । কারণ পূর্ব হইতেই তো তিনি ঠাকুরের মনের অদ্ভুত গঠন শ্রীশ্রীজগদম্বার শ্রীপাদপদ্ম সাক্ষাৎকার করিবার নিমিত্ত যত প্রকার ভোগবাসনা ত্যাগ করিয়াছিলেন । “মা, এই নে তোর জ্ঞান, এই নে তোর অজ্ঞান—এই নে তোর ধর্ম, এই নে তোর অধর্ম—এই নে তোর ভাল, এই নে তোর মন্দ—এই নে তোর পাপ, এই নে তোর পুণ্য—এই নে তোর যশ, এই নে তোর অযশ—আমায় তোর শ্রীচরণে

১ বিবেকচূড়ামণি, ৪০৮-২

শ্রী শ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

শুধা-ভক্তি দে, দেখা দে”—এই বলিয়া মন হইতে ঠিক ঠিক সকল প্রকার বাসনা কামনা শ্রীশ্রীজগন্নাথাকে ভালবাসিয়া তাঁহার জন্ম ত্যাগ করিয়াছিলেন। হায়, সে একাকী ভক্তি-প্রেমের কথা কি আমরা উপলব্ধি দূরে থাক, একটু কল্পনাও করিতে পারি? আমরা মুখে যদি কখনও শ্রীভগবানকে বলি, ‘ঠাকুর, এই নাও আমার যাহা কিছু সব’ তো বলিবার পরই আবার কাজের সময় ঠাকুরকে তাড়াইয়া সে সব ‘আমার আমার’ বলিতে থাকি এবং লাভ-লোকসান খতাই! প্রতি কার্যে ‘লোকে কি বলবে’ ভাবিয়া নানাপ্রকারে তোলাপাড়া, ছুটাছুটি করি; ভবিষ্যতের ভাবনা ভাবিয়া কখন অকূলপাথারে, আবার কখন বা আনন্দে ভাসি এবং মনে মনে একথা স্থিরনিশ্চয় করিয়া বসিয়া আছি যে, ছুনিয়াটা আমরা আমাদের উত্তমে একেবারে ওলট-পালট করিয়া না দিতে পারিলেও কতকটাও ঘুরাইতে ফিরাইতে পারি! ঠাকুরের তো আমাদের মত জুয়াচোর মন ছিল না; তিনি যেমন বলিলেন, “মা, এই তোর দেওয়া জিনিস তুই নে,” অমনি তদগু হইতে তাঁহার মন আর সে সকলের প্রতি লালসাপূর্ণ দৃষ্টিপাত করিল না! ‘বলে ফেলেছি কি করি? না বললে হত’—মনের এইরূপ ভাব পর্য্যন্তও তখন হইতে আর উদিত হইল না! সেইজন্মই দেখিতে পাই, ঠাকুর যখনই যাহা শ্রীশ্রীজগদম্বাকে দিবেন বলিয়াছেন তাহা আর কখনও ‘আমার’ নিজের বলিতে পারেন নাই।

এখানে ঐ বিষয়ে আর একটি কথাও আমরা পাঠককে বলিতে ইচ্ছা করি। ঠাকুর শ্রীশ্রীজগন্নাথাকে ধর্ম্মাধর্ম্ম, পুণ্য-পাপ,

ভাব, সমাধি ও দর্শন সম্বন্ধে কয়েকটি কথা

জ্ঞান-মন্দ, বশ-অবশ প্রভৃতি শরীর-মনের সর্বস্ব অর্পণ করিয়াও
'মা, এই নে তোর সত্য, এই নে তোর মিথ্যা'—এ কথাটি

বলিতে পারেন নাই। উহার কারণ ঠাকুর নিজ
ঠাকুরের
সত্যনিষ্ঠা
মুখেই এক সময়ে আমাদের নিকট ব্যক্ত করিয়া
ছিলেন। বলিয়াছিলেন, “ঐরূপে সত্য ত্যাগ

করিলে শ্রীশ্রীজগন্নাথাকে সর্বস্ব যে অর্পণ করিলাম—এ সত্য
রাখিব কিরূপে?” বাস্তবিক সর্বস্ব অর্পণ করিয়াও কি সত্যনিষ্ঠাই
না আমরা তাঁহাতে দেখিয়াছি! যেদিন যেখানে যাইব
বলিয়াছেন, সেদিন ঠিক সময়ে তথায় উপস্থিত হইয়াছেন; যাহার
নিকট হইতে যে জিনিস লইব বলিয়াছেন, তাহার নিকটে ভিন্ন
অপর কাহারও নিকটে তাহা লইতে পারেন নাই। যেদিন
বলিয়াছেন আর অমুক জিনিসটা খাইব না, বা অমুক কাজ আর
করিব না, সেদিন হইতে আর তাহা খাইতে বা করিতে পারেন
নাই। ঠাকুর বলিতেন, “যার সত্যনিষ্ঠা আছে, সে সত্যের
ভগবানকে পায়। যার সত্যনিষ্ঠা আছে, মা তার কথা কখনও
মিথ্যা হতে দেন না।” বাস্তবিকও ঐ বিষয়ের কতই না দৃষ্টান্ত
আমরা তাঁহার জীবনে দেখিয়াছি! তাহার মধ্যে কয়েকটি
পাঠককে এখানে বলিলে মন্দ হইবে না।

দক্ষিণেশ্বরে একদিন পরমা ভক্তিমতী গোপালের মা
ঠাকুরকে ভাত রাঁধিয়া খাওয়াইবেন। সব প্রস্তুত;
ঐ বিষয়ের
১ম দৃষ্টান্ত
ঠাকুর খাইতে বসিলেন। বসিয়া দেখেন, ভাতগুলি

শক্ত রহিয়াছে—হসিক হইয়া নাই। ঠাকুর বিরক্ত
হইলেন এবং বলিলেন, “এ ভাত কি আমি খেতে পারি? ওর

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

হাতে আর কখনও ভাত খাব না।” ঠাকুরের মুখ দিয়া ঐ কথাগুলি বাহির হওয়ায় সকলে ভাবিলেন, ঠাকুর গোপালের মাকে ভবিষ্যতে সতর্ক করিবার নিমিত্ত ঐরূপ বলিয়া ভয় দেখাইলেন মাত্র, নতুবা গোপালের মাকে ষেরূপ আদর-যত্ন করেন, তাহাতে তাঁহার হাতে আর খাইবেন না—ইহা কি হইতে পারে? কিছুক্ষণ বাদেই আবার গোপালের মাকে ক্ষমা করিবেন এবং ঐ কথাগুলির আর কোন উচ্চবাচ্য হইবে না। কিন্তু ফলে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত হইল। কারণ উহার অল্পকাল পরেই ঠাকুরের গলায় অসুখ হইল। ক্রমে উহা বাড়িয়া ঠাকুরের ভাত খাওয়া বন্ধ হইল এবং গোপালের মা-র হাতে আর একদিনও ভাত খাওয়া হইল না।

একদিন ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে ভাবাবস্থায় বলিতেছেন, “এর পরে আর কিছু খাব না, কেবল পায়সান্ন, কেবল পায়সান্ন।”

শ্রীশ্রীমা ঐ সময়ে ঠাকুরের খাবার লইয়া আসিতে-
ঐ ২য় দৃষ্টান্ত

ছিলেন। ঐ কথা শুনিতে পাইয়া এবং ঠাকুরের শ্রীমুখ দিয়া যে কথা যখনি নির্গত হয় তাহা কখনই নিরর্থক হয় না জানিয়া, ভয় পাইয়া বলিলেন—“আমি মাছের বোঙ্গ ভাত রেঁধে দেব, খাবে—পায়েস কেন?” ঠাকুর ঐরূপ ভাবাবস্থায় বলিয়া উঠিলেন, “না—পায়সান্ন।” তাহার অল্পকাল পরেই ঠাকুরের গলদেশে অসুখ হওয়ায় বাস্তবিকই আর কোনরূপ ব্যঞ্জনাদি খাওয়া চলিল না—কেবল দুধ-ভাত, দুধ-বারি ইত্যাদি খাইয়াই কাল কাটতে লাগিল।

কলিকাতার প্রসিদ্ধ দানশীল ধনী ৩শত্ৰুচন্দ্র মল্লিক মহাশয়কেই

ভাব, সমাধি ও দর্শন সম্বন্ধে কয়েকটি কথা

ঠাকুর তাঁহার চারিজন 'রসদারের' ভিতর দ্বিতীয় রসদার বলিয়া নির্দেশ করিতেন। রাণী রাসমণির কালীবাটার ঐ তৃতীয় দৃষ্টান্ত নিকটেই তাঁহার একখানি বাগান ছিল। উহাতে তিনি ভগবৎ-চর্চায় ঠাকুরের সঙ্গে অনেক কাল কাটাইতেন। ঐ বাগানে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত একটি দাতব্য ঔষধালয়ও ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পেটের অস্থখ অনেক সময়ই লাগিয়া থাকিত। একদিন ঐরূপ পেটের অস্থখের কথা শঙ্কু বাবু জানিতে পারিয়া তাঁহাকে একটু আফিম সেবন করিতে ও রাসমাণর বাগানে ফিরিবার সময় উহা তাঁহার নিকট হইতে লইয়া যাইতে পরামর্শ দিলেন। ঠাকুরও সে কথায় সম্মত হইলেন। তাহার পর কথাবার্তায় ঐ কথা দুইজনেই ভুলিয়া যাইলেন।

শঙ্কু বাবুর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া পথে আসিয়া ঠাকুরের ঐ কথা মনে পড়িল এবং আফিম লইবার জন্ত পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, শঙ্কু বাবু অন্তরে জগদম্বা 'বেচালে পা পড়িতে' দেন না গিয়াছেন। ঠাকুর ঐ বিষয়ের জন্ত তাঁহাকে আর না ডাকাইয়া তাঁহার কর্মচারীর নিকট হইতে একটু আফিম চাহিয়া লইয়া রাসমণির বাগানে ফিরিতে লাগিলেন, কিন্তু পথে আসিয়াই ঠাকুরের কেমন একটা ঝাঁক আসিয়া পথ আর দেখিতে পাইলেন না! রাস্তার পাশে যে জলনালা আছে, তাহাতে যেন কে পা টানিয়া লইয়া যাইতে লাগিল! ঠাকুর ভাবিলেন—এ কি? এ তো পথ নয়! অথচ পথও খুঁজিয়া পান না। অগত্যা কোনরূপে দিক ভুল হইয়াছে ঠাওরাইয়া পুনরায় শঙ্কুবাবুর বাগানের দিকে চাহিয়া দেখিলেন—

শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

সে দিকের পথ বেশ দেখা যাইতেছে। ভাবিয়া-চিন্তিয়া পুনরায় শঙ্কু বাবুর বাগানের ফটকে আসিয়া সেখান হইতে ভাল করিয়া লক্ষ্য করিয়া পুনরায় সাবধানে রাসমণির বাগানের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কিন্তু দুই-এক পা আসিতে না আসিতে আবার পূর্বের মত হইল—পথ আর দেখিতে পান না! বিপরীত দিকে যাইতে পা টানে! এইরূপ কয়েকবার হইবার পর ঠাকুরের মনে উদয় হইল—“ওঃ, শঙ্কু বলিয়াছিল, ‘আমার নিকট হইতে আফিম চাহিয়া লইয়া যাইও’; তাহা না করিয়া আমি তাহাকে না বলিয়া তাহার কর্মচারীর নিকট হইতে উহা চাহিয়া লইয়া যাইতেছি, সেইজন্য মা আমাকে যাইতে দিতেছেন না! শঙ্কুর ছকুম ব্যতীত কর্মচারীর দেওয়া উচিত নয়, আর আমারও শঙ্কু যেমন বলিয়াছে—তাহার নিকট হইতেই লওয়া উচিত। নহিলে যেভাবে আমি আফিম লইয়া যাইতেছি, উহাতে মিথ্যা ও চুরি এই দুটি দোষ হইতেছে; সেইজন্যই মা আমায় অমন করিয়া ঘুরাইতেছেন, ফিরিয়া যাইতে দিতেছেন না!” এই কথা মনে করিয়া শঙ্কু বাবুর ঔষধালয়ে প্রত্যাগমন করিয়া দেখেন, সে কর্মচারীও সেখানে নাই—সেও আহালাদি করিতে অগ্ৰত গিয়াছে। কাজেই জানালা গলাইয়া আফিমের মোড়কটি ঔষধালয়ের ভিতর নিক্ষেপ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, “ওগো, এই তোমাদের আফিম রহিল।” ইহা বলিয়া রাসমণির বাগানের দিকে চলিলেন। এবার যাইবার সময় আর তেমন বোঁক নাই; রাস্তাও বেশ পরিষ্কার দেখা যাইতেছে; বেশ চলিয়া গেলেন। ঠাকুর বলিলেন, “মার উপর সম্পূর্ণ ভার

ভাব, সমাধি ও দর্শন সম্বন্ধে কয়েকটি কথা

দিয়েছি কিনা?—তাই মা হাত ধরে আছেন। এতটুকু বেচালো পা পড়তে দেন না।” এরূপ কতই না দৃষ্টান্ত আমরা ঠাকুরের জীবনে শুনিয়াছি! চমৎকার ব্যাপার! আমরা কি এ সত্যনিষ্ঠা, এ সর্বাঙ্গীণ নির্ভরতার এতটুকু কল্পনাতেও অনুভব করিতে পারি? ইহা কি সেই প্রকারের নির্ভর, ঠাকুর যাহা আমাদেরকে রূপকচ্ছলে বারম্বার বলিতেন?—“ওদেশে (ঠাকুরের জন্মস্থান কামারপুকুরে) মাঠের মাঝে আল্পথ আছে। তার উপর দিয়ে সকলে এক গাঁ থেকে আর এক গাঁয়ে যায়। সরু আল্পথ—চলে গেলে পাছে পড়ে যায়, সেজন্য বাপ ছোট ছেলেটিকে কোলে করে নিয়ে যাচ্ছে; আর বড় ছেলেটি সেয়ানা বলে, নিজেই বাপের হাত ধরে সবে যাচ্ছে। যেতে যেতে একটা শঙ্খচিল বা আর কিছু দেখে ছেলেগুলো আহ্লাদে হাততালি দিচ্ছে। কোলের ছেলেটি জানে বাপ আমায় ধরে আছে, নির্ভয়ে আনন্দ করতে করতে চলেছে। আর যে ছেলেটা বাপের হাত ধরে যাচ্ছিল, সে যেই পথের কথা ভুলে বাপের হাত ছেড়ে হাততালি দিতে গেছে—আর অমনি টিপ করে পড়ে গিয়ে কেঁদে উঠলো! সেই রকম মা যার হাত ধরেছেন, তার আর ভয় নেই; আর যে মার হাত ধরেছে, তার ভয় আছে—হাত ছাড়লেই পড়ে যাবে।”

এইরূপে ঈশ্বরানুরাগের প্রাবল্যে সংসারের কোনও বস্তু বা ব্যক্তির উপর মনের একটা বিশেষ আকর্ষণ বা পশ্চাৎটান ছিল না বলিয়াই নির্বিকল্প সমাধিলাভের পথে সাংসারিক কোনরূপ বাসনা-কামনা ঠাকুরের অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায় নাই। দাঁড়াইয়াছিল

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

কেবল ঠাকুর কাহাকে এতকাল ভক্তিভরে পূজা করিয়া, ভালবাসিয়া, সারাৎসারা পরাৎপরা বলিয়া জ্ঞান করিয়া আসিতে-
ছিলেন—শ্রীশ্রীজগদম্বার সেই 'সৌম্য সৌম্যতরা-
ঠাকুরের
নির্ঝিকল
ভূমিতে
উঠিবার পথে
অস্তরায়

শেষসৌম্যোভ্যস্তিত্বন্দরী' মূর্তি। ঠাকুর বলিতেন,
“মন কুড়িয়ে এক করে যাই এনেছি, আর অমনি
মা-র মূর্তি এসে সামনে দাঁড়াল! তখন আর
তাঁকে ত্যাগ করে তার পারে এগিয়ে যেতে ইচ্ছা
হয় না! যতবার মন থেকে সব জিনিস তাড়িয়ে নিরালম্ব হয়ে
থাকতে চেষ্টা করি, ততবারই ঐরূপ হয়। শেষে ভেবে চিন্তে
মনে খুব জোর এনে, জ্ঞানকে অসি ভেবে, সেই অসি দিয়ে ঐ
মূর্তিটাকে মনে মনে দুখানা করে কেটে ফেলুম! তখন মনে
আর কিছুই রহিল না—হু হু করে একেবারে নির্ঝিকল অবস্থায়
পৌঁছুল!” আমাদের কাছে এগুলি যেন অর্থহীন কথাই কথা
মাত্র। কারণ কখন তো জগদম্বার কোন মূর্তি বা ভাব ঠিক ঠিক
আপনার করিয়া লই নাই। কখন তো কাহাকেও সমস্ত প্রাণ
দিয়া ভালবাসিতে শিখি নাই। ঐ প্রকার পূর্ণ ভালবাসা, মনের
অস্তস্তল পর্যন্ত ব্যাপিয়া ভালবাসা রহিয়াছে আমাদের এই
মাংসপিণ্ড শরীর ও মনের উপর! সেইজন্যই মৃত্যুতে বা মনের
হঠাৎ একটা আমূল পরিবর্তনে আমাদের এত ভয় হয়।
ঠাকুরের তো তাহা ছিল না। সংসারে একমাত্র জগদম্বার
পাদপদ্মই মনে-জ্ঞানে সার জ্ঞানিয়াছিলেন এবং সেই পাদপদ্ম
ধ্যান করিয়া তাঁহার শ্রীমূর্তির দিবানিশি সেবা করিয়াই কাল
কাটাইতেছিলেন, কাজেই ঐ মূর্তিকে যখন একবার কোন

ভাব, সমাধি ও দর্শন সম্বন্ধে কয়েকটি কথা

প্রকারে মন হইতে সরাইয়া ফেলিলেন, তখন আর মন কি লইয়া সংসারে থাকিবে। একেবারে আলসনহীন হইয়া, বৃত্তিরহিত হইয়া নির্বিকল্প অবস্থায় যাইয়া দাঁড়াইল। পাঠক, এ কথা বুঝিতে না পার, একবার কল্পনা করিতেও চেষ্টা করিও। তাহা হইলেই বুঝিবে, ঠাকুর শ্রীশ্রীজগন্নাথাকে কতদূর আপনার করিয়াছিলেন—কি ‘পাঁচসিকে পাঁচআনা’ মন দিয়া তিনি জগদস্বাকে ভালবাসিয়াছিলেন!

এই নির্বিকল্প অবস্থায় প্রায় নিরন্তর থাকা ঠাকুরের ছয় মাস কাল ব্যাপিয়া হইয়াছিল। ঠাকুর বলিতেন, “যে অবস্থায়

একুশ দিন যে
ভাবে থাকিলে
শরীর নষ্ট হয়,
সেই ভাবে ছয়
মাস থাকা

সাধারণ জীবেরা পৌঁছুলে আর ফিরতে পারে না,

একুশ দিন মাত্র শরীরটে থেকে শুকনো পাতা

যেমন গাছ থেকে ঝরে পড়ে তেমনি পড়ে যায়,

সেইখানে ছয়মাস ছিলুম! কখন কোন্ দিক দিয়ে যে

দিন আসত, রাত যেত, তার ঠিকানাই হ’ত না।

মরা মানুষের নাকে মুখে যেমন মাছি ঢোকে—তেমনি ঢুকতো,

কিন্তু সাড় হত না। চুলগুলো ধুলোয় ধুলোয় জটা পাকিয়ে

গিয়েছিল! হয়ত অসাড়ে শৌচাদি হয়ে গেছে, তারও হুঁশ হয়

নাই! শরীরটে কি আর থাকত?—এই সময়েই যেত। তবে এই

সময়ে একজন সাধু এসেছিল। তার হাতে রুলের মত একগাছা

মাঠি ছিল। সে অবস্থা দেখেই চিনেছিল; আর বুঝেছিল—

এ শরীরটে দিয়ে মা-র অনেক কাজ এখনও বাকি আছে,

এটাকে রাখতে পারলে অনেক লোকের কল্যাণ হবে। তাই

খাবার সময় খাবার এনে মেরে মেরে হুঁশ আনবার চেষ্টা করত।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

একটু হুঁশ হচ্ছে দেখেই মুখে খাবার গুঁজে দিত। এই রকমে কোন দিন একটু আধটু পেটে যেতো, কোন দিন যেতো না। এই ভাবে ছ মাস গেছে! তারপর এই অবস্থার কতদিন পরে শুন্তে পেলুম মার কথা—‘ভাবমুখে থাক, লোকশিক্ষার জন্য ভাবমুখে থাক!’ তারপর অস্থূল হল—রক্ত-আমাশয়; পেটে খুব মোচড়, খুব যন্ত্রণা। সেই যন্ত্রণায় প্রায় ছয় মাস ভুগে ভুগে তবে শরীরে একটু একটু করে মন নাবলো—সাধারণ মানুষের মত হুঁশ এলো! নতুবা থাকত থাকত মন আপনা-আপনি ছুটে গিয়ে সেই নির্বিকল্প অবস্থায় চলে যেত!”

বাস্তবিক ঠাকুরের শরীরত্যাগের দশ-বার বৎসর পূর্বেও তাঁহার দর্শনলাভ ঝাঁহাদের ভাগ্যে ঘটিয়াছিল, তাঁহাদের মুখে

ঠাকুরের সমাধি
সম্বন্ধে
‘কাপ্তেনের’
কথা

শুনিয়াছি তখনও ঠাকুরের কথাবার্তা শুনা বড় একটা তাঁহাদের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিত না। চব্বিশ ঘণ্টা ভাব-সমাধি লাগিয়াই আছে! কথা কহিবে কে?

নেপাল রাজসরকারের কর্মচারী শ্রীবিখনাথ উপাধ্যায়—ঝাঁহাকে ঠাকুর ‘কাপ্তেন’ বলিয়া ডাকিতেন—মহাশয়ের মুখে আমরা শুনিয়াছি, তিনি একাদিক্রমে তিন অহো-রাত্র ঠাকুরকে নিরন্তর সমাধিমগ্ন হইয়া থাকিতে দেখিয়াছেন! তিনি আরও বলিয়াছিলেন, ঐরূপ বহুকালব্যাপী গভীর সমাধির সময় ঠাকুরের শ্রীঅঙ্গে—গ্রীবদেশ হইতে মেরুদণ্ডের শেষ পর্য্যন্ত এবং জাম্বু হইতে পদতল পর্য্যন্ত, উপর হইতে নিম্নের দিকে—মধ্যে মধ্যে গব্যমূত্র মালিশ করা হইত এবং ঐরূপ করা হইলে

ভাব, সমাধি ও দর্শন সম্বন্ধে কয়েকটি কথা

সমাধির উচ্চভাবভূমি হইতে 'আমি আমার' রাজ্যে আবার নামিতে ঠাকুরের সুবিধা বোধ হইত।

আমাদের নিকট ঠাকুর কতদিন স্বয়ং বলিয়াছেন, "এখানকার মনের স্বাভাবিক গতিই উর্দ্ধদিকে (নির্ঝিকল্পের দিকে)।

সমাধি হলে আর নাম্তে চায় না। তোদের
ঐ সম্বন্ধে
ঠাকুরের
নিজের কথা
জগৎ জোর করে নামিয়ে আনি। কোন একটা
নীচেকার বাসনা না ধরলে নাম্বার ত জোর হয়
না, তাই 'তামাক খাব,' 'জল খাব,' 'স্কোয়া খাব,'
'অমুককে দেখব,' 'কথা কইব,'—এইরূপ একটা ছোটখাট বাসনা
মনে তুলে বার বার সেইটে আওড়াতে আওড়াতে তবে মন ধীরে
ধীরে নীচে (শরীরে) নামে। আবার নাম্তে নাম্তে হয়ত সেই
দিকে (উর্দ্ধে) চোঁচা দৌড়ল। আবার তাকে তখন ঐরূপ বাসনা
দিয়ে ধরে নামিয়ে আনতে হয়।" চমৎকার ব্যাপার! শুনিয়া
আমরা স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া থাকিতাম, আর ভাবিতাম 'অদ্বৈত
জ্ঞান আচলে বেঁধে যা ইচ্ছে তাই কর' এ কথা যদি ঐ মানে
হয়, তাহা হইলে এরূপ করা আমাদের জীবনে হইয়াছে আর
কি! শরণাগত হইয়া থাকাই দেখিতেছি আমাদের একমাত্র
উপায়। ঐরূপ করিতে যাইয়াও কিছুদিন বাদে দেখি বিষম
হাদ্যামা! ঐ পথ আশ্রয় করিতে যাইয়াও দুষ্ট মন মাঝে মাঝে
বলিয়া বসে—আমাকে ঠাকুর সকলের অপেক্ষা অধিক ভাল
বাসিবেন না কেন? নরেন্দ্রনাথকে যতটা ভালবাসেন আমাকেও
ততটা কেন না ভালবাসিবেন? আমি তদপেক্ষা ছোট কিসে?
—ইত্যাদি! যাউক এখন সে কথা—আমরা পূর্বানুসরণ করি।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

উচ্চাঙ্গের ভাব এবং সমাধিতত্ত্ব সহজে আমরা ঠাকুরের নিকট হইতে যতদূর বুঝিয়াছি, অতঃপর তাহারই কিছু কিছু পাঠককে মনোভাবপ্রসূত বলিয়া 'ভাবমুখ' অবস্থাটা যে কি, তাহাই এখন শারীরিক বুঝাইবার চেষ্টা করিব। পূর্বেই বলিয়াছি— পরিবর্তন উচ্চাঙ্গ যে ভাবই মনে আসুক না কেন, উহার সহজে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সহিত কোন না কোনপ্রকার শারীরিক পরিবর্তনও মত অবশ্যস্বাভাবী। ইহা আর বুঝাইতে হয় না—নিত্য প্রত্যক্ষের বিষয়। ক্রোধের উদয়ে একপ্রকার, ভালবাসায় অণু প্রকার—এইরূপ নিত্যানুভূত সাধারণ ভাবসমূহের আলোচনাতেই উহা সহজে বুঝা যায়। আবার সং বা অসং কোনপ্রকার চিন্তার সবিশেষ আধিক্য কাহারও মনে থাকিলে তাহার শরীরেও এতটা পরিবর্তন আসিয়া উপস্থিত হয় যে, তাহাকে দেখিলেই লোকে বুঝিতে পারে—ইহার এইরূপ প্রকৃতি। অমুককে দেখিলেই মনে হয় রাগী, কামুক বা সাধু—এরূপ কথার নিত্য ব্যবহার হওয়াই ঐ বিষয়ের প্রমাণ। আবার দানব-তুল্য বিকটাকৃতি বিকৃত-স্বভাবাপন্ন লোক যদি কোন কারণে সংচিন্তায়, সাধুভাবে নিরস্তর ছয় মাস কাল কাটায় তো তাহার আকৃতি হাব-ভাব পূর্বাপেক্ষা কত কোমল ও সরল হইয়া আসে, তাহাও বোধ হয় আমাদের ভিতর অনেকের প্রত্যক্ষের বিষয় হইয়াছে। পাশ্চাত্য শরীরতত্ত্ববিৎ বলেন—যে প্রকার ভাবই তোমার মনে উঠুক না কেন, উহা তোমার মস্তিষ্কে চিরকালের নিমিত্ত একটি দাগ অঙ্কিত করিয়া যাইবে। এইরূপে ভাল-মন্দ দুই প্রকার ভাবের দুই প্রকার দাগের সমষ্টির স্বল্পাধিক্য লইয়াই

ভাব, সমাধি ও দর্শন সম্বন্ধে কয়েকটি কথা

তোমার চরিত্র গঠিত ও তুমি ভাল বা মন্দ লোক বলিয়া পরিগণিত। প্রাচ্যের বিশেষতঃ ভারতের যোগি-ঋষিগণ বলেন, ঐ দুই প্রকার ভাব মস্তিষ্কে দুই প্রকার দাগ অঙ্কিত করিয়াই শেষ হইল না—ভবিষ্যতে আবার তোমাকে পুনরায় ভাল-মন্দ কর্মে প্রবৃত্ত করিতে পারে একরূপ সূক্ষ্ম প্রেরণাশক্তিতে পরিণত হইয়া মেরুদেশের শেষভাগে অবস্থিত 'মূলাধার' নামক মেরুচক্রে নিত্যকাল অবস্থান করিতে থাকে; জন্মজন্মান্তরে সঞ্চিত ঐরূপ কুণ্ডলিনীর প্রেরণাশক্তিসমূহের উহাই আবাসভূমি। ঐ সঞ্চিত পূর্ব-সংস্কারের সকলের নামই সংস্কার বা পূর্ব-সংস্কার এবং ঐ আবাসস্থান ও ঐসকলের হইলে বা নির্বিকল্পসমাধি-লাভ হইলে তবেই নাশ কিরূপে হইয়া থাকে। নতুবা দেহ হইতে দেহান্তরে যাইবার সময়ও জীব ঐ সংস্কারের পুঁটুলিটি 'বায়ুর্গন্ধা-নিবাসঘাৎ' বগলে করিয়া লইয়া যায়।

অর্ধৈতজ্ঞান বা শ্রীভগবানের প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎকার হওয়ার পূর্ব পর্য্যন্ত শরীর ও মনের পূর্বোক্তরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকে। শরীরের কিছু হইলে মনে আঘাত লাগে, আবার শরীর ও মনের মনে কিছু হইলে শরীরে আঘাত অনুভব হয়। সম্বন্ধ আবার ব্যক্তির শরীর-মনের ন্যায়, ব্যক্তির সমষ্টি সমগ্র মহুশ্রুজ্ঞাতির শরীর ও মনে এইপ্রকার সম্বন্ধ বর্তমান। তোমার শরীর-মনের ঘাত-প্রতিঘাত আমার ও অপর সকলের শরীর-মনে লাগে। এইরূপে বাহ্য ও আন্তর, স্থূল ও সূক্ষ্ম জগৎ নিত্য সম্বন্ধে অবস্থিত ও পরস্পর পরস্পরের প্রতি নিয়ন্তর

ঘাতপ্রতিঘাত করিতেছে। সেইজন্যই দেখা যায়—যেখানে সকলে শোকাকুল, সেখানে তোমারও মনে শোকের উদয় হইবে; যেখানে সকলে ভক্তিমান সেখানে তোমারও মনে বিনা চেষ্টায় ভক্তিভাব আসিবে। এইরূপ অগ্ন্যাগ্নি বিষয়েও বৃষ্টিতে হইবে।

সেইজন্যই দেখা যায় শারীরিক রোগ ও স্বাস্থ্যের গ্নায় মানসিক বিকার বা ভাবসকলেরও সংক্রামিকা শক্তি আছে। উহারাও

অধিকারিভেদে সংক্রমণ করিয়া থাকে। ভগবদ-
 ভাবসকল
 সংক্রামক
 বলিয়াই সাধুসঙ্গ
 অনুষ্ঠেয়

সেইজন্য ঠাকুর যাহারা তাঁহার নিকট একবার যাইত তাহাদের “এখানে যাওয়া-আসা কোরো—প্রথম প্রথম এখানে বেশী বেশী যাওয়া-আসাটা রাখতে হয়” ইত্যাদি বলিতেন। যাক্ এখন সে কথা।

সাধারণ মানসিক ভাবসমূহের গ্নায় শ্রীভগবানের প্রতি একান্ত একনিষ্ঠ তীব্র অনুরাগে যে সমস্ত ভাব মনে উদয় হয়, সে সকলেও

অপূর্ব শারীরিক পরিবর্তন আনিয়া দেয়। যথা—
 একনিষ্ঠা-প্রসূত
 শারীরিক
 পরিবর্তন

এরূপ অনুরাগ উপস্থিত হইলে সাধকের রূপরসাদির উপর টান কমিয়া যায়—স্বপ্নাহার, স্বপ্ননিদ্রা হ্রাস—খাদ্যবিশেষে রুচি ও অন্য প্রকার খাদ্যে বিতৃষ্ণা উপস্থিত হয়—স্ত্রীপুত্রাদি যে সকল ব্যক্তির সহিত মায়িক সম্বন্ধ তাহাকে শ্রীভগবান হইতে বিমুখ করে, তাহাদিগকে বিষয় পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা হয়—বায়ুপ্রধান ধাত (ধাতু) হয় ইত্যাদি। ঠাকুর যেমন বলিতেন, “বিষয়ী লোকের হাওয়া সহিতে

ভাব, সমাধি ও দর্শন সংক্ষেপে কয়েকটি কথা

পারতুম্ না, আত্মীয়-স্বজনের সংসর্গে যেন দম বন্ধ হয়ে প্রাণটা বেরিয়ে যাবার মত হত” ; আবার বলিতেন, “ঈশ্বরকে যে ঠিক ঠিক ডাকে তার শরীরে মহাবায়ু গর-গর করে মাথায় গিয়ে উঠবেই উঠবে” ইত্যাদি।

অতএব দেখা যাইতেছে, ভগবদভূরাগে যে সকল মানসিক পরিবর্তন বা ভাব আসিয়া উপস্থিত হয়, ঐ সকলেরও এক একটা

শারীরিক প্রতিকৃতি বা রূপ আছে। মনের দিক
ভক্তিপথ ও
যোগমার্গের
সামঞ্জস্য
দিয়া দেখিয়া বৈষ্ণবতন্ত্র ঐ সকল ভাবকে শাস্ত্র,
দাস্ত্র, মথ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই পাঁচ ভাগে
বিভক্ত করিয়াছেন ; আর ঐ সকল মানসিক

বিকারকে আশ্রয় করিয়া যে সকল শারীরিক পরিবর্তন উপস্থিত হয়, তাহার দিক দিয়া দেখিয়া যোগশাস্ত্র মেরুদণ্ড ও মস্তিষ্কাস্তর্গত কুণ্ডলিনীশক্তি ও ষট্চক্রাদির বর্ণনা করিয়াছেন।

কুণ্ডলী বা কুণ্ডলিনীশক্তির সংক্ষেপে পরিচয় আমরা ইতঃ-পূর্বেই দিয়াছি। ইহজন্মে এবং পূর্ব পূর্ব জন্মজন্মান্তরে যত

মানসিক পরিবর্তন বা ভাব জীবের উপস্থিত
হইতেছে ও হইয়াছিল, তৎসমূহের সূক্ষ্ম শারীরিক
প্রতিকৃতি-অবলম্বনে অবস্থিতা মহা ওজস্বিনী
প্রেরণাশক্তিকেই পতঞ্জলিপ্রমুখ ঋষিগণ ঐ আখ্যা
প্রদান করিয়াছেন। যোগী বলেন, উহা বন্ধজীবে

প্রায় সম্পূর্ণ সুষ্প্ত বা অপ্রকাশিত অবস্থায় থাকে। উহার ঐরূপ সুষ্প্তাবস্থাতেই জীবের স্মৃতি, কল্পনা প্রভৃতি বৃত্তির উদয়। উহা যদি কোনরূপে সম্পূর্ণ জাগরিত বা প্রকাশাবস্থাপ্রাপ্ত হয়, তবেই

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

জীবকে পূর্ণজ্ঞানলাভে প্রেরণ করিয়া শ্রীভগবানের সাক্ষাৎকার করাইয়া দেয়। যদি বল, সুপ্তাবস্থায় কুণ্ডলিনী-শক্তি হইতে কেমন করিয়া স্মৃতি-কল্পনা প্রভৃতির উদয় হতে পারে? তদ্বত্তরে বলি, সুপ্ত হইলেও বাহিরের রূপ-রসাদি পদার্থ পঞ্চেন্দ্রিয়-দ্বার দিয়া নিরন্তর মস্তিষ্কে যে আঘাত করিতেছে তজ্জন্ম একটু-আধটু ক্ষণমাত্রস্থায়ী চেতনা তাহার আসিয়া উপস্থিত হয়। যেমন মশকদষ্ট নিদ্রিত ব্যক্তির হস্ত স্বতঃই মশককে আঘাত বা কণ্ঠ্যনাড়ি করে, সেইরূপ।

যোগী বলেন, মস্তিষ্কমধ্যগত ব্রহ্মরক্ষুস্থ অবকাশ বা আকাশে অখণ্ডসচ্চিদানন্দস্বরূপ পরমাত্মার বা শ্রীভগবানের জ্ঞানস্বরূপে

অবস্থান। তাঁহার প্রতি পূর্বোক্ত কুণ্ডলীশক্তির
 জাগরিতা বিশেষ অনুরাগ অথবা শ্রীভগবান তাহাকে নিরন্তর
 কুণ্ডলিনীর আকর্ষণ করিতেছেন। কিন্তু জাগরিতা না থাকায়
 গতি—বটচক্র- আকর্ষণ করিতেছেন।
 ভেদ ও সমাধি কুণ্ডলীশক্তির সে আকর্ষণ অনুভূত হইতেছে না।

জাগরিতা হইবামাত্র উহা শ্রীভগবানের ঐ আকর্ষণ অনুভব করিবে এবং তাঁহার নিকটস্থ হইবে। ঐরূপে কুণ্ডলীর শ্রীভগবানের নিকটস্থ হইবার পথও আমাদের প্রত্যেকের শরীরে বর্তমান। মস্তিষ্ক হইতে আরম্ভ হইয়া মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়া বরাবর ঐ পথ মেরুদণ্ডের মূলে 'মূলাধার' নামক মেরুচক্র পর্যন্ত আসিয়াছে। ঐ পথই যোগশাস্ত্র-কথিত 'সুষুম্নাবত্স'। পাশ্চাত্য শরীরতত্ত্ববিৎ ঐ পথকেই canal centralis (মধ্যপথ) বলিয়া নির্দেশ করিয়াছে, কিন্তু উহার কোনরূপ আবশ্যিকতা বা কার্যকারিতা ঐ পর্যন্ত খুঁজিয়া পায় নাই। ঐ পথ দিয়াই কুণ্ডলী পূর্বে

ভাব, সমাধি ও দর্শন সম্বন্ধে কয়েকটি কথা

পরমাত্মা হইতে বিযুক্তা হইয়া মস্তিষ্ক হইতে মেরুচক্রে বা মূলাধারে আসিয়া উপস্থিত হইয়া নিদ্রিতা হইয়াছে। আবার ঐ পথ দিয়াই উহা মেরুদণ্ডমধ্যে উর্দ্ধে উর্দ্ধে অবস্থিত ছয়টি চক্র ক্রমে ক্রমে অতিক্রম করিয়া পরিশেষে মস্তিষ্কে আসিয়া উপনীত হয়।^১ কুণ্ডলী জাগরিতা হইয়া এক চক্র হইতে অন্য চক্রে যেমনি আসিয়া উপস্থিত হয়, অমনি জীবের এক এক প্রকার অভূতপূর্ব উপলব্ধি হইতে থাকে এবং ঐ প্রকারে যখন উহা মস্তিষ্কে উপনীত হয়, তখন জীবের ধর্মবিজ্ঞানের চরমোপলব্ধি বা অদ্বৈত-জ্ঞানে ‘কারণং কারণানাং’ পরমাত্মার সহিত তন্ময়ত্ব আসে। তখনই জীবের ভাবেরও চরমোপলব্ধি হয় বা যে মহাভাব-অবলম্বনে অপর সকল ভাব মানবমনে সর্বক্ষণ উদ্ভিত হইতেছে, সেই ‘ভাবাতীত ভাবে’ তন্ময় হইয়া অবস্থানকরা-রূপ অবস্থা আসে।

কি সরল কথা দিয়াই না ঠাকুর যোগের এই সকল জটিল তত্ত্ব আমাদিগকে বুঝাইতেন! বলিতেন, “ছাখ, সড় সড় করে
ঐ সম্বন্ধে একটা পা থেকে মাথায় গিয়ে উঠে। যতক্ষণ না
ঠাকুরের সেটা মাথায় গিয়ে উঠে ততক্ষণ ছাঁশ থাকে; আর
অনুভব যেই সেটা মাথায় গিয়ে উঠলো আর একেবারে
বেবুতল হয়ে যাই, তখন আর দেখা-শুনাই থাকে না, তা কথা

১ যোগশাস্ত্রে এই ছয়টি মেরুচক্রের নাম ও বিশেষ বিশেষ অবস্থানস্থল পরূপে নির্দিষ্ট আছে। যথা—মেরুদণ্ডের শেষভাগে ‘মূলাধার’ (১), তদুর্দ্ধে লিঙ্গমূলে ‘স্বাধিষ্ঠান’ (২), তদুর্দ্ধে নাভিস্থলে ‘মণিপুর’ (৩), তদুর্দ্ধে হৃদয়ে ‘অনাহত’ (৪), তদুর্দ্ধে কণ্ঠে ‘বিষুভ্জ’ (৫), তদুর্দ্ধে ক্রমধ্যে ‘আজ্ঞা’ (৬), অতঃপর এই ছয়টি চক্রই মেরুদণ্ডের মধ্যস্থ সূক্ষ্ম পথেই বর্তমান—অতএব ‘হৃদয়’ ‘কণ্ঠ’ ইত্যাদি শব্দের দ্বারা তদ্বিপরীত অবস্থিত মেরুদণ্ডস্থ স্থলই লক্ষিত হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

কওয়া! কথা কইবে কে?—‘আমি’ ‘তুমি’ বুদ্ধিই চলে যায়! মনে করি তোমাদের সব বলবো—সেটা উঠতে উঠতে কত কি দর্শন-টর্শন হয় সব কথা বলবো। যতক্ষণ সেটা (হৃদয় ও কণ্ঠ দেখাইয়া) এ অবধি বা এই অবধি বড় জোর উঠেছে, ততক্ষণ বলা চলে ও বলি; কিন্তু যেই সেটা (কণ্ঠ দেখাইয়া) এখান ছাড়িয়ে উঠলো, আর অমনি যেন কে মুখ চেপে ধরে, আর বেব্ভুল হয়ে যাই—সামলাতে পারি নি! (কণ্ঠ দেখাইয়া) ওর উপরে গেলে কি রকম সব দর্শন হয় তা বলতে গিয়ে যেই ভাব্‌চি কি রকম দেখিছি, আর অমনি মন ছস্ করে উপরে উঠে যায়—আর বলা যায় না!”

আহা, কতদিন যে ঠাকুর কণ্ঠের উপরিস্থ চক্রে মন উঠিলে কিরূপ দর্শনাদি হয় তাহা অশেষ প্রয়াসপূর্বক সামলাইয়া আমাদের নিকট বলিতে যাইয়া অপারক হইয়াছেন, তাহা ঠাকুরের
নির্বিকল্প-
সমাধিকালের
অনুভব
বলিবার চেষ্টা

নিকট বলিতে যাইয়া অপারক হইয়াছেন, তাহা বলা যায় না! আমাদের এক বন্ধু বলেন, “এক দিন ঐরূপে খুব জোর করিয়া বলিলেন, ‘আজ তোদের কাছে সব কথা বলবো, একটুও লুকোবো না’ বলিয়া আরম্ভ করিলেন। হৃদয় ও কণ্ঠ পর্য্যন্ত

সকল চক্রাদির কথা বেশ বলিলেন, তারপর ক্রমদ্বারা দেখাইয়া বলিলেন, ‘এইখানে মন উঠলেই পরমাত্মার দর্শন হয় ও জীবের সমাধি হয়। তখন পরমাত্মা ও জীবাাত্মার মধ্যে কেবল একটি স্বচ্ছ পাতলা পর্দামাত্র আড়াল (ব্যবধান) থাকে। সে তখন এইরকম ঝাঞ্চে’ বলিয়া যেই পরমাত্মার দর্শনের কথা বিশেষ করিয়া বলিতে আরম্ভ করিবেন, অমনি সমাধিস্থ হইলেন। সমাধিভঙ্গে পুনরায় বলিতে চেষ্টা করিলেন, পুনরায় সমাধিস্থ

ভাব, সমাধি ও দর্শন সম্বন্ধে কয়েকটি কথা

হইলেন! এইরূপ বার বার চেষ্টার পর সজলনয়নে আমাদের বলিলেন, ‘ওরে, আমি ত মনে করি সব কথা বলি, এতটুকুও তোদের কাছে লুকোবো না, কিন্তু মা কিছুতেই বলতে দিলে না—মুখ চেপে ধরলে!’ আমরা অবাক হইয়া ভাবিতে লাগিলাম—এ কি ব্যাপার! দেখিতেছি উনি এত চেষ্টা করিতেছেন, বলিবেন বলিয়া। না বলিতে পারিয়া উহার কষ্টও হইতেছে বুঝিতেছি, কিন্তু কিছুতেই পারিতেছেন না—মা বেটী কিন্তু ভারি ছুট! উনি ভাল কথা বলিবেন, ভগবদর্শনের কথা বলিবেন, তাহাতে মুখ চাপিয়া ধরা কেন বাপু? তখন কি আর বুঝি যে, মন-বুদ্ধি—যাহাদের সাহায্যে বলা-কহাগুলো হয়, তাহাদের দৌড় বড় বেশী দূর নয়; আর তাহারা যতদূর দৌড়াইতে পারে তাহার বাহিরে না গেলে পরমাঙ্গার পূর্ণ দর্শন হয় না! ঠাকুর যে আমাদের প্রতি ভালবাসায় অসম্ভবকে সম্ভব করিবার চেষ্টা করিতেছেন—এ কথা কি তখন বুঝিতে পারিতাম?”

কুণ্ডলিনী-শক্তি সুষুম্নাপথে উঠিবার কালে যে যে রূপের অনুভব হয় তৎসম্বন্ধে ঠাকুর আরও বিশেষ করিয়া বলিতেন, “গাথ, যেটা সড়্ সড়্ করে মাথায় উঠে, সেটা সব সময় এক রকম ভাবে উঠে না। শাস্ত্রে সেটার পাঁচ রকম গতির কথা আছে—যথা, পিপীলিকাগতি—যেমন পিপড়েগুলো খাবার মুখে করে সার দিয়ে স্ৰুড় স্ৰুড় করে যায়, সেই রকম পা থেকে একটা স্ৰুড়স্ৰুড়ানি আরম্ভ হয়ে ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে উপরে উঠতে থাকে, মাথা পর্য্যন্ত যায় আর সমাধি হয়! ভেকগতি—ব্যাঙগুলো

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

যেমন টুপ্ টুপ্ টুপ্—টুপ্ টুপ্ টুপ্ করে' দু-তিন বার লাফিয়ে একটু থামে, আবার দু-তিন বার লাফিয়ে আবার একটু থামে, সেইরকম করে কি একটা পায়ের দিক থেকে মাথায় উঠছে বোঝা যায়, আর যেই মাথায় উঠলো আর সমাধি! সর্পগতি—সাপগুলো যেমন লম্বা হয়ে বা পুঁটুলি পাকিয়ে চুপ করে পড়ে আছে, আর যেই সামনে খাবার (শিকার) দেখেছে বা ভয় পেয়েছে, অমনি কিল্‌বিল্‌ কিল্‌বিল্‌ করে এঁকে বেঁকে ছোট্টে, সেইরকম কোরে ওটা কিল্‌বিল্‌ ক'রে একেবারে মাথায় গিয়ে উঠে, আর সমাধি! পক্ষিগতি—পক্ষিগুলো যেমন এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় গিয়ে বসবার সময় ছস্ করে উড়ে কখন একটু উঁচুতে উঠে, কখন একটু নীচুতে নাবে কিন্তু কোথাও বিশ্রাম করে না, একেবারে যেখানে বসবে মনে করেছে সেই-থানে গিয়ে বসে, সেইরকম ক'রে ওটা মাথায় উঠে ও সমাধি হয়! বাদরগতি—হুমানগুলো যেমন একগাছ থেকে আর এক গাছে যাবার সময় 'উউপ' করে এক ডাল থেকে আর এক ডালে গিয়ে পড়লো, সেখান থেকে 'উউপ' ক'রে আর এক ডালে গিয়ে পড়লো, এইরূপে দু-তিন লাফে যেখানে মনে করেছে সেখানে উপস্থিত হয়, সেইরকম ক'রে ওটাও দু-তিন লাফে মাথায় গিয়ে উঠে বোঝা যায় ও সমাধি হয়।”

কুণ্ডলিনীশক্তি সুষুম্নাপথে উঠিবার কালে প্রতি চক্রে কি কি প্রকার দর্শন হয় তাবিষয়ে বলিতেন, “বেদান্তে আছে সপ্ত ভূমিকার কথা। এক এক ভূমি হতে এক এক রকম দর্শন হয়। মনের স্বভাবতঃ নীচের তিন ভূমিতে ওঠা-নামা, ঐ

ভাব, সমাধি ও দর্শন সম্বন্ধে কয়েকটি কথা

দিকেই দৃষ্টি—গুহ, লিঙ্গ, নাভি—থাওয়া, পরা, রমণ ইত্যাদিতে ।

ঐ তিন ভূমি ছাড়িয়ে যদি হৃদয়ে উঠে তো তখন তার জ্যোতিঃ

বেদান্তের দর্শন হয় । কিন্তু হৃদয়ে কখন কখন উঠলেও মন

সপ্তভূমি ও আবার নীচের তিন ভূমি—গুহ, লিঙ্গ, নাভিতে নেমে

প্রত্যেক ভূমি- যায় । হৃদয় ছাড়িয়ে যদি কারো মন কণ্ঠে ওঠে

লব্ধ আধ্যাত্মিক তো সে আর ঈশ্বরীয় কথা ছাড়া কোন কথা

দর্শন সম্বন্ধে —যেমন বিষয়ের কথা-টথা, কইতে পারে না।

ঠাকুরের কথা

তখন তখন এমনি হত—বিষয়কথা যদি কেউ কয়েছে তো

মনে হ'ত মাথায় লাঠি মারলে ; দূরে পঞ্চবটীতে পালিয়ে

যেতাম, যেখানে ওসব কথা শুনতে পার না। বিষয়ী দেখলে

ভয়ে লুকোতুম ! আত্মীয়-স্বজনকে যেন কূপ বলে মনে হ'ত

—মনে হ'ত তারা যেন টেনে কূপে ফেলবার চেষ্টা করছে, পড়ে

যাব আর উঠতে পারব না। দম বন্ধ হয়ে যেতো, মনে হ'ত

যেন প্রাণ বেরোয় বেরোয়—সেখান থেকে পালিয়ে এসে তবে

শান্তি হ'ত ! কণ্ঠে উঠলেও মন আবার গুহ, লিঙ্গ, নাভিতে

নেমে যেতে পারে, তখনও সাবধানে থাকতে হয়। তারপর

কণ্ঠ ছাড়িয়ে যদি কারো মন ক্রমধ্যে ওঠে তো তার আর পড়বার

ভয় নেই, তখন পরমাত্মার দর্শন হয়ে নিরন্তর সমাধিস্থ থাকে ।

এখানটার আর সহস্রারের মাঝে একটা কাঁচের মত স্বচ্ছ পর্দা-

মাত্র আড়াল আছে । তখন পরমাত্মা এত নিকটে যে, মনে হয়

যেন তাঁতে মিশে গেছি, এক হয়ে গেছি ; কিন্তু তখনও এক

হয় নি । এখান থেকে মন যদি নামে তো বড় জোর কণ্ঠ

বা হৃদয় পর্যন্ত নামে—তার নীচে আর নামতে পারে না।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

জীবকোটরা এখান থেকে আর নামে না—একুশ দিন নিরন্তর সমাধিতে থাকবার পর ঐ আড়ালটা বা পর্দাটা ভেদ হয়ে যায়, আর তাঁর সঙ্গে একেবারে মিশে যায়। সহস্রারে পরমাত্মার সঙ্গে একেবারে মেশামেশি হয়ে যাওয়াই সপ্তম ভূমিতে ওঠা।”

ঠাকুরকে ঐ সব বেদ-বেদান্ত, যোগ-বিজ্ঞানের কথা কহিতে শুনিয়া আমাদের কেহ কেহ আবার কখন কখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিত, ‘মশাই, আপনিতো লেখা-পড়ার ঠাকুরের প্রতিধরত্ব কখন ধার ধারেন নি, এত সব জানলেন কোথা থেকে?’ অদ্ভুত ঠাকুরের ঐ অদ্ভুত প্রশ্নেও বিরক্তি নাই! একটু হাসিয়া বলিতেন, “নিজে পড়ি নাই, কিন্তু ঢের সব যে শুনেছি গো? সে সব মনে আছে। অপরের কাছ থেকে, ভাল ভাল পণ্ডিতের কাছ থেকে, বেদ-বেদান্ত, দর্শন-পুরাণ সব শুনেছি। শুনে, তাদের ভেতর কি আছে জেনে, তারপর সেগুলোকে (গ্রন্থগুলোকে) দড়ি দিয়ে মালা করে গাঁথে গলায় পরে নিয়েছি— ‘এই নে তোর শাস্ত্র-পুরাণ, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দে’ বলে মার পাদপদ্মে ফেলে দিয়েছি!”

বেদান্তের অদ্বৈতভাব বা ভাবাতীত ভাব সহজে বলিতেন, “ওটা সব শেষের কথা। কি রকম জানিস? যেমন, অনেক দিনের পুরোগো চাকর। মনিব তার গুণে খুশী হয়ে তাকে সকল কথায় বিশ্বাস করে, সব বিষয়ে পরামর্শ করে। একদিন খুব খুশী হয়ে তার হাত ধরে নিজের গদিতেই বসাতে গেল! চাকর সঙ্কোচ করে ‘কি

ভাব, সমাধি ও দর্শন সম্বন্ধে কয়েকটি কথা

কর, কি কর' বললেও মনিব জোর করে টেনে বসিয়ে বললে,
'আঃ, বস না! তুইও যে, আমিও সে'—সেই রকম।"

আমাদের জনৈক বন্ধু^১ এক সময়ে বেদান্তচর্চায় বিশেষ
মনোনিবেশ করেন। ঠাকুর তখন বর্তমান এবং উহার আকুমার

ব্রহ্মচর্য্য, ভক্তি, নিষ্ঠা প্রভৃতির জগু উহাকে বিশেষ

ঐ দৃষ্টান্ত—

স্বামী তুরীয়ানন্দ

ভালবাসিতেন। বেদান্তচর্চা ও ধ্যান-ভজনাদিতে

নিবিষ্ট হইয়া বন্ধুটি ঠাকুরের নিকট পূর্বে পূর্বে

যেমন ঘন ঘন যাতায়াত করিতেন সেরূপ কিছুদিন করেন নাই

বা করিতে পারেন নাই। ঠাকুরের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সে বিষয়

অলক্ষিত থাকে নাই। বন্ধুটির সঙ্গে যাতায়াত করিত এমন এক

ব্যক্তিকে দক্ষিণেশ্বরে একাকী দেখিয়া ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন,

“কি রে, তুই যে একলা—সে আসে নি?” জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি

বলিল, “সে মশাই আজকাল খুব বেদান্তচর্চায় মন দিয়েছে।

রাত-দিন পাঠ, বিচারতর্ক নিয়ে আছে। তাই বোধ হয় সময়

নষ্ট হবে বলে আসে নি।” ঠাকুর শুনিয়া আর কিছু বলিলেন না।

উহার কিছুদিন পরেই, আমরা যাহার কথা বলিতেছি তিনি

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসিলেন।

বেদান্ত আর

কি? ব্রহ্ম

সত্য, জগৎ

মিথ্যা—এই

ধারণা

তাহাকে দেখিয়াই ঠাকুর বলিলেন, “কি গো, তুমি

নাকি আজকাল খুব বেদান্তবিচার করুচ? তা

বেশ, বেশ। তা বিচার তো খালি এই গো—ব্রহ্ম

সত্য, জগৎ মিথ্যা,—না আর কিছু?”

বন্ধু—আজ্ঞা হাঁ, আর কি?

১ স্বামী তুরীয়ানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

বন্ধু বলেন, বাস্তবিকই ঠাকুর সেদিন ঐ কয়টি কথায় বেদান্ত সম্বন্ধে তাঁহার চক্ষু যেন সম্পূর্ণ খুলিয়া দিয়াছিলেন। কথাগুলি শুনিয়া তিনি বিস্মিত হইয়া ভাবিয়াছিলেন—বাস্তবিকই তো, ঐ কয়টি কথা হৃদয়ে ধারণা হইলে বেদান্তের সকল কথাই বুঝা হইল !

ঠাকুর—শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন। ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা—আগে শুন্নে; তারপর মনন—বিচার করে মনে মনে পাকা করলে; তারপর নিদিধ্যাসন—মিথ্যা বস্তু জগৎকে ত্যাগ করে সদ্বস্তুর ব্রহ্মের ধ্যানে মন লাগালে—এই। কিন্তু তা না হয়ে শুন্নলুম, বুঝলুম কিন্তু যেটা মিথ্যা সেটাকে ছাড়তে চেষ্টা করলুম না—তা হলে কি হবে? সেটা হচ্ছে সংসারীদের জ্ঞানের মত; ও রকম জ্ঞানে বস্তুলাভ হয় না। ধারণা চাই, ত্যাগ চাই—তবে হবে। তা না হলে, মুখে বল্চ বটে ‘কাঁটা নেই খোঁচা নেই’, কিন্তু যেই হাত দিয়েছ অমনি প্যাট করে কাঁটা ফুটে উঠে উঠে করে উঠতে হবে, মুখে বল্চ ‘জগৎ নেই, অসৎ—একমাত্র ব্রহ্মই আছে’ ইত্যাদি, কিন্তু যেই জগতের রূপরসাদি বিষয় সম্মুখে আসা, অমনি সেগুলো সত্যজ্ঞান হয়ে বন্ধনে পড়া। পঞ্চবটীতে এক সাধু এসেছিল। সে লোকজনের সঙ্গে খুব বেদান্ত-টেদান্ত বলে। তারপর একদিন শুন্নলুম, একটা মাগীর সঙ্গে নট-ঘট হয়েছে। তারপর ওদিকে শোচে গিয়েছি, দেখি সে বসে আছে। বল্লাম, ‘তুমি এত বেদান্ত-টেদান্ত বল, আবার এ সব কি?’ সে বল্লে, ‘তাতে কি? আমি তোমাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি তাতে দোষ নেই। যখন জগৎটাই তিন কালে মিথ্যা হল, তখন ঐটেই কি সত্য হবে? ওটাও মিথ্যা।’

ভাব, সমাধি ও দর্শন সম্বন্ধে কয়েকটি কথা

আমি তো শুনে বিস্মিত হয়ে বলি, 'তোমার অমন বেদান্তজ্ঞানে আমি মূতে দি!' ও সব হচ্ছে সংসারী, বিষয়ী জ্ঞানীর জ্ঞান। ও জ্ঞান জ্ঞানই নয়।

বন্ধু বলেন, সেদিন ঐ পর্য্যন্ত কথাই হইল। কথাগুলি ঠাকুর তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া পঞ্চবটীতলে বেড়াইতে বেড়াইতে বলিলেন। ইতঃপূর্বে তাঁহার ধারণা ছিল—উপনিষৎ, পঞ্চদশী ইত্যাদি নানা জটিল গ্রন্থ অধ্যয়ন না করিলে, সাংখ্য গ্ৰন্থাদি দর্শনে ব্যুৎপত্তিলাভ না করিলে বেদান্ত কখনই বুঝা যাইবে না এবং মুক্তিলাভও সুদূর-পর্য্যন্ত থাকিবে। ঠাকুরের সেদিনকার কথাতেই বুঝিলেন, বেদান্তের যত কিছু বিচার সব ঐ ধারণাটি হৃদয়ে দৃঢ় করিবার জন্য। বুড়ি বুড়ি দর্শন ও বিচার-গ্রন্থ পড়িয়া যদি কাহারও মনে 'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা' কথাটি নিশ্চয় ধারণা না হয়, তবে ঐ সকল পড়া না পড়া উভয়ই সমান। ঠাকুরের নিকট সেদিন তিনি বিদায় গ্রহণ করিলেন এবং তখন হইতে গ্রন্থপাঠাদি অপেক্ষা সাধন-ভজনেই অধিক মনোনিবেশ করিবেন—ঐরূপ নানাকথা ভাবিতে ভাবিতে কলিকাতার দিকে ফিরিলেন। এইরূপে তিনি সাধনসহায়ে ঈশ্বর প্রত্যক্ষ করিবার সঙ্কল্প মনে স্থির ধারণা করিয়া তদবধি তদনুরূপ কার্যেই বিশেষভাবে মনোনিবেশ করিলেন।

ঠাকুর কলিকাতায় কাহারও বাটীতে আগমন করিলে অল্পক্ষণের মধ্যেই সে কথা তাঁহার বিশিষ্ট ভক্তগণের মধ্যে জানাজানি হইয়া যাইত। কতকগুলি লোক যে ঐ কার্যের বিশেষভাবে ভার লইয়া ঐ কথা সকলকে জানাইয়া আনিতেন তাহা নহে। কিন্তু ভক্তদিগের প্রাণ ঠাকুরকে সর্বদা দর্শন

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

করিবার জন্ম এতই উন্মুখ হইয়া থাকিত এবং কার্যগতিকে দক্ষিণেশ্বরে তাঁহাকে দর্শন করিতে যাইতে না পারিলে পরস্পরের বাটীতে সর্বদা গমনাগমন করিয়া তাঁহার কথাবার্তায় এত আনন্দানুভব করিত যে, তাহাদের ভিতর একজন কোনরূপে ঠাকুরের আগমন-সংবাদ জানিতে পারিলেই অতি অল্প সময়ের মধ্যেই উহা অনেকের ভিতর বিনা চেষ্টায় মুখে মুখে রাষ্ট্র হইয়া পড়িত। ঠাকুরের শক্তিতে ভক্তগণ পরস্পরে কি যে এক অনির্বাচনীয় প্রেমবন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছিলেন, তাহা পাঠককে বুঝান দুষ্কর! কলিকাতায় বাগবাজার, সিমলা ও আহিরীটোলা পল্লীতেই ঠাকুরের অনেক ভক্তেরা বাস করিতেন, তজ্জন্ম ঐ তিন স্থানেই ঠাকুরের আগমন অধিকাংশ সময়ে হইত। তন্মধ্যে আবার বাগবাজারেই তাঁহার অধিক পরিমাণে আগমন হইত।

পূর্বেক্ত ঘটনার কিছুকাল পরে ঠাকুর একদিন বাগবাজারে ৩৬বলরাম বসু মহাশয়ের বাটীতে শুভাগমন করিয়াছেন। বাগবাজার অঞ্চলের ভক্তগণ সংবাদ পাইয়া অনেকে উপস্থিত হইলেন। আমাদের পূর্বেক্ত বন্ধুর আবাস অতি নিকটেই ছিল। ঠাকুর তাঁহার কথা জিজ্ঞাসা করায় পাড়ার পরিচিত জনৈক প্রতিবেশী যুবক যাইয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে ডাকিয়া লইয়া আসিলেন। বলরাম বাবুর বাটীর দ্বিতলের প্রশস্ত বৈঠকখানায় প্রবেশ করিয়াই বন্ধু ভক্তমণ্ডলীপরিবৃত ঠাকুরকে দর্শন করিলেন এবং তাঁহাকে প্রণাম করিয়া নিকটেই একপার্শ্বে উপবিষ্ট হইলেন। ঠাকুরও তাঁহাকে সহাস্তে কুশলপ্রশ্নমাত্র করিয়াই উপস্থিত প্রসঙ্গে কথাবার্তা করিতে লাগিলেন।

ভাব, সমাধি ও দর্শন সম্বন্ধে কয়েকটি কথা

দুই-একটি কথার ভাবেই বন্ধু বৃষ্টিতে পারিলেন, ঠাকুর উপস্থিত সকলকে বৃষ্টিতেছেন—জ্ঞান বল, ভক্তি বল, দর্শন বল, কিছুই ঈশ্বরের কৃপা ভিন্ন হইবার নহে। শুনিতে শুনিতে তাঁহার মনে হইতে লাগিল, ঠাকুর তাঁহার মনের ভুল ধারণাটি দূর করিবার জগুই অশ্রু যেন ঐ প্রসঙ্গ উঠাইয়াছেন। মনে হইতে লাগিল, ঠাকুর ঐ সম্বন্ধে যাহা কিছু বলিতেছেন তাহা তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়াই বলিতেছেন।

শুনিলেন, ঠাকুর বলিতেছেন—“কি জ্ঞান? কাম-কাঙ্ক্ষাকে ঠিক ঠিক মিথ্যা বলে বোধ হওয়া, জগৎটা তিন কালেই অসৎ বলে ঠিক

ঠিক মনে জানে ধারণা হওয়া কি কম কথা? তাঁর ঈশ্বরকৃপা
ভিন্ন ঈশ্বরলাভ
হয় না

দয়া না হলে কি হয়? তিনি কৃপা করে ঐরূপ ধারণা যদি করিয়ে দেন তো হয়। নইলে মানুষ

নিজে সাধন করে সেটা কি ধারণা করতে পারে? তার কতটুকু শক্তি! সেই শক্তি দিয়ে সে কতটুকু চেষ্টা করতে পারে?” এইরূপে ঈশ্বরের দয়ার কথা বলিতে বলিতে ঠাকুরের সমাধি হইল। কিছুক্ষণ পরে অর্ধবাহ্যদশাপ্রাপ্ত হইয়া বলিতে লাগিলেন, “একটা ঠিক করতে পারে না, আবার আর একটা চায়।” ঐ কথাগুলি বলিয়াই ঠাকুর ঐরূপ ভাবাবস্থায় গান ধরিলেন—

“ওরে কুশীলব,

করিস কি গৌরব,

ধরা না দিলে কি পারিস্ ধরিতে।”

গাহিতে গাহিতে ঠাকুরের দুই চক্ষে এত জলধারা বহিতে লাগিল যে, বিছানার চাদরের খানিকটা ভিজিয়া গেল! বন্ধুও

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

সে অপূৰ্ব শিকায় দ্রবীড়িত হইয়া কাঁদিয়া আকুল ! কতকণে তবে দুইজনে প্রকৃতিস্থ হইলেন। বন্ধু বলেন, “সে শিক্যা চিরকাল আমার হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে। সেদিন হইতেই বুঝিলাম ঈশ্বরের কৃপা ভিন্ন কিছুই হইবার নহে।”

ঠাকুরের অদ্বৈতজ্ঞানসম্বন্ধীয় গভীরতা সম্বন্ধে আর একটি কথা এখানে আমরা না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না। ঠাকুরের তখন

শশধর পণ্ডিত
ঠাকুরকে যোগ-
শক্তিবলে
রোগ সারাইতে
বলায় ঠাকুরের
উত্তর

অস্থখ—কাশীপুরের বাগানে—বাড়াবাড়ি। শ্রীযুত

শশধর তর্কচূড়ামনি, সঙ্গে কয়েকজন, অস্থখের কথা শুনিয়া দেখিতে আসিলেন। পণ্ডিতজী কথায় কথায়

ঠাকুরকে বলেন, “মহাশয়, শাস্ত্রে পড়েছি আপনাদের

শ্রায় পুরুষ ইচ্ছামাত্রেই শারীরিক রোগ আরাম

করিয়া ফেলিতে পারেন। আরাম হোক মনে করে

মন একাগ্র করে একবার অস্থস্থ স্থানে কিছুক্ষণ রাখলেই সব সেরে যায়। আপনার একবার ঐরূপ করিলে হয় না?”

ঠাকুর বলিলেন, “তুমি পণ্ডিত হয়ে একথা কি করে বল্লে গো? যে মন সচ্চিদানন্দকে দিয়েছি, তাকে সেখান থেকে তুলে এনে এ ভাঙ্গা হাড়-মাসের খাঁচাটার উপর দিতে কি আর প্রবৃত্তি হয়?”

পণ্ডিতজী নিরুত্তর হইলেন; কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ-প্রমুখ

স্বামী বিবেকানন্দ
প্রভৃতি ভক্তগণের
ঠাকুরকে ঐ
বিষয়ে অনুরোধ
ও ঠাকুরের উত্তর
সারাতে হবে।”

ভক্তেরা নিশ্চেষ্টে রহিলেন না। পণ্ডিতজী চলিয়া

যাইবার পরেই ঠাকুরকে ঐরূপ করিবার জন্য

একেবারে বিশেষভাবে ধরিয়া বসিলেন। বলিলেন,

“আপনাকে অস্থখ সারাতেই হবে, আমাদের জন্য

ভাব, সমাধি ও দর্শন সম্বন্ধে কয়েকটি কথা

ঠাকুর—আমার কি ইচ্ছা রে, যে আমি যোগে ভুগি ; আমি তো মনে করি সারুক, কিন্তু সারে কৈ ? সারা না সারা মা-র হাত ।

স্বামী বিবেকানন্দ—তবে মাকে বলুন সারিয়ে দিতে, তিনি আপনার কথা শুনবেনই শুনবেন ।

ঠাকুর—তোরা তো বলছিস্, কিন্তু ও কথা যে মুখ দিয়ে বেরোয় না রে ।

শ্রীযুত স্বামীজি—তা হবে না মশাই, আপনাকে বলতেই হবে । আমাদের জন্ম বলতে হবে ।

ঠাকুর—আচ্ছা দেখি, পারি ত বলবো ।

কয়েক ঘণ্টা পরে শ্রীযুত স্বামীজি পুনরায় ঠাকুরের নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “মশায়, বলেছিলেন ? মা কি বল্লেন ?”

ঠাকুর—মাকে বললুম (গলার ক্ষত দেখাইয়া), ‘এইটের দরুণ কিছু খেতে পারি না, যাতে দুটি খেতে পারি করে দে ।’ তা মা বল্লেন তোদের সকলকে দেখিয়ে, ‘কেন ? এই যে এত মুখে খাচ্ছিস !’ আমি আর লজ্জায় কথাটি কইতে পারলুম না ।

কি অদ্ভুত দেহবুদ্ধির অভাব ! কি অপূর্ব অদ্বৈতজ্ঞানে অবস্থান ! তখন ছয়মাস কাল ধরিয়া ঠাকুরের নিত্য আহার, ঠাকুরের বোধ হয় চারি-পাঁচ ছটাক বালী মাত্র; সেই অদ্বৈতভাবের অবস্থায় জগন্মাতা যাই বলিয়াছেন, ‘এই যে এত গভীরতা মুখে খাচ্ছিস্’, অমনি “কি কুর্কর্ম করিয়াছি, এই একটা ক্ষুদ্র শরীরকে ‘আমি’ বলিয়াছি !”—মনে করিয়া ঠাকুর

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

লজ্জায় হেঁটমুখ ও নিরুত্তর হইলেন। পাঠক, এ ভাব কি একটুও
কল্পনায় আনিতে পার ?

কি অদ্ভুত ঠাকুরের সঙ্গে দেখাই না আমাদের ভাগ্যে
ঘটিয়াছে ! জ্ঞান-ভক্তি, যোগ-কর্ম, পুরাতন-নবীন, সকলপ্রকার

ধর্মভাবের কি অদৃষ্টপূর্ব সামঞ্জস্যই না তাহাতে
ঠাকুরের সকল প্রকার পরী-
ক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া
প্রত্যক্ষ করিয়াছি ! উপনিষদকার ঋষি বলেন, ঠিক
ঠিক ব্রহ্মজ্ঞানী পুরুষ সর্বজ্ঞ ও সত্যসংকল্প হন।

সংকল্প বা ইচ্ছামাত্রেরেই তাহার ইচ্ছা বাহ্য জগতের
সকল পদার্থ, সকল শক্তি ঘাড় পাতিয়া মানিয়া লয় ও সেই
ভাবে পরিবর্তিত হয়। অতএব উক্ত পুরুষের নিজের শরীর-মন
যে তদ্রূপ করিবে ইহাতে বিচিত্র কি আছে ! উপনিষদকারের ঐ
বাক্যের সত্যতা পরীক্ষা করা সাধারণ মানবের সাধ্যাত্ত নহে ;
তবে একথা বেশ বলা যাইতে পারে যে, যতদূর পরীক্ষা করা
আমাদের ক্ষুদ্র শক্তিতে সম্ভব, তাহার বোধ হয় কিছু অভাব বা
ক্রটি, আমরা সকল বিষয়ে অহুঙ্কণ যেভাবে ঠাকুরকে পরীক্ষা
করিয়া লইতাম, তাহাতে হয় নাই। ঠাকুর প্রতিবারই কিন্তু সে
সকল পরীক্ষায় হাসিতে হাসিতে অবলীলাক্রমে উত্তীর্ণ হইয়া যেন
ব্যঙ্গ করিয়াই আমাদের বলিতেন, “এখনও অবিশ্বাস ! বিশ্বাস
কর—পাকা করে ধর—যে রাম, যে কৃষ্ণ হয়েছিল, সেই ইদানীং
(নিজের শরীরটা দেখাইয়া) এ খোলটার ভিতর—তবে এবার
গুপ্তভাবে আসা ! যেমন রাজার ছদ্মবেশে নিজ রাজ্য-পরিদর্শন !
যেমনি জানাজানি কানাকানি হয় অমনি সে সেখান থেকে সরে
পড়ে—সেই রকম !”

ভাব, সমাধি ও দর্শন সম্বন্ধে কয়েকটি কথা

ঠাকুরের জীবনের অনেক ঘটনা উপনিষদোক্ত ঐ বিষয়ে আমাদের চক্ষু ফুটাইয়া দেয়। সাধারণতঃ দেখা যায়, মানবমনে যত প্রকার ভাবের উদয় হয় সেগুলি প্রকৃতপক্ষে ঠাকুরের ভাব-কালে দৃষ্ট বিষয়গুলি বাহ্যজগতে সত্য হইতে দেখা যত প্রকার ভাবের উদয় হয় সেগুলি প্রকৃতপক্ষে তাহারই 'স্বসংবেদ্য' অর্থাৎ ঐ সকল ভাবের পরিমাণ, তীব্রতা ইত্যাদি সে নিজেই ঠিক ঠিক জানিতে পারে। অপরে কেবল ভাবের বাহ্যিক বিকাশ দেখিয়া ঐ সকলের অনুমান মাত্র করিয়া থাকে। ভাব-সমাধির ঐরূপ স্বসংবেদ্য প্রকৃতি (subjective nature) সকলেরই প্রত্যক্ষের অস্তভূত। সকলেই জানে ভাবসকল অন্তঃস্থ চিন্তাসমূহের দ্বারা মানসিক বিকার বা শক্তি-প্রকাশ মাত্র—মনেতেই উহাদের উদয়, মনেতেই লয়; বাহ্য-জগতে উহার ছবি বা অনুরূপ প্রতিকৃতি দেখা ও দেখান অসম্ভব। ঠাকুরের ভাবসমাধির অনেকগুলিতে কিন্তু উহার বৈপরিত্য দেখা যায়। ধর—সাধনকালে ঠাকুরের স্বহস্তরোপিত পঞ্চবটীর চারাগাছগুলি ছাগল-গোরুতে মুড়াইয়া খাইয়াছে ঐ দৃষ্টান্ত— দেখিয়া ঐ স্থানের চতুর্দিকে ঠাকুরের বেড়া দিবার পঞ্চবটীর বেড়া ইচ্ছা হওয়া এবং তাহার কিছুক্ষণ পরেই গঙ্গায় ইত্যাদি বান ডাকিয়া ঐ বেড়া-নির্মাণের জন্য আবশ্যকীয় যত কিছু দ্রব্যাদি—কতকগুলি গরানের খুঁটি, বাঁথারি, নারিকেল-দড়ি, মায় একখানি কাটারি পর্য্যন্ত—সেইস্থানে ভাসিয়া আসিয়া লাগা ও তাহার কালীবাটীর ভর্তাভারি নামক মালীর সাহায্যে ঐ বেড়া-নির্মাণ! অথবা ধর—রাসমণির জামাতা মথুরানাথের সহিত তর্কে তাহার বলা "ঈশ্বরের ইচ্ছায় সব হতে পারে—

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

লাল ফুলের গাছে সাদা ফুলও হতে পারে”, মথুরের তাহা অস্বীকার করা এবং পরদিনই ঠাকুরের বাগানের জবাগাছের একটি ডালের দুটি ফ্যাক্‌ডায় ঐরূপ দুটি ফুল দেখিতে পাওয়া ও ফুলশুদ্ধ ঐ ডালটি ভাঙ্গিয়া আনিয়া মথুরানাথকে দেওয়া ! অথবা ধর—তন্ত্র বেদান্ত বৈষ্ণব ইসলামাদি যখন যে মতের সাধনা করিবারই অভিলাষ ঠাকুরের প্রাণে উদ্ভিত হওয়া, তখনি সেই সেই মতের এক এক জন সিদ্ধ ব্যক্তির দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে উপস্থিত হওয়া এবং তাঁহাকে ঐ ঐ মতে দীক্ষিত করা। অথবা ধর—ঠাকুরের ভক্তদিগকে আহ্বান ও তাহারা উপস্থিত হইলে তাহাদের প্রত্যেককে ঠাকুরের চিনিয়া গ্রহণ করা—ঐরূপ অনেক কথার উল্লেখ করা যাইতে পারে। অনুধাবন করিলে ঐ সকল ঘটনায় এইটি দেখিতে পাওয়া যায় যে, ঠাকুরের মানসিক ভাবের অনেকগুলি সাধারণ মানবমনের ভাবসকলের ম্যায় কেবলমাত্র মানসিক চিন্তা বা প্রকাশরূপেই পর্যাবসিত ছিল না। কিন্তু বাহ্যজগতের অন্তর্গত ঘটনাবলী ঐ সকলের দ্বারা আমাদের অপরিজ্ঞাত কি এক নিয়মবশে তদনুরূপভাবে পরিবর্তিত হইত। আমরা এখানে উক্ত সত্যের নির্দেশমাত্র করিয়াই ছাড়িয়া দিলাম। উহা হইতে পাঠকেরা যাঁহার যেরূপ অভিরুচি তিনি তদ্রূপ আলোচনা ও অনুমানাদি করুন—ঘটনা কিন্তু সত্যই ঐরূপ।

পূর্বেই বলিয়াছি, ঠাকুর নির্বিকল্পসমাধি-অবস্থার সময় ভিন্ন অপর সকল সময়ে ‘ভাবমুখে’ থাকিতেন। এইজন্যই দেখা যায় তিনি তাঁহার সমীপাগত প্রত্যেক ভক্তের সহিত এক একটি ভিন্ন ভিন্ন ভাবের সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া বরাবর সেই সেই সম্বন্ধ

ভাব, সমাধি ও দর্শন সম্বন্ধে কয়েকটি কথা

অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীজগদম্বার ফ্লাদিনী ও সন্ধিনী শক্তির বিশেষবিকাশক্ষেত্রস্বরূপ যত স্ত্রীমূর্তির সহিত ঠাকুরের আজীবন

মাতৃ-সম্বন্ধের কথা এখন সাধারণে প্রসিদ্ধ। কিন্তু প্রত্যেক ভক্তের পুরুষভক্তদিগের প্রত্যেকের সহিত তাঁহার ঐরূপ সহিত ঠাকুরের এক একটি সম্বন্ধ থাকার কথা বোধ হয় সাধারণে বিভিন্ন ভাবের সম্বন্ধ এখনও জ্ঞাত নহে। সেজন্য ঐ সম্বন্ধে কিছু বলা

এখানে অপ্ৰাসঙ্গিক হইবে না। সাধারণতঃ ঠাকুর তাঁর ভক্ত-দিগকে দুই থাকে বা শ্রেণীতে নিবদ্ধ করিতেন—শিবাংশসম্ভূত ও বিষ্ণু-অংশোদ্ভূত। ঐ দুই শ্রেণীর ভক্তদিগের প্রকৃতি, আচার-ব্যবহার, ভজনাভিরাগ প্রভৃতি সকল বিষয়ে পার্থক্য আছে বলিয়া নির্দেশ করিতেন এবং নিজে তাহা সম্যক বুঝিতে পারিতেন। কিন্তু ঐ পার্থক্য যে কি, তাহা বিশেষ করিয়া পাঠককে বুঝান আমাদের একপ্রকার সাধ্যাতীত।

অতএব সংক্ষেপে পাঠক ইহাই বুঝিয়া লউন যে, শিব ও বিষ্ণু-চরিত্র যেন দুইটি আদর্শ ছাঁচ (type or model)

এবং ঐ দুই ভিন্ন ছাঁচে যেন ভক্তদিগের প্রত্যেকের ভক্তদিগের মানসিক প্রকৃতি গঠিত—এই পর্য্যন্ত। ঐ সকল দুই শ্রেণী

ভক্তদিগের সহিত ঠাকুরের শাস্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্যাদি সকলপ্রকার ভাবেরই সম্বন্ধ স্থাপিত ছিল—অবশ্য বিভিন্ন জনের সহিত বিভিন্ন ভাবের সম্বন্ধ ছিল। যথা, শ্রীযুত নরেন্দ্রনাথ বা স্বামী বিবেকানন্দের কথায় বলিতেন, “নরেন্দ্রর যেন আমার স্বপ্নরঘর—(আপনাকে দেখাইয়া) এর ভেতর যেটা আছে সেটা যেন মাদি, আর (নরেন্দ্রকে দেখাইয়া) ওর ভেতর

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

যেটা আছে সেটা যেন মন্দা” ; শ্রীযুত ব্রহ্মানন্দ স্বামী বা রাখাল মহারাজকে ঠিক ঠিক নিজ পুত্রস্থানীয় বিবেচনা করিতেন। সন্ন্যাসী ও গৃহী বিশেষ বিশেষ ভক্তদিগের প্রত্যেকের সহিত ঠাকুরের ঐরূপ এক একটা বিশেষ বিশেষ ভাব বা সম্বন্ধ ছিল এবং সাধারণ ভক্তমণ্ডলীর প্রত্যেকের প্রতি ঠাকুরের নারায়ণ-বুদ্ধি সর্বদা স্থির থাকায় তাহাদের সহিত শাস্ত্রভাবের সম্বন্ধ যে তিনি অবলম্বন করিয়া থাকিতেন, একথা বলা বাহুল্য। ভক্তদিগের প্রত্যেকের ভিতরকার প্রকৃতি দেখিয়াই ঠাকুরের তাহাদের সহিত ঐরূপ ভাব বা সম্বন্ধ স্থাপিত হইত। কারণ ঠাকুর বলিতেন, “মানুষগুলোর ভেতর কি আছে, তা সব দেখতে

ভক্তদিগের	পাই ; যেমন কাঁচের আলমারির ভেতর যা যা
প্রকৃতি দেখিয়া	জিনিস থাকে সব দেখা যায়, সেই রকম।” তাহার
ঠাকুরের	যে রূপ প্রকৃতি সে তদ্বিপরীতে কখনই আচরণ
প্রত্যেকের	করিতে পারে না—কাজেই ভক্তদিগের কাহারও
সহিত ভাব-	ঠাকুরের ঐ সম্বন্ধ বা ভাবের বিপরীতে গমন বা
সম্বন্ধ পাতান	

আচরণ কখন সাধ্যায়ত্ত ছিল না। যদি কখনও কেহ অপর কাহারও দেখাদেখি বিপরীত ভাবের আচরণ করিত ত ঠাকুর তাহাতে বিশেষ বিরক্ত হইতেন ও তাহার ভুল বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিতেন। যথা, শ্রীযুত গিরিশকে ঠাকুর ভৈরব বলিতেন। দক্ষিণেশ্বরে কালিকা মাতার মন্দিরে ভাব-সমাধিতে তাঁহাকে একদিন ঐরূপ দেখিয়াছিলেন। শ্রীযুত গিরিশের অনেক আবদার ও কঠিন ভাষা তিনি হাসিয়া সহ্য করিতেন—কারণ তাঁহার ঐরূপ ভাষার আবরণে অপূর্ব কোমল একান্ত-নির্ভরতার ভাব

ভাব, সমাধি ও দর্শন সম্বন্ধে কয়েকটি কথা

যে লুক্কায়িত তাহা তিনি দেখিতে পাইতেন। গিরিশের দেখাদেখি ঠাকুরের অপর জনৈক প্রিয় ভক্ত একদিন ঐরূপ ভাষা-প্রয়োগ করায় ঠাকুর তাহার প্রতি বিশেষ বিরক্ত হন ও পরে তাহার ভুল তাহাকে বুঝাইয়া দেন। যাক এখন সে সব কথা, আমাদের বক্তব্য বিষয়ই বলিয়া যাই।

ভাবমুখাবস্থিত ঠাকুর ঐরূপে স্ত্রী বা পুরুষ, প্রত্যেক ভক্তের নিজ নিজ প্রকৃতিগত আধ্যাত্মিক ভাব সম্যক বুঝিয়া তাহাদের সহিত তত্ত্বাবাহুযায়ী একটা সপ্রেম সম্বন্ধ সর্বকালের জন্ত পাতাইয়া রাখিয়াছিলেন। তত্ত্ব ভাবসম্বন্ধাশ্রয়ে তাহাদের প্রত্যেকে ভগবদর্শন-লাভের পথে যে কিরূপে কত প্রকারে অগ্রসর করাইয়া দিতেন, তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় এখানে পাঠককে দিয়া আমরা এ অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি করিব। অদ্বৈত-

ঠাকুর ভক্ত-
দিগকে কত
প্রকারে ধর্ম-
পথে অগ্রসর
করাইতেন

ভাবভূমি হইতে নামিয়া আসিয়াই ঠাকুর স্বয়ং সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর-রসোপলব্ধির জন্ত সাধনা করিয়া তত্ত্বভাবে পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাহার অনেকদিন পরে যখন ভক্তেরা অনেকে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়াছেন, তখন একদিন

ঠাকুরের ভাবাবস্থায় ইচ্ছা হয় ভক্তদেরও ভাবসমাধি হউক এবং জগদম্বার নিকট ঐ বিষয়ে প্রার্থনা করেন। তাহার পরই ভক্তদিগের মধ্যে কাহারও কাহারও ঐরূপ হইতে থাকে। ঐরূপ ভাবাবস্থায় তাঁহাদের বাহুজগৎ ও দেহাদি-বোধ কতকটা কমিয়া যাইয়া ভিতরের কোন একটি বিশেষ ভাবপ্রবাহ, যথা—কোন মূর্তিচিন্তা, এত পরিস্ফুট হইত যে, ঐ মূর্তি যেন জলন্ত জীবন্তরূপে

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

তাঁহাদের সম্মুখে অবস্থিত হইয়া হাসিতেছেন, কথা কহিতেছেন ইত্যাদি তাঁহারা দেখিতে পাইতেন। ভজন-সঙ্গীতাদি শুনিলেই তাঁহাদের প্রধানতঃ ঐরূপ হইত।

ঠাকুরের আর একদল ভক্ত ছিলেন যাঁহাদের সঙ্গীতাদি শুনিলে ওরূপ হইত না, কিন্তু ধ্যানাদি করিবার কালে ভক্তদিগের
দেবদেবীর
মূর্ত্তিদর্শন দেবমূর্ত্ত্যাদির সন্দর্শন হইত। প্রথম প্রথম কেবল-মাত্র দর্শনই হইত, পরে ধ্যান যত গাঢ় বা গভীর হইতে থাকিত, তত ঐ সকল মূর্ত্তির নড়াচড়া কথা-কওয়া ইত্যাদিও তাঁহারা দেখিতে পাইতেন। আবার কেহ কেহ প্রথম প্রথম নানাপ্রকার দর্শনাদি করিতেন, কিন্তু ধ্যান আরও গভীরভাবপ্রাপ্ত হইলে আর ঐরূপ দর্শনাদি করিতেন না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, শ্রীরামকৃষ্ণদেব ইঁহাদের প্রত্যেকের দর্শন ও অনুভবাদির কথা শ্রবণ করিয়াই বুঝিতেন, কে কোন্ 'থাক্' বা শ্রেণীর এবং কাহার পক্ষে কি প্রয়োজন এবং পরেই বা তাঁহারা প্রত্যেকে কি দর্শনাদি করিবেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা এখানে একজনের কথাই বলি। আমাদের একটি বন্ধু^১ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দ্বারা উপদিষ্ট হইয়া ধ্যানাদি করিতে আরম্ভ করিলেন এবং প্রথম প্রথম ধ্যানের সময় ইষ্টমূর্ত্তির নানাভাবে সন্দর্শন করিতে লাগিলেন। যেমন যেমন দেখিতেন, কয়েকদিন অন্তর দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া উহা ঠাকুরকে জানাইতেন। ঠাকুরও শুনিয়া বলিতেন, "বেশ হইয়াছে", অথবা "এইরূপ করিস" ইত্যাদি। পরে একদিন ঐ বন্ধুটি ধ্যানের সময় দেখিলেন, যত প্রকার দেবদেবীর

১ স্বামী অভৈদানন্দ

ভাব, সমাধি ও দর্শন সম্বন্ধে কয়েকটি কথা

মূর্তি একটি মূর্তির অঙ্গে মিলিত হইয়া গেল। ঠাকুরকে ঐকথা
নিবেদন করায় ঠাকুর বলিলেন, “যা, তোমার বৈকুণ্ঠ-
অনেক ভক্তের
বৈকুণ্ঠদর্শন
দর্শন হয়ে গেল। ইহার পর আর দর্শন হবে না।”
আমাদের বন্ধু বলেন, “বাস্তবিকও তাহাই হইল—
ধ্যান করিতে করিতে কোন মূর্তিই আর দোখতে পাইতাম না।
শ্রীভগবানের সর্বব্যাপিত্বাদি অন্তপ্রকারের উচ্চ ভাবসমূহ আসিয়া
হৃদয় অধিকার করিয়া বসিত। আমার তখন মূর্তিদর্শন করা বেশ
লাগিত, যাহাতে আবার ঐরূপ দর্শনাদি হয় তাহার চেষ্টাও খুব
করিতাম; কিন্তু করিলে কি হইবে, কিছুতেই আর কোন মূর্তির
দর্শন হইত না!”

সাকারবাদী ভক্তদের বলিতেন, “ধ্যান করবার সময় ভাব্বে,
যেন মনকে বেশমের রশি দিয়ে ইষ্টের পাদপদ্মে বেঁধে রাখ্চ,
যেন সেখান থেকে আর কোথাও যেতে না পারে।
সাকার-
বাদীদের প্রতি
ঠাকুরের
উপদেশ
বেশমের দড়ি বল্ছি কেন?—সে পাদপদ্ম যে
বড় নরম। অন্য দড়ি দিয়ে বাঁধলে লাগবে
তাই।” আবার বলিতেন, “ধ্যান করবার সময়
ইষ্টচিন্তা করে তারপর কি অন্য সময় ভুলে থাকতে হয়?
কতকটা মন সেইদিকে সর্বদা রাখবে। দেখেছ তো, দুর্গাপূজার
সময় একটা যাগ-প্রদীপ জ্বলতে হয়। ঠাকুরের
কাছে সর্বদা একটা জ্যোৎ (জ্যোতিঃ) রাখতে হয়,
সেটাকে নিব্লে দিতে নেই। নিব্লে গেরস্তর
অকল্যাণ হয়। সেইরকম হৃদয়পদ্মে ইষ্টকে এনে
বসিয়ে তাঁর চিন্তারূপ যাগ-প্রদীপ সর্বদা জ্বলে রাখতে হয়।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

সংসারের কাজ করতে করতে মাঝে মাঝে ভেতরে চেয়ে দেখতে হয়, সে প্রদীপটা জ্বলচে কিনা ?”

আবার বলিতেন, “ওগো, তখন তখন ইষ্টচিন্তা করবার আগে ভাব্তুম, যেন মনের ভেতরটা বেশ করে ধুয়ে দিচ্ছি ! মনের ভেতর নানান আবর্জনা, ময়লা-মাটি (চিন্তা, বাসনা ইত্যাদি) থাকে কিনা ? সেগুলো সব বেশ করে ধুয়ে ধেয়ে সাফ করে তার ভেতর ইষ্টকে এনে বসাবি !—এই রকম কোরো !” ইত্যাদি ।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব এক সময়ে শ্রীভগবানের সাকার ও নিরাকার-ভাব-চিন্তা সম্বন্ধে আমাদের বলেন, “কেহ বা সাকার দিয়ে নিরাকারে পৌঁছায়, আবার কেহ বা নিরাকার দিয়ে সাকারে পৌঁছায়।” ঠাকুরের পরমভক্ত শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্রের বাড়ীতে বসিয়া একদিন আমাদের এক বন্ধু^১ ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করেন—‘মহাশয়, সাকার বড় না নিরাকার বড় ?’ তাহাতে ঠাকুর বলেন, “নিরাকার দু রকম আছে, পাকা ও কাঁচা। পাকা নিরাকার উঁচু ভাব বটে; সাকার ধরে সে নিরাকারে পৌঁছুতে হয়। কাঁচা নিরাকারে চোখ বুঁজলেই অন্ধকার—যেমন ব্রাহ্মদের^২।” পাশ্চাত্য-শিক্ষার ফলে ঐরূপ

১ শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসু

২ সত্যের অনুরোধে এ কথাটি আমরা বলিলাম বলিয়া কেহ না মনে করেন, ঠাকুর বর্তমান ব্রাহ্মসমাজ বা ব্রহ্মজ্ঞানীদের নিন্দা করিতেন। কীর্তনান্তে যখন সকল সম্প্রদায়ের সকল ভক্তদের প্রণাম করিতেন, তখন

ভাব, সমাধি ও দর্শন সম্বন্ধে কয়েকটি কথা

কাঁচা নিরাকার ধরিয়া সাধনায় অগ্রসর ঠাকুরের আর একদল ভক্তও ছিলেন। তাঁহাদের ঠাকুর ক্রীষ্টান পাদ্রীদের মত সাকারভাব চিন্তার নিন্দা অথবা শ্রীভগবানের সাকারমূর্ত্যাদি-অবলম্বনে সাধনায় অগ্রসর ভক্তদিগকে ‘পৌত্তলিক’ ‘অন্ধবিশ্বাসী’ ইত্যাদি বলিয়া দ্বেষ করিতে নিষেধ করিতেন। বলিতেন, “ওরে তিনি সাকারও বটে আবার নিরাকারও বটে, আবার তা ছাড়া আরও কি তা কে জানে? সাকার কেমন জানিস্—যেমন জল আর বরফ। জল জমেই বরফ হয়; বরফের ভিতরে বাহিরে জল। জল ছাড়া বরফ আর কিছুই নয়। কিন্তু ঘাথ, সাকার ও জলের রূপ নেই (একটা কোন বিশেষ আকার নিরাকারের নাই), কিন্তু বরফের আকার আছে। তেমনি ভক্তি-সামঞ্জস্য হিমে অথও সচ্চিদানন্দমাগরের জল জমে বরফের মত নানা আকার ধারণ করে। ঠাকুরের ঐ দৃষ্টান্তটি যে কত লোকের মনে শ্রীভগবানের সাকার নিরাকার উভয় ভাবের একত্রে এক সময়ে সমাবেশ সম্ভবপর বলিয়া ধারণা করাইয়া শাস্তি দিয়াছে, তাহা বলিবার নহে।

এখানে আর একটি কথাও না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি

‘আধুনিক ব্রহ্মজ্ঞানীদের প্রণাম’—একথাটি তাঁহাকে বার বার আমরা বলিতে শুনিয়াছি। সুবিখ্যাত ব্রাহ্মসমাজের নেতা ভক্তপ্রবর কেশবই সর্বপ্রথম ঠাকুরের কথা কলিকাতার জনসাধারণে প্রচার করেন, একথা সকলেই জানেন এবং ঠাকুরের সন্ন্যাসী ভক্তদের মধ্যে শ্রীবিবেকানন্দ-প্রমুখ কয়েকজন ব্রাহ্মসমাজের নিকট চিরঞ্জী, একথাও তাঁহারা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া থাকেন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

না। ঠাকুরের কাঁচা নিরাকারবাদী ভক্তদলের ভিতর সর্বপ্রধান
ছিলেন—শুধু ঐ দলের কেন ঠাকুর তাঁহাকে সকল
স্বামী বিবেকানন্দ ও অঙ্ক-
বিশ্বাস থাক বা শ্রেণীর সকল ভক্তদিগের অগ্রে আসন প্রদান
করিতেন—শ্রীযুত নরেন্দ্র বা স্বামী বিবেকানন্দ।
তাঁহার তখন পাশ্চাত্যশিক্ষা ও ব্রাহ্মসমাজের
প্রভাবে সাকারবাদীদের উপর একটু আধটু কঠিন কটাক্ষ কখন
কখন আসিয়া পড়িত। তর্কের সময়েই ঐ ভাবটি তাঁহাতে
বিশেষ লক্ষিত হইত। ঠাকুর কিন্তু সময়ে সময়ে তাঁহার সহিত
সাকারবাদী কোন কোন ভক্তের ঘোরতর তর্ক বাধাইয়া দিয়া
মজা দেখিতেন। ঐরূপ তর্কে স্বামীজির মুখের সামনে বড়
একটা কেহ দাঁড়াইতে পারিতেন না এবং স্বামীজির তীক্ষ্ণ যুক্তির
সম্মুখে নিরুত্তর হইয়া কেহ কেহ মনে মনে ক্ষুণ্ণও হইতেন।
ঠাকুরও সে কথা অপরের নিকট অনেক সময় আনন্দের সহিত
বলিতেন, “অমুকের কথাগুলো নরেন্দ্রর সে দিন কাঁচ, কাঁচ,
করে কেটে দিলে!—কি বুদ্ধি!” ইত্যাদি। সাকারবাদী গিরিশের
সহিত তর্কে কিন্তু স্বামীজিকে একদিন নিরুত্তর হইতে হইয়াছিল।
সেদিন ঠাকুর শ্রীযুত গিরিশের বিশ্বাস আরও দৃঢ় ও পুষ্ট করিবার
জগুই যেন তাঁহার পক্ষে ছিলেন বলিয়া আমাদের বোধ
হইয়াছিল। সে যাহা হউক, স্বামী বিবেকানন্দ একদিন শ্রীভগবানে
বিশ্বাস সম্বন্ধে কথার সময় ঠাকুরের নিকট সাকারবাদীদের
বিশ্বাসকে ‘অঙ্কবিশ্বাস’ বলিয়া নির্দেশ করেন। ঠাকুর তদুত্তরে
তাঁহাকে বলেন, “আচ্ছা, অঙ্কবিশ্বাসটা কাকে বলিস্ আমায়
বোঝাতে পারিস্? বিশ্বাসের তো সবটাই অঙ্ক; বিশ্বাসের আবার

ভাব, সমাধি ও দর্শন সম্বন্ধে কয়েকটি কথা

চক্ষু কি ? হয় বল্ 'বিশ্বাস', আর নয় বল্ 'জ্ঞান'। তা নয়, বিশ্বাসের ভেতর আবার কতকগুলো অঙ্ক আর কতকগুলোর চোখ আছে—এ আবার কি রকম ?” স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন, “বাস্তবিকই সেদিন আমি ঠাকুরকে অঙ্কবিশ্বাসের অর্থ বুঝাইতে যাইয়া ফাঁপরে পড়িয়াছিলাম। ও কথাটার কোনও অর্থই খুঁজিয়া পাই নাই। ঠাকুরের কথাই ঠিক বলিয়া বুঝিয়া সেদিন হইতে আর ও কথাটা বলা ছাড়িয়া দিয়াছি।”

কাঁচা নিরাকারবাদীদেরও ঠাকুর সাকারবাদীদের সহিত সমান চক্ষে দেখিতেন। তাহাদেরও কিরূপভাবে ধ্যান করিলে সহায়ক হইবে বলিয়া দিতেন। বলিতেন, “গাথ্, নিরাকার-
বাদীদের প্রতি উপদেশ আমি তখন তখন ভাবতুম, ভগবান যেন সমুদ্রের জলের মত সব জায়গা পূর্ণ করে রয়েছেন, আর আমি যেন একটি মাছ—সেই সচ্চিদানন্দ-সাগরে ডুবছি, ভাসছি, সাঁতার দিচ্ছি ! আবার কখন মনে হত, আমি যেন একটি কুম্ভ, সেই জলে ডুবে রয়েছি, আর আমার ভিতরে বাহরে সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ পূর্ণ হয়ে রয়েছেন।” আবার বলিতেন, “গাথ্, ধ্যান করতে বসবার আগে একবার (আপনাকে দেখাইয়া) একে ভেবে নিবি। কেন বলছি ?—এখানকার ওপর তোদের বিশ্বাস আছে কি না ! একে ভাবলেই তাঁকে (ভগবানকে) মনে পড়ে যাবে। ঐ যে গো, যেমন গরুর পাল দেখলেই রাখালকে মনে পড়ে, ছেলেকে দেখলেই তার বাপের কথা মনে পড়ে, উকীল দেখলেই কাছারীর কথা মনে পড়ে, সেই রকম

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

বুঝলে কি না? মন নানান্ জায়গায় ছড়িয়ে থাকে কি না, একে ভাবলেই মনটা এক জায়গায় গুটিয়ে আসবে, আর সেই মনে ঈশ্বরকে চিন্তা করলে তাতে ঠিক ঠিক ধ্যান ঠাকুরের নিজ মূর্তি ধ্যান করিতে উপদেশ

মনে ঈশ্বরকে চিন্তা করলে তাতে ঠিক ঠিক ধ্যান লাগবে—এই জন্তে বলছি।” আবার বলিতেন, “যাঁকে ভাল লাগে, যে ভাব ভাল লাগে, এক জনকে বা একটাকে পাকা করে ধর, তবে ত আঁট

হবে। ‘সে যে ভাবের বিষয় ভাব ব্যতীত অভাবে কি ধরতে পারে।’—ভাব চাই। একটা ভাব নিয়ে তাঁকে ডাকতে হয়। ‘যেমন ভাব তেমনি লাভ, মূল সে প্রত্যয়। ভাবিলে ভাবের উদয় হয়।’ ভাব চাই, বিশ্বাস চাই, পাকা করে ধরা চাই— তবে ত হবে। ভাব কি জান?—তঁার (ঈশ্বরের) সঙ্গে একটা সম্বন্ধ পাতান—এরই নাম। সেইটে সর্বক্ষণ মনে রাখা, যেমন—তঁার দাস আমি, তঁার সন্তান আমি, তঁার অংশ আমি; এই হচ্ছে পাকা আমি, বিচার আমি—এইটি খেতে শুতে বসতে সব সময় স্মরণ রাখা। আর এই যে বামুন আমি, কায়েৎ আমি,

‘কাঁচা আমি ও পাকা আমি’; একটা ভাব পাকা করে ধরলে তবে ঈশ্বরের উপর জোর চলে

অমূকের ছেলে আমি, অমূকের বাপ আমি—এ সব হচ্ছে অবিচার আমি; এগুলোকে ছাড়তে হয়, ত্যাগ করতে হয়—ওগুলোতে অভিমান-অহঙ্কার বাড়িয়ে বন্ধন এনে দেয়। স্মরণ-মননটা সর্বদা রাখা চাই, খানিকটে মন সব সময় তাঁর দিকে ফিরিয়ে রাখবে—তবে তো হবে। একটা ভাব

পাকা করে ধরে তাঁকে আপনার করে নিতে হবে, তবে তো তাঁর উপর জোর চলবে। এই ছাথ না, প্রথম প্রথম একটু-

ভাব, সমাধি ও দর্শন সম্বন্ধে কয়েকটি কথা

আধটু ভাব যতক্ষণ, ততক্ষণ ‘আপনি, মশাই’ ইত্যাদি লোকে বলে থাকে ; সেই ভাব যেই বাড়ল, অমনি ‘তুমি তুমি’—আর তখন ‘আপনি টাপনি’ গুলো বলা আসে না ; যেই আরও বাড়ল, আর তখন ‘তুমি টুমি’তেও মানে না—তখন ‘তুই মুই’ ! তাঁকে আপনার হতে আপনার করে নিতে হবে, তবে তো হবে। যেমন নষ্ট মেয়ে, পরপুরুষকে প্রথম প্রথম ভালবাসতে শিখচে— তখন কত লুকোলুকি, কত ভয়, কত লজ্জা, তারপর যেই ভাব বেড়ে উঠলো, তখন আর কিছু নেই ! একেবারে তার হাত ধরে সকলের সামনে কুলের বাইরে এসে দাঁড়ালো ! তখন যদি সে পুরুষটা তাকে আদর-যত্ন না করে, ছেড়ে যেতে নষ্ট মেয়ের দৃষ্টান্ত চায়, তো তার গলায় কাপড় দিয়ে টেনে ধরে বলে, ‘তোমার জন্তে পথে দাঁড়ালুম, এখন তুই খেতে দিবি কি না বল ।’ সেই রকম, যে ভগবানের জন্তে সব ছেড়েছে, তাঁকে আপনার করে নিয়েচে, সে তাঁর ওপর জোর করে বলে, ‘তোমার জন্তে সব ছাড়লুম, এখন ছাখা দিবি কি-না—বল’ !”

কাহারও ভগবদনুরাগের জোর কমিয়াছে দেখিলে বলিতেন, “এ জন্মে না হোক পর জন্মে পাব, ও কি কথা ? অমন ম্যাদাটে এ জন্মে ঈশ্বর-লাভ করবো— মনে এই জোর রাখা চাই ভক্তি করতে নেই। তাঁর কুপায় তাঁকে এ জন্মেই পাব, এখনি পাব—মনে এইরকম জোর রাখতে হয়, বিশ্বাস রাখতে হয়, তা না হলে কি হয় ? ও দেশে চাষীরা সব গরু কিনতে গিয়ে গরুর ল্যাঞ্জে আগে হাত দেয়। কতকগুলো গরু আছে ল্যাঞ্জে হাত দিলে কিছু বলে না, গা এলিয়ে শুয়ে পড়ে—অমনি তারা বোঝে

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

সেগুলো ভাল নয়। আর যেগুলোর ল্যাজে হাত দেবামাত্র তিড়িং মিড়িং করে লাফিয়ে ওঠে—অমনি বোঝে এইগুলো খুব কাজ দেবে—এগুলোর ভিতর থেকে পছন্দ করে কেনে।

ম্যাদাটে ভাব ভাল নয় ; জোর নিয়ে এসে, বিশ্বাস করে বল—
তাঁকে পাবই পাব, এখনি পাব—তবে ত হবে।”

এক এক করে
বাসনাত্যাগ
করা চাই

আবার বলিতেন, “এ দিককার বাসনাকামনাগুলো
সব এক এক করে ছাড়বে, তবে ত হবে। কোথা
ও গুলোকে সব এক এক করে ছাড়বে—না আরও

বাড়াতে চললে !—তা হলে কেমন করে হবে ?”

যখন ধ্যান-ভজন, প্রার্থনাদি করিয়া শ্রীভগবানের সাড়া না
পাইয়া মন নিরাশার সাগরে ভাসিত, তখন সাকার নিরাকার উভয়

চার করে মাছ
ধরার মত
অধ্যবসায়
চাই

বাদীদেরই বলিতেন, “মাছ ধরতে গেলে প্রথম
চার করতে হয়। হয়ত চার করে ছিপ ফেলে
বসেই আছে—মাছের কোন চিহ্নই দেখা যাচ্ছে না,
মনে হচ্ছে তবে বুঝি পুকুরে মাছ নেই। তারপর

হয়ত একদিন দেখলে একটা বড় মাছ ঘাই দিলে—অমনি বিশ্বাস
হল পুকুরে মাছ আছে। তারপর হয়ত একদিন ছিপের

ফাৎনাটা নড়লো—অমনি মনে হলো চারে মাছ এয়েছে। তারপর
হয়ত একদিন ফাৎনাটা ডুবলো, তুলে দেখলে—মাছ টোপ

ভগবান
'কাণখড়কে'
—সব গুনের

খেয়ে পালিয়েছে ; আবার টোপ গেঁথে ছিপ ফেলে
খুব সাবধানে বসে রইল। তারপর একদিন
যেমন টোপ খেয়েছে, অমনি টেনে তুলতেই মাছ

আড়ায় উঠলো।” কখন বলিতেন, “তিনি খুব কাণখড়কে, সব

ভাব, সমাধি ও দর্শন সম্বন্ধে কয়েকটি কথা

শুনতে পান গো। যত ডেকেছ সব শুনেছেন। একদিন না একদিন দেখা দেবেনই দেবেন। অন্ততঃ মৃত্যু সময়েও দেখা দেবেন।” কাহাকেও বলিতেন—“সাকার কি নিরাকার যদি ঠিক করতে না পারিস তো এই বলে প্রার্থনা করিস্ যে, ‘হে ভগবান, তুমি সাকার কি নিরাকার আমি বুঝতে পারি না; তুমি যাহাই হও আমায় কৃপা কর, দেখা দাও’।” আবার কাহাকেও বলিতেন—“সত্য সত্যই ঈশ্বরের দেখা পাওয়া যায় রে, এই যেমন তোতে আমাতে এখন বসে কথা কইচি এইরকম তাঁকে দেখা যায়, তাঁর সঙ্গে কথা কহা যায়,—সত্য বলছি, মাইরি বলছি।”

আর এক কথা—চব্বিশঘণ্টা ‘ভাবমুখে’ থাকিলে ভাবুকতার এত বৃদ্ধি হয় যে, তাহার দ্বারা আর সংসারের অপর কোন কর্ম

চলে না, অথবা সে সংসারের ছোটখাট ব্যাপার গভীর ভাব-
প্রবণতার
সহিত ঠাকুরের
সকল বিষয়ে
দৃষ্টি রাখা
আর মনে রাখিতে পারে না—সর্বত্র আমরা
এইরূপই দেখিতে পাই। উহার দৃষ্টান্ত—ধর্ম-
জগতে তো কথাই নাই, বিজ্ঞান, রাজনীতি বা অন্য

সকল স্থানেও বিশেষ মনস্বী পুরুষগণের জীবনা-
লোচনায় দেখিতে পাওয়া যায়। দেখা যায়—তাঁহারা হয়ত নিজের
অঙ্গসংস্কার বা নিত্যব্যবহার্য জিনিস-পত্রের যথাযথ স্থানে রাখা
ইত্যাদি সামান্য বিষয়সকলে একেবারেই অপটু ছিলেন। ঠাকুরের
জীবনে কিন্তু দেখিতে পাই যে, অত অধিক ভাবপ্রবণতার ভিতরেও
তাঁহার ঐ প্রকার সামান্য বিষয়সকলেরও হুঁশ থাকিত! যখন
থাকিত না তখন নিজের দেহ বা জগৎ-সংসারের কোন

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

বস্তু বা ব্যক্তিরই হ'ল থাকিত না—যেমন সমাধিতে; আর যখন থাকিত, তখন সকল বিষয়েরই থাকিত! ইহা কম আশ্চর্যের বিষয় নহে। এখানে দুই-একটি মাত্র ঐরূপ দৃষ্টান্তেরই আমরা উল্লেখ করিব।

একদিন ঠাকুর দক্ষিণেশ্বর হইতে বলরাম বাবুর বাটী গমন করিতেছেন—সঙ্গে নিজ ভ্রাতৃপুত্র রামলাল ও শ্রীযুত যোগানন্দ

স্বামী যাইতেছেন। সকলে গাড়ীতে উঠিলেন। গাড়ী
ঐ বিষয়ে
দৃষ্টান্ত
ছাড়িয়া বাগানের 'গেট' পর্যন্ত আসিয়াছে মাত্র,

ঠাকুর শ্রীযুত যোগানন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

“কিরে, নাইবার কাপড় গামছা এনেছিস তো?” তখন প্রাতঃকাল।

শ্রীযুত যোগেন—না মশাই, গামছা এনেছি, কাপড়খানা
আনতে ভুল হয়েছে। তা তারা (বলরাম বাবু) আপনার জন্ত
একখানা নূতন কাপড় দেখে-শুনে দেবে এখন।

ঠাকুর—ও কি তোর কথা? লোকে বলবে, কোথা থেকে
একটা হাবাতে এসেছে। তাদের কষ্ট হবে, আতান্তরে পড়বে—
যা, গাড়ী থামিয়ে নেবে গিয়ে নিয়ে আয়।

কাজেই যোগীন স্বামীজি তদ্রূপ করিলেন।

ঠাকুর বলিতেন—ভাল লোক, লক্ষ্মীমন্ত লোক বাড়ীতে
এলে সকল বিষয়ে কেমন স্মসার হয়ে যায়, কাকেও কিছুতে বেগ
পেতে হয় না। আর হাবাতে হতচ্ছাড়াগুলো এলে সকল
বিষয়ে বেগ পেতে হয়; যে দিন ঘরে কিছু নেই, তার জন্ত
গেরস্থকে বিশেষ কষ্ট পেতে হবে; ঠিক সেই দিনেই সে এসে
উপস্থিত হয়।

ভাব, সমাধি ও দর্শন সম্বন্ধে কয়েকটি কথা

শ্রীযুত প্রতাপ হাজরা নামক এক ব্যক্তি ঠাকুরের সময়ে দক্ষিণেশ্বরে অনেককাল সাধুভাবে কাটাইতেন। আমরা সকলে

ঐ বিষয়ে
২য় দৃষ্টান্ত
ইহাকে হাজরা মহাশয় বলিয়া ডাকিতাম। ইনিও
মধ্যে মধ্যে ঠাকুরের কলিকাতার ভক্তদিগের নিকট
আগমনকালে তাঁহার সঙ্গে আসিতেন। একবার

ঐরূপে আসিয়া প্রত্যাগমনকালে নিজের গামছাখানি ভুলিয়া
কলিকাতায় ফেলিয়া যান। দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইয়া ঐ কথা
জানিতে পারিয়া ঠাকুর তাঁহাকে বলিলেন—“ভগবানের নামে
আমার পরণের কাপড়ের ছঁশ থাকে না, কিন্তু আমি তো
একদিনও নিজের গামছা বা বেটুয়া কলিকাতায় ভুলিয়া আসি
না, আর তোর একটু জপ করে এত ভুল !”

ঐ বিষয়ে ৩য়
দৃষ্টান্ত—
শ্রীশ্রীমার প্রতি
উপদেশ
শ্রীশ্রীমাকে ঠাকুর শিখাইয়াছিলেন—“গাড়ীতে বা নৌকায়
যাবার সময় আগে গিয়ে উঠবে, আর নামবার
সময় কোনও জিনিসটা নিতে ভুল হয়েছে কি না
দেখে-শুনে সকলের শেষে নামবে।” ঠাকুরের
অতি সামান্য বিষয়ে এত নজর ছিল।

ঐ বিষয়ে
শেষ কথা
এইরূপে ‘ভাবমুখে’ নিরন্তর থাকিয়াও ঠাকুরের আবশ্যকীয়
সকল বিষয়ের ছঁশ থাকিত ; যে জিনিসটি যেখানে রাখিতেন
তাহা সর্বদা সেইখানেই রাখিতেন, নিজের
কাপড়-চোপড় বেটুয়া প্রভৃতি সকল নিত্য ব্যবহার্য্য-
দ্রব্যের নিজে খোঁজ রাখিতেন, কোথাও যাইবার
আসিবার সময় আবশ্যকীয় সকল দ্রব্যাদি আনিতে ভুল হইয়াছে
কি না সন্ধান লইতেন এবং ভক্তদিগের মানসিক ভাবসমূহের

শ্রী শ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

যেমন পুঙ্খানুপুঙ্খ সন্ধান রাখিতেন, তেমনি তাহাদের সংসারের সকল বিষয়ের সন্ধান রাখিয়া কিসে তাহাদের বাহ্যিক সকল বিষয়ও সাধনার অনুকূল হইতে পারে তদ্বিষয়ে নিরন্তর চিন্তা করিতেন।

ঠাকুরের কথা অনুধাবন করিলে বুঝা যায়, তিনি যেন সর্বপ্রকার ভাবের মূর্তিমান সমষ্টি ছিলেন। ভাবরাজ্যের অত বড়

ঠাকুর ভাব-
রাজ্যের মূর্তিমান
রাজা

রাজা মানবজগতে আর কখনও দেখা যায় নাই।
ভাবময় ঠাকুর 'ভাবমুখে' অবস্থান করিয়া নিবি্বকল্প
অদ্বৈতভাব হইতে সবিকল্প সকল প্রকার ভাবের

পূর্ণ প্রকাশ নিজে দেখাইয়া সকল শ্রেণীর ভক্তদিগকে স্ব স্ব
পথের ও গন্তব্য স্থলের সংবাদ দিয়া অঙ্ককারে অপূর্ব জ্যোতিঃ,
নিরাশায় অদৃষ্টপূর্ব আশা এবং সংসারের নিদারুণ দুঃখকষ্টের
ভিতর নিরুপম শান্তি আনিয়া দিতেন। ঠাকুর যে সকলের কি
ভরসার স্থল ছিলেন তাহা বলিয়া বুঝান দায়। মনোরাজ্যে—

মানবমনের
উপর তাহার
অপূর্ব আধি-
পত্য। স্বামী
বিবেকানন্দের
ঐ বিবরণক
কথা

তাহার যে কি প্রবল প্রতাপ দেখিয়াছি তাহা বলা
অসম্ভব। স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন—'মনের
বাহিরের জড়-শক্তিসকলকে কোন উপায়ে আয়ত্ত
করে কোন একটা অদ্ভুত ব্যাপার (miracle)
দেখান বড় বেশী কথা নয়—কিন্তু এই যে পাগলা
বামুন লোকের মনগুলোকে কাদার তালের মত
হাতে নিয়ে ভাঙত, পিটত, গড়ত, স্পর্শমাত্রেই নূতন ছাঁচে
ফেলে নূতন ভাবে পূর্ণ করত, এর বাড়া আশ্চর্য্য ব্যাপার
(miracle) আমি আর কিছুই দেখি না!'

তৃতীয় অধ্যায়

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের গুরুভাব

আশ্চর্য্যবৎ পশুতি কশ্চিদেন-

মাশ্চর্য্যবদন্তি তথৈব চাশ্চঃ ॥

আশ্চর্য্যবচৈনমশ্চঃ শৃণোতি

শ্রদ্ধাপোনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ ॥

গীতা—২।২৯

ঠাকুরকে যাঁহারা ছ'চারবার মাত্র দেখিয়াছেন অথবা যাঁহারা তাঁহার সহিত বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ হন নাই, উপর উপর দেখিয়াছেন মাত্র, তাঁহারা গুরুভাবে ভক্তদিগের সহিত ঠাকুরের লীলার কথা কাহারও মুখে শুনিতে পাইলে একেবারে অবাক হইয়া থাকেন ! ভাবেন, 'লোকটা সম্পূর্ণ মিথ্যা কথাগুলো ঠাকুর 'গুরু' বলছে।' আবার যখন দেখেন অনেকে ঐ ভাবের 'বাবা' বা কথা বলিতেছে তখনও মনে করেন, "এরা সব 'কর্তা' বলিয়া একটা মতলব করে দল পাکیয়েচে, আর শ্রীরাম-সম্বোধিত কৃষ্ণকে ঠাকুর করে তুলেচে—তিন শ' তেত্রিশ হইলে বিরক্ত কোটার ওপর আবার একটা বাড়াতে চলেছে ! হইতেন। তবে কেন রে বাপু, অতগুলো ঠাকুরেও কি তোদের গুরুভাব শানে না? যাকে ইচ্ছা, যতগুলো ইচ্ছা, ওরি ঠাহাতে কল্পে সম্ভবে ? শানে না—আবার একটা বাড়ান কেন? কি আশ্চর্য্য !

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

এরা একবার ভাবেও না গা যে, মিথ্যা কথাগুলো ধরা পড়লে অমন পবিত্র লোকটার উপরে লোকের ভক্তি একেবারে চটে যাবে! আমরাও তো তাঁকে দেখেছি!—সকলের কাছে নীচ, নম্রভাব— একেবারে যেন মাটি, যেন সকলের চাইতে ছোট—এতটুকু অহঙ্কার নেই! তারপর একথা তো তোরাও বলিস্, আর আমরাও দেখেছি যে, ‘গুরু’ কি ‘বাবা’ কি ‘কর্তা’ বলে তাঁকে কেউ ডাকলে তিনি একেবারে সহিতেই পারতেন না; বলে উঠতেন, ‘ঈশ্বরই একমাত্র গুরু, পিতা ও কর্তা—আমি হীনের হীন, দাসের দাস, তোমার গায়ের একগাছি ছোট রোমের সমান—একগাছি বড়র সমানও নই!’—বলেই হয়ত আবার তার পায়ের ধুলো তুলে নিজের মাথায় দিতেন! এমন দীনভাব কোথাও কেউ কি দেখেছে? আর সেই লোককে কিনা এরা ‘গুরু’ ‘ঠাকুর’,—যা নয় তাই বলচে, যা নয় তাই করচে!”

এইরূপ অনেক বাদামুবাদ চলা অসম্ভব নহে বলিয়াই আমরা ঠাকুরের গুরুভাব-সম্বন্ধে যাহা দেখিয়াছি এবং শুনিয়াছি তাহার

কিছু বলিতে প্রবৃত্ত হইলাম। কারণ বাস্তবিকই

সর্বভূতে
নারায়ণ-বুদ্ধি
স্থির থাকায়
ঠাকুরের দাস-
ভাব সাধারণ

ঠাকুর যখন সাধারণ ভাবে থাকিতেন, তখন আত্মক-

স্বপর্য্যস্ত সর্বভূতে ঠিক ঠিক নারায়ণ-বুদ্ধি স্থির

রাখিয়া মানুষের তো কথাই নাই, সকল প্রাণীরই

‘দাস আমি’ এই ভাব লইয়া থাকিতেন; বাস্তবিকই

তখন তিনি আপনাকে হীনের হীন, দীনের দীন জ্ঞানে সকলের

পদধূলি গ্রহণ করিতেন এবং বাস্তবিকই সে সময় তিনি ‘গুরু’

‘কর্তা’ বা ‘পিতা’ বলিয়া সম্বোধিত হইলে সহিতে পারিতেন না।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের গুরুভাব

কিন্তু সাধারণ ভাবে অবস্থানের সময় ঐরূপ করিলেও ঠাকুরের গুরুভাবের অপূর্ব লীলার কথা কেমন করিয়া অস্বীকার করি? সে অদৃষ্টপূর্ব দিব্যভাবাবেশে যখন তিনি যন্ত্রস্বরূপ হইয়া কাহাকেও

কিন্তু দিব্য-
ভাবাবেশে
তাঁহাতে গুরু-
ভাবের লীলা
নিত্য দেখা
যাইত। ঠাকু-
রের তখনকার
ব্যবহারে ভক্ত-
দিগের কি মনে
হইত

স্পর্শমাত্রেই সমাধি, গভীর ধ্যান বা ভগবদানন্দের
অভূতপূর্ব নেশার ঝাঁকে^১ নিমগ্ন করিতেন, অথবা
কি এক আধ্যাত্মিক শক্তিবলে তাহার মনের
তমোগুণ বা মলিনতা এতটা টানিয়া লইতেন যে,
সে তৎক্ষণাৎ পূর্বে যে রূপ কখনও অনুভব করে
নাই, এ প্রকার একটা মনের একাগ্রতা, পবিত্রতা
ও আনন্দ লাভ করিত এবং আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান
করিয়া ঠাকুরের চরণতলে চিরকালের নিমিত্ত

আত্মবিক্রয় করিত—তখন তাঁহাকে দেখিলেই মনে হইত এ
ঠাকুর পূর্বের সেই দীনের দীন ঠাকুর নহেন; ইহাতে কি একটা
ঐশ্বরিক শক্তি স্বেচ্ছায় বা লীলায় প্রকটিত হইয়া ইহাকে আত্মহারা
করিয়া ঐরূপ করাইতেছে; ইনি বাস্তবিকই অজ্ঞানতিমিরাক্র,
ত্রিতাপে তাপিত, ভবরোগগ্রস্ত অসহায় মানবের গুরু, জ্ঞাতা এবং
শ্রীভগবানের পরম পদের দর্শয়িতা! ভক্তেরা ঠাকুরের ঐ অবস্থাকে
লক্ষ্য করিয়াই গুরু, কৃপাময়, ভগবান্ প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার
করিয়া থাকেন। আপাতবিরুদ্ধ বলিয়া বোধ হইলেও যথার্থ

১ বাস্তবিকই তখন অধিক পরিমাণে সিদ্ধি থাকিলে যেমন নেশা হয়, তেমনি
একটা নেশার ঘোর উপস্থিত হইত। কাহারও কাহারও পা-ও টলিতে দেখিরাছি;
ঠাকুরের নিজের তো কথাই ছিল না। ঐরূপ নেশার ঝাঁকে পা এমন টলিত যে,
আমাদের কাহাকেও ধরিয়া তখন চলিতে হইত। লোকে মনে করিত, বিপরীত
নেশা করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

দীনভাব এবং এই দিব্য ঐশ্বরিক গুরুভাব যে একত্রে একজনে অবস্থান করিতে পারে, তাহা আমরা বর্তমান যুগে শ্রীভগবান রামকৃষ্ণে যথার্থই দেখিয়াছি এবং দেখিয়াছি বলিয়াই উহারা কেমনে একত্রে একই মনে থাকে সে বিষয়ে যাহা বুঝিয়াছি তাহাই এখন পাঠককে উপহার দিতে চেষ্টা করিতেছি। ঐরূপ চেষ্টা করিলেও যতটুকু বুঝিয়াছি ততটুকুও ঠিক ঠিক বুঝাইতে পারিব কি না জানি না; আর সম্যক বুঝা বা বুঝান লেখক ও পাঠক উভয়েরই সাধ্যাতীত; কারণ ভাবমুখে অবস্থিত ঠাকুরের ভাবের ইয়ত্তা নাই। ঠাকুর বলিতেন, “শ্রীভগবানের ‘ইতি’ নাই।” আমাদের প্রত্যক্ষ, এ লোকোত্তর পুরুষেরও তদ্রূপ ভাবের ‘ইতি’ নাই।

সচরাচর লোকে ঠাকুর ‘ভাবমুখে’ থাকিতেন শুনিলেই ভাবিয়া বসে যে, তিনি জ্ঞানী ছিলেন না। ভগবদগুরাগ ও বিরহে মনে যে সুখদুঃখাদি ভাব আসিয়া উপস্থিত হইয়া লইয়া সদা সর্বক্ষণ থাকিতেন। কিন্তু সাধারণের বিশ্বাস—ঠাকুর জ্ঞানী ছিলেন না। ‘ভাবমুখে থাকা’ কখনও কিরূপে সম্ভবে বুঝিলে এ কথা আর বলা চলে না।

‘ভাবমুখে’ থাকাটি যে কি ব্যাপার বা কিরূপ অবস্থায় উহা সম্ভব, তাহা যদি আমরা বুঝিতে পারি, তবে বর্তমান বিষয়টি বুঝিতে পারিব; সেজন্য ‘ভাবমুখে থাকা’ অবস্থাটির সংক্ষেপ আলোচনা এখানে একবার আর এক প্রকারে করিয়া লওয়া যাক। পাঠক মনে মনে ভাবিয়া লউন—তিন দিনের সাধনে ঠাকুরের নির্বিকল্প সমাধি হইল।

প্র.—নির্বিকল্প সমাধিটি কি ?

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের গুরুভাব

উ—মনকে একেবারে সংকল্পবিকল্পরহিত অবস্থায় আনয়ন করা ।

প্র—সংকল্প-বিকল্প কাহাকে বলে ?

উ—বাহ্য জগতের রূপরসাদ বিষয়সকলের জ্ঞান বা অনুভব, সুখদুঃখাদি ভাব, কল্পনা, বিচার, অনুমান প্রভৃতি মানসিক চেষ্টা এবং ইচ্ছা বা ‘এটা করিব’, ‘ওটা বুঝিব’, ‘এটা ভোগ করিব’, ‘ওটা ত্যাগ করিব’ ইত্যাদি মনের সমস্ত বৃত্তিকে ।

প্র—বৃত্তিসকল কোন্ জিনিসটা থাকিলে তবে উঠিতে পারে ?

উ—‘আমি’ ‘আমি’ এই জ্ঞান বা বোধ। ‘আমি’-বোধ যদি চলিয়া যায় বা কিছুক্ষণের জন্য একেবারে বন্ধ হইয়া যায়, তবে সে সময়ের মত কোনও বৃত্তিই আর মনে খেলা বা রাজত্ব করিতে পারে না ।

‘আমি’-বোধ-
শ্রয়ে মানসিক
বৃত্তিসমূহের
উদয়। উহার
আংশিক
লোপে সবিকল্প
ও পূর্ণ লোপে
নিষ্কিকল্প
সমাধি হয় ।
সমাধি, মূর্ছা
ও স্বপ্তির
প্রভেদ

প্র—মূর্ছা বা গভীর নিদ্রাকালেও তো ‘আমি’-
বোধ থাকে না—তবে নিষ্কিকল্প সমাধিটা ঐরূপ
একটা কিছু ?

উ—না; মূর্ছা বা স্বপ্তিতে ‘আমি’-বোধ
ভিতরে ভিতরে থাকে, তবে মস্তিষ্করূপ (brain)
যে যন্ত্রটার সহায়ে মন ‘আমি’ ‘আমি’ করে সেটা
কিছুক্ষণের জন্য কতকটা জড়ভাবাপন্ন হয় বা চুপ
করিয়া থাকে; এইমাত্র—ভিতরে বৃত্তিসমূহ গজ্গজ
করিতে থাকে, ঠাকুর যেমন দৃষ্টান্ত দিতেন, ‘পায়রাগুলো মটর
খেয়ে গলা ফুলিয়ে বসে আছে বা বক্-বকম্ করে আওয়াজ
করচে—তুমি মনে কর্চ তাদের গলার ভিতরে কিছুই নাই—কিন্তু
যদি গলায় হাত দিয়ে দেখ তো দেখবে মটর গজ্গজ করচে !’

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

প্র—মূর্ছা বা স্তম্ভিত্তে যে 'আমি'-বোধটা ঐরূপে থাকে তা বুঝিব কিরূপে ?

উ—ফল দেখিয়া ; যথা—ঐ সকল সময়েও হৃদয়ের স্পন্দন, হাতের নাড়ি, রক্তসঞ্চালন প্রভৃতি বন্ধ হয় না—ঐ সকল শারীরিক ক্রিয়াও 'আমি'-বোধটাকে আশ্রয় করিয়া হয় ; দ্বিতীয় কথা, মূর্ছা ও স্তম্ভিত্তির বাহ্যিক লক্ষণ কতকটা সমাধির মত হইলেও ঐ সকল অবস্থা হইতে মানুষ যখন আবার সাধারণ বা জাগ্রৎ অবস্থায় আসে, তখন তাহার মনে জ্ঞান ও আনন্দের মাত্রা পূর্বের ন্যায়ই থাকে, কিছুমাত্র বাড়ে বা কমে না—কামুকের যেমন কাম তেমনি থাকে, ক্রোধীর যেমন ক্রোধ তেমনি থাকে, লোভীর লোভ সমান থাকে ইত্যাদি। নির্বিকল্প সমাধির অবস্থা লাভ হইলে কিন্তু ঐ সকল বৃত্তি আর মাথা তুলিতে পারে না ; অপূর্ব জ্ঞান ও অসীম আনন্দ আসিয়া উপস্থিত হয় এবং জগৎকারণ ভগবানের সাক্ষাৎদর্শনে মনে আর পরকাল আছে কি না, ভগবান্ আছে কি না—এ সকল সংশয়-সন্দেহ উঠে না।

প্র—আচ্ছা বুঝিলাম, ঠাকুরের নির্বিকল্প সমাধিতে কিছুক্ষণের জন্য 'আমি'-বোধের একেবারে লয় হইল ; তাহার পর ?

উ—তাহার পর ঐরূপে 'আমি'-বোধটার লোপ হইয়া কারণরূপিণী শ্রীশ্রীজগন্মাতার কিছুক্ষণের জন্য সাক্ষাৎ দর্শনে ঠাকুর তৃপ্ত না হইয়া সদা-সর্বক্ষণ ঐ অবস্থায় থাকিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের গুরুভাব

প্র—সে চেষ্টার ফলে ঠাকুরের মনের কিরূপ অবস্থা হইল এবং কিরূপ লক্ষণই বা শরীরে প্রকাশিত হইল ?

উ—কখন ‘আমি’-বোধের লোপ হইয়া শরীরে মৃতব্যক্তির লক্ষণসকল প্রকাশিত হইয়া ভিতরে জগদম্বার পূর্ণ বাধামাত্রশূন্য

ঠাকুরের ছয় মাস নির্বিকল্প সমাধিতে থাকিবার কালের দর্শন ও অনুভব

সাক্ষাৎ দর্শন—আবার কখন অত্যল্পমাত্র ‘আমি’-বোধ উদ্ভিত হইয়া শরীরে জীবিতের লক্ষণ একটু-আধটু প্রকাশ পাওয়া ও সত্ত্বগুণের অতিশয় আধিক্যে শুদ্ধ স্বচ্ছ পবিত্র মন-রূপ ব্যবধান বা পর্দার ভিতর দিয়া শ্রীশ্রীজগদম্বার কিঞ্চিৎ বাধায়ুক্ত

দর্শন—এইরূপে কখন ‘আমি’-বোধের লোপ, মনের বৃত্তিসকলের একেবারে লয় ও শ্রীশ্রীজগদম্বার পূর্ণ দর্শন ও কখন ‘আমি’-বোধের একটু উদয়, মনের বৃত্তিসকলের ঈষৎ প্রকাশ ও সঙ্গে সঙ্গে শ্রীশ্রীজগদম্বার পূর্ণ দর্শন ঈষৎ আবরিত হওয়া। এইরূপ বার বার হইতে লাগিল।

প্র—কতদিন ধরিয়া ঠাকুর ঐরূপ চেষ্টা করেন ?

উ—নিরন্তর ছয়মাস কাল ধরিয়া।

প্র—বল কি ? তবে তাঁহার শরীর রহিল কিরূপে ? কারণ

‘আমি’-বোধের সম্পূর্ণ লোপে ঐ কালে তাঁহার শরীর রহিল কিরূপে

ছয়মাস না খাইলে তো আর মানবদেহ থাকিতে পারে না এবং তোমরা তো বল যতটা শরীরবোধ আসিলে আহারাদি কার্য করা চলে, ঠাকুরের ঐকালে মাঝে মাঝে ‘আমি’-বোধের উদয় হইলেও ততটা কখনই আসে নাই।

উ—সত্যই ঠাকুরের শরীর থাকিত না এবং ‘শরীরটা কিছুকাল

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

থাকুক' এরূপ ইচ্ছার লেশমাত্রও তখন ঠাকুরের মনে ছিল না ; তবে তাঁহার শরীরটা যে ছিল সে কেবল জগদম্বা ঠাকুরের শরীরটার সহায়ে তাঁহার অদ্ভুত আধ্যাত্মিক শক্তির বিকাশ দেখাইয়া বহুজন-কল্যাণ সাধিত করিবেন বলিয়া ।

প্র—তা ত বটে, কিন্তু ঐ ছয়মাসকাল জগদম্বা নিজে মূর্ত্তিপরিগ্রহ করিয়া আসিয়া কি ঠাকুরকে জোর করিয়া আহার করাইয়া দিতেন ?

উ—কতকটা সেইরূপই বটে ; কারণ ঐ সময়ে এক জন সাধু কোথা হইতে আপনা আপনি আসিয়া জ্বোটেন, ঠাকুরের

ঐরূপ মৃতকল্প অবস্থা যে যোগসাধনা বা শ্রীভগ-
বানের সহিত একত্বানুভবের ফলে তাহা সম্যক
বুঝেন এবং ঐ ছয়মাস কাল দক্ষিণেশ্বর কালী-
বাণীতে থাকিয়া সময়ে সময়ে ঠাকুরের শ্রীঅঙ্গে
আঘাত পর্য্যন্ত করিয়া একটু আধটু ছঁশ আনিতে
নিত্য চেষ্টা করিতেন, আর একটু ছঁশ আসিতেছে
দেখিলেই দুই-এক গ্রাস যাহা পারিতেন খাওয়াইয়া
দিতেন । একেবারে অপরিচিত জড়প্রায় মৃতকল্প একটি
লোককে এইরূপে বাঁচাইয়া রাখিতে সাধুটির এত আগ্রহ, এতটা
মাথাব্যথা কেন হইয়াছিল জানি না, তবে ঐরূপ ঘটনাবলীকেই
আমরা ভগবদিচ্ছায় সাধিত বলিয়া থাকি । অতএব শ্রীশ্রীজগ-
দম্বার সাক্ষাৎ ইচ্ছা ও শক্তিতেই যে ঐ অসম্ভব সম্ভব হইয়া
ঠাকুরের শরীরটা রক্ষা পাইয়াছিল ইহা ছাড়া আর কি
বলিব ?

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের গুরুভাব

প্র—আচ্ছা বুঝিলাম ; তাহার পর ?

উ—তাহার পর শ্রীশ্রীজগদম্বা বা শ্রীভগবান বা যে বিরাট-

শ্রীশ্রীজগদম্বার চৈতন্য ও বিরাট-শক্তি জগদ্রূপে প্রকাশিত

আদেশ—‘ভাব- আছেন এবং জড় চেতন সকলের মধ্যে ওতপ্রোত-
মুখে থাক্’

ভাবে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আপাতবিভিন্ন নামরূপে
অবস্থান করিতেছেন তিনি ঠাকুরকে আদেশ করিলেন—‘ভাবমুখে
থাক্ !’

প্র—সেটা আবার কি ?

উ—বলিতেছি, কিন্তু ঠাকুরের ঐ সময়কার কথা বুঝিতে
হইলে কল্পনাসহায়ে যতদূর সম্ভব ঠাকুরের ঐ সময়ের অবস্থাটা

একমেবা-
দ্বিতীয়-বস্তুতে
নিগূর্ণ ও
সগুণভাবে
স্বগত-ভেদ
এবং জগদ্ব্যাপী
বিরাট আমিত্ব
বর্তমান। ঐ
বিরাট আমিত্বই
ঈশ্বর বা
শ্রীশ্রীজগদম্বার
আমিত্ব এবং
উহার দ্বারাই
জগদ্ব্যাপার
নিপ্পন্ন হয়

একবার ভাবিয়া লওয়া আবশ্যিক। পূর্বে বলিয়াছি,
তখন ঠাকুরের কখন ‘আমি’-জ্ঞানের লোপ এবং
কখন উহার ঈশ্বর প্রকাশ হইতেছিল। যখন
‘আমি’-বোধটার ঐরূপ ঈশ্বর প্রকাশ হইতেছিল
তখনও ঠাকুরের নিকট জগৎটা, আমরা যেমন
দেখি তেমন দেখাইতেছিল না। দেখাইতেছিল
যেন একটা বিরাট মনে নানা ভাবতরঙ্গ উঠিতেছে,
ভাসিতেছে, ক্রীড়া করিতেছে, আবার লয় হইতেছে !
অপর সকলের তো কথাই নাই, ঠাকুরের নিজের
শরীরটা, মনটা ও আমিত্ববোধটাও ঐ বিরাট মনের
ভিতরের একটা তরঙ্গ বলিয়া বোধ হইতেছিল !

পাশ্চাত্য জড়বাদী পণ্ডিতমূর্খের দল যে জগৎচৈতন্য
ও শক্তিকে নিজের বুদ্ধি ও বুদ্ধিপ্রসূত যন্ত্রাদি সহায়ে মাপিতে

শ্রী শ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

যাইয়া বলিয়া বসে 'ওটা এক হলেও জড়', ঠাকুর এই অবস্থায় পৌছিয়া তাঁহারই সাক্ষাৎ স্বরূপ দর্শন বা অনুভব করিলেন— জীবন্ত, জাগ্রত, একমেবাদ্বিতীয়ম্, ইচ্ছা ও ক্রিয়ামাত্রেরই প্রসূতি অনন্ত রূপাময়ী জগজ্জননী! আর দেখিলেন—সেই একমেবাদ্বিতীয়ম্ নিগুণ ও সগুণ ভাবে আপনাতে আপনি বিভক্ত থাকায়— ইহাকেই শাস্ত্রে স্বগতভেদ বলিয়াছে—তাঁহাতে একটা আব্রহ্ম-স্বপ্নপর্যন্ত-ব্যাপী বিরাট আমিত্ব বিকশিত রহিয়াছে! শুধু তাহাই নহে, সেই বিরাট 'আমিটা' থাকাতেই বিরাট মনে অনন্ত ভাবতরঙ্গ উঠিতেছে আর সেই ভাবতরঙ্গই স্বল্লাধিক পরিমাণে খণ্ড খণ্ড ভাবে দেখিতে পাইয়া মানবের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 'আমি'গুলো উহাকেই বাহিরের জগৎ ও বহির্জগতের ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ বলিয়া ধরিতেছে ও বলা-কহা ইত্যাদি করিতেছে! ঠাকুর দেখিলেন বড় 'আমি'টার শক্তিতেই মানবের ছোট 'আমি'গুলো রহিয়াছে ও স্ব-স্ব কার্য করিতেছে এবং বড় 'আমি'টাকে দেখিতে-ধরিতে পাইতেছে না বলিয়াই 'আমি'গুলো ভ্রমে পড়িয়া আপনাদিগকে স্বাধীন ইচ্ছা ও ক্রিয়াশক্তিমান মনে করিতেছে। এই দৃষ্টিহীনতাকেই শাস্ত্র অবিদ্যা ও অজ্ঞান বলেন।

নিগুণ ও সগুণের মধ্যস্থলে এইরূপে যে বিরাট 'আমিত্ব'টা বর্তমান, উহাই 'ভাবমুখ', কারণ উহা থাকাতেই বিরাট মনে অনন্ত ভাবের স্ফুরণ হইতেছে। এই বিরাট আমিই জগজ্জননীর আমিত্ব বা ঈশ্বরের আমিত্ব। এই বিরাট আমিত্বের স্বরূপ বর্ণনা করিতে যাইয়াই গোড়ীয় সকল প্রকার বৈষ্ণবাচার্য্যগণ বলিয়াছেন— অচিন্ত্যভেদাভেদ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের গুরুভাব

ভাবই উহাকে
আশ্রয় করিয়া
উদিত
হইতেছে

স্বরূপ জ্যোতির্ঘনমূর্তি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ । ঠাকুরের
আমিত্ব-জ্ঞানের যখন একেবারে লোপ হইতেছিল
তখন তিনি এই বিরাট আমিত্বের গণ্ডির পারে
অবস্থিত জগদম্বার নিগুণ ভাবে অবস্থান করিতে-
ছিলেন—তখন ঐ ‘বিরাট আমি’ ও তাহার অনন্তভাবতরঙ্গ, যাহাকে
আমরা জগৎ বলিতেছি, তাহার কিছুই অস্তিত্ব অনুভব
পূর্ণ নির্বিকল্প
এবং ঈষৎ
সবিকল্প বা
‘ভাবমুখ’ অবস্থায়
ঠাকুরের
অনুভব ও দর্শন

হইতেছিল না ; আর যখন ঠাকুরে ‘আমি’-জ্ঞানের
ঈষৎ উন্মেষ হইতেছিল তখন তিনি দেখিতে-
ছিলেন, শ্রীশ্রীজগদম্বার নিগুণ ভাবের সহিত সংযুক্ত
এই সগুণ বিরাট ‘আমি’ ও তদন্তর্গত ভাবতরঙ্গ-
সমূহ । অথবা নিগুণভাবে উঠিবামাত্র সঙ্গে সঙ্গে
ঠাকুরের অনুভবে ঐ একমেবাদ্বিতীয়মের ভিতর স্বগতভেদের
অস্তিত্বও লোপ হইতেছিল ; আর ঐ সগুণ বিরাট আমিত্বের
যখন বোধ করিতেছিলেন, তখন দেখিতেছিলেন—যিনি ব্রহ্ম তিনিই
শক্তি, যে নিগুণ সেই সগুণ, যে পুরুষ সেই প্রকৃতি, যে সাপ স্থির
ছিল সেই এখন চলিতেছে, অথবা যিনিই স্বরূপে নিগুণ তিনিই
আবার লীলায় সগুণ ! শ্রীশ্রীজগদম্বার এই নিগুণ-সগুণ উভয়
ভাবে জড়িত স্বরূপের পূর্ণ দর্শন পাইবার পর ঠাকুর আদেশ
পাইলেন ‘ভাবমুখে থাক’—অর্থাৎ আমিত্বের একেবারে লোপ
করিয়া নিগুণভাবে অবস্থান করিও না ; কিন্তু যাহা হইতে যত
প্রকার বিশ্বভাবের উৎপত্তি হইতেছে সেই বিরাট ‘আমিই’ তুমি,
তাঁহার ইচ্ছাই তোমার ইচ্ছা, তাঁহার কার্যই তোমার কার্য—
এই ভাবটি ঠিক ঠিক সর্বদা প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়া জীবনযাপন

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

কর ও লোককল্যাণসাধন কর! অতএব 'ভাবমুখে' থাকার

'ভাবমুখে
থাক'—কথার
অর্থ

অর্থই হইতেছে—মনে সর্বতোভাবে সকল সময়
সকল অবস্থায় দেখা, ধারণা বা বোধ করা যে
আমি সেই 'বড় আমি' বা 'পাকা আমি'। 'ভাব-
মুখ'-অবস্থায় পৌঁছিলে, আমি অমূকের সন্তান, অমূকের পিতা,
ব্রাহ্মণ বা শূদ্র ইত্যাদি সমস্ত কথা একেবারে মন হইতে ধুইয়া-
পুঁছিয়া যায় এবং 'আমি সেই বিশ্বব্যাপী আমি' এই কথাটি সর্বদা
মনে অনুভব হয়। ঠাকুর তাই আমাদের বার-বার শিক্ষা দিতেন—
“ওগো, অমূকের ছেলে আমি, অমূকের বাপ আমি, ব্রাহ্মণ আমি,
শূদ্র আমি, পণ্ডিত আমি, ধনী আমি—এ সব হচ্ছে কাঁচা আমি ;
ওতে বন্ধন নিয়ে আসে। ও সব ছেড়ে মনে করবে তাঁর
(ভগবানের) দাস আমি, তাঁর ভক্ত আমি, তাঁর সন্তান আমি,
তাঁর অংশ আমি। এই ভাবটি মনে পাকা করে রাখবে।”
অথবা বলিতেন, “ওরে, অদ্বৈতজ্ঞান আঁচলে বেঁধে যা ইচ্ছা তা
কর।”

পাঠক হয়ত বলিবেন, ঠাকুর কি তবে ঠিক ঠিক অদ্বৈতবাদী
ছিলেন না? শ্রীশ্রীজগদম্বার মধ্যে স্বগতভেদ স্বীকার করিয়া ঠাকুর
সাধকের যখন জগন্মাতার নিগুণ সগুণ দুই ভাবে অবস্থান
আধ্যাত্মিক দেখিতেন, তখন তো বলিতে হইবে তিনি আচার্য্য
উন্নতিতে বৈত, শঙ্করপ্রতিষ্ঠিত অদ্বৈতবাদ, যাহাতে জগতের
বিশিষ্টাদ্বৈত অস্তিত্বই স্বীকৃত হয় নাই, তাহা মানিতেন না?
ও অদ্বৈত ভাব তাহা নহে। ঠাকুর অদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও দ্বৈত
পর পর আসিয়া উপস্থিত হয় সকল ভাব বা মতই মানিতেন। তবে বলিতেন, ঐ তিন প্রকার মত

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের গুরুভাব

মানবমনের উন্নতির অবস্থানুযায়ী পর পর আসিয়া উপস্থিত হয়। এক অবস্থায় দ্বৈতভাব আসে—তখন অপর দুই ভাবই মিথ্যা বলিয়া বোধ হয়। ধর্মোন্নতির উচ্চতর সোপানে উঠিয়া অপর অবস্থায় বিশিষ্টাঈতবাদ আসে—তখন নিত্য নিগুণ বস্তু লীলায় সতত মগ্ন হইয়া রহিয়াছেন, এইরূপ বোধ হয়। তখন দ্বৈতবাদ তো মিথ্যা বোধ হয়ই, আবার অঈতবাদে যে সত্য নিহিত আছে তাহাও মনে উপলব্ধি হয় না। আর মানব যখন ধর্মোন্নতির শেষ সীমায় সাধনসহায়ে উপস্থিত হয় তখন শ্রীশ্রীজগদম্বার নিগুণরূপেরই কেবলমাত্র উপলব্ধি করিয়া তাঁহাতে অঈতভাবে অবস্থান করে। তখন আমি-তুমি, জীব-জগৎ, ভক্তি-মুক্তি, পাপ-পুণ্য, ধর্মাধর্ম—সব একাকার!

মহাজ্ঞানী এই প্রসঙ্গে ঠাকুরের দাস্যভাবের উজ্জ্বল নিদর্শন হনুমানের ঐ মহাজ্ঞানী হনুমানের ঐ বিষয়ের উপলব্ধিটি দৃষ্টান্ত-বিষয়ক কথা স্বরূপে বলিতেন। বলিতেন—শ্রীরামচন্দ্র কোন সময়ে নিজ দাস হনুমানকে জিজ্ঞাসা করেন, “তুমি আমায় কি ভাবে দেখ, বা ভাবনা ও পূজা কর?” হনুমান তদুত্তরে বলেন, “হে রাম, যখন আমি দেহবুদ্ধিতে থাকি অথবা আমি এই দেহটা এইরূপ অনুভব করি, তখন দেখি—তুমি প্রভু, আমি দাস; তুমি সেব্য, আমি সেবক; তুমি পূজ্য, আমি পূজক; যখন আমি মন বুদ্ধি ও আত্মাবিশিষ্ট জীবাত্মা বলিয়া আপনাকে বোধ করিতে থাকি, তখন দেখি—তুমি পূর্ণ, আমি অংশ; আর যখন আমি উপাধিমাত্র-রহিত শুদ্ধ আত্মা, সমাধিতে এই ভাব লইয়া থাকি, তখন দেখি—তুমিও যাহা, আমিও তাহা—তুমি আমি এক, কোনই ভেদ নাই।”

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

ঠাকুর বলিতেন, “যে ঠিক ঠিক অদ্বৈতবাদী সে চূপ হইয়া যায় ! অদ্বৈতবাদ বলবার বিষয় নয়। বলতে-কইতে গেলেই

অদ্বৈতভাব ছুটো এসে পড়ে, ভাবনা-কল্পনা যতক্ষণ ততক্ষণও চিন্তা, কল্পনা ও ভিতরে ছুটো—ততক্ষণও ঠিক অদ্বৈতজ্ঞান হয় বাক্যাতীত ; নাই। জগতে একমাত্র ব্রহ্মবস্তু বা শ্রীশ্রীজগদম্বার যতক্ষণ নিগূর্ণভাবই কখন উচ্ছিষ্ট হয় নাই।” অর্থাৎ, বলা-কহা আছে ততক্ষণ নিত্য মানবের মুখ দিয়া বাহির হয় নাই, অথবা মানব ও লীলা, ঈশ্বরের ভাষা দ্বারা উহা প্রকাশ করিতে পারে নাই। উভয় ভাব কারণ ঐ ভাব মানবের মন-বুদ্ধির অতীত ; বাক্যে লইয়া থাকিতেই হইবে তাহা কেমন করিয়া বলা বা বুঝান যাইবে ?

অদ্বৈতভাব সম্বন্ধে ঠাকুর সেজন্তু বার বার বলিতেন, “ওরে, ওটা শেষকালের কথা।” অতএব দেখা যাইতেছে ঠাকুর বলিতেন, “যতক্ষণ ‘আমি তুমি’ ‘বলা কহা’ প্রভৃতি রহিয়াছে ততক্ষণ নিগূর্ণ-সগুণ, নিত্য ও লীলা—তুই ভাবই কার্যো মানিতে হইবে। ততক্ষণ অদ্বৈতভাব মুখে বলিলেও কার্যো, ব্যবহারে তোমাকে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী থাকিতে হইবে। ঐ সম্বন্ধে ঠাকুর আরও কতই না দৃষ্টান্ত দিতেন ! বলিতেন—

“যেমন গানের অনুলোম-বিলোম—সা ঋ গা মা পা ধা নি
সা করিয়া সুর তুলিয়া আবার সা নি ধা পা মা গা ঋ সা—

করিয়া সুর নামান। সমাধিতে অদ্বৈত-বোধটা
ঐ বিষয়ে অনুভব করিয়া আবার নীচে নামিয়া ‘আমি’-
ঠাকুরের কয়েকটি বোধটা লইয়া থাকা।
দৃষ্টান্ত।

যথা—গানের “যেমন বেলটা হাতে লইয়া বিচার করা যে,

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের গুরুভাব

অনুলোম-
 খিলোম; বেল,
 খোড়, প্যাঞ্জের
 খোলা
 খোলা, বিচি, শাঁস—ইহার কোন্টা বেল। প্রথম
 খোলাটাকে আমার বলিয়া ফেলিয়া দিলাম, বিচি-
 গুলোকেও ঐরূপ করিলাম; আর শাঁসটুকু আলাদা
 করিয়া বলিলাম, এইটিই বেলের মার—এই
 আদং বেল। তারপর আবার বিচার আসিল যে, যাহারই
 শাঁস তাহারই খোলা ও বিচি—খোলা, বিচি ও শাঁস সব
 একত্র করিয়াই বেলটা; সেই রকম নিত্য ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ
 করিয়া তারপর বিচার—যে নিত্য সেই লীলায় জগৎ।

“যেমন খোড়খানার খোলা ছাড়াতে ছাড়াতে মাঝটায়
 পৌঁছলুম আর সেটাকেই মার ভাবলুম। তারপর বিচার এল—
 খোলেরই মাঝ, মাঝেরই খোল—তুই জড়িয়েই খোড়টা।

“যেমন প্যাঞ্জটা—খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে আর কিছুই থাকে
 না, সেইরকম কোন্টা ‘আমি’ বিচার করে দেখতে গিয়ে
 শরীরটা নয়, মনটা নয়, বুদ্ধিটা নয় করে ছাড়াতে ছাড়াতে গিয়ে
 দেখা যায় ‘আমি’ বলে একটা আলাদা কিছুই নাই—সবই
 ‘তিনি’ ‘তিনি’ ‘তিনি’ (ঈশ্বর); যেমন গঙ্গার ধানিকটা জল
 বেড়া দিয়ে ঘিরে বলা—এটা আমার গঙ্গা!”

যাক এখন ওসকল কথা, আমরা পূর্ব-কথার অনুসরণ করি।

ভাবমুখে থাকিয়া যখন বিশ্বব্যাপী আমিদের ঠিক ঠিক
 অনুভব হইত তখন ‘এক’ হইতে ‘বহু’র বিকাশ দেখিয়া ঠাকুর
 শ্রীশ্রীজগদম্বার নিগুণভাব হইতে কয়েক পদ নীচে
 ভাবমুখে
 নিগুণ হইতে
 কয়েকপদ
 বিজ্ঞা-মায়ায় রাজ্যে যে বিচরণ করিতেন, এ
 কথা আর বলিতে হইবে না। কিন্তু সে রাজ্যেও

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

নিম্নে অবস্থিত
ধাকিলেও ঐ
অবস্থায় অদ্বৈত
বস্তুর বিশেষ
অনুভব থাকে।
ঐ অবস্থায়
কিরূপ
অনুভব হয়—
ঠাকুরের
দৃষ্টান্ত

একের বিকাশ ও অনুভব এত অধিক যে, এই
ব্রহ্মাণ্ডে যে যাহা করিতেছে, ভাবিতেছে, বলিতেছে,
সে-সকলই আমি করিতেছি, ভাবিতেছি, বলিতেছি
বলিয়া ঠাকুরের ঠিক ঠিক মনে হইত! এই
অবস্থায় অল্প বা আভাসমাত্র অনুভবও অতি অদ্ভুত!
ঠাকুর বলিয়াছিলেন, একদিন ঘাসের উপর দিয়া
একজন চলিয়া যাইতেছে, আর তাঁহার বুকে বিষম
আঘাত লাগিতেছে!—যেন তাঁহার বুকের উপর

দিয়াই সে যাইতেছে! বাস্তবিকই তখন তাঁহার বুকে রক্ত জমিয়া
কাল দাগ হইয়া তিনি বেদনায় ছটফট করিয়াছিলেন।

ঐ অবস্থা হইতে মায়ার রাজ্যের আরও নিম্নস্তরে নামিয়া
যখন থাকিতেন, যখন ঠাকুরের মনে শ্রীশ্রীজগদম্বার দাস আমি,
ভক্ত আমি, সন্তান আমি বা অংশ আমি—এই
ভাবটি সর্বদা জাগরুক থাকিত। উহা হইতেও
নিম্নে অবিচা-মায়ার বা কাম ক্রোধ লোভ
মোহাদির রাজত্ব। সে রাজ্য ঠাকুর যত্পূর্বক
নিরন্তর অভ্যাসসহকারে ত্যাগ করায় তাঁহার মন
তথায় আর কখনও নামিত না বা শ্রীশ্রীজগদম্বা
তাঁহাকে নামিতে দিতেন না। ঠাকুর যেমন
বলিতেন, “যে মার উপর একান্ত নির্ভর করেছে,
মা তার পা বেতালে পড়তে দেন না।”

অতএব বুঝা যাইতেছে, নির্বিকল্প-সমাধিলাভের পর ঠাকুরের
ভিতরের ছোট আমি বা কাঁচা আমিটার একেবারে লোপ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের গুরুভাব

হইয়াছে। আর যে আমিত্বটুকু ছিল সেটি আপনাকে ‘বড় আমি’ বা ‘পাকা আমি’টার সঙ্গে চিরসংযুক্ত দেখিত—

ঠাকুরের ‘কাঁচা
আমি’টার এক-
কালে নাশ হইয়া
বিরাট ‘পাকা
আমি’তে
অনেককাল
অবস্থিতি। ঐ
অবস্থাতেই
তাঁহাতে গুরু-
ভাব প্রকাশ
পাইত। অতএব
দীনভাব ও
গুরুভাব
অবস্থানুসারে
এক ব্যক্তিতে
আসা অসম্ভব
নহে

কখন আপনাকে দেখিত সেই বিশ্বব্যাপী আমিটার
অঙ্গ বা অংশ, আবার কখন তাহার নিকট
নিকটতর নিকটতম দেশে উঠিয়া সেই বিশ্বব্যাপী
‘আমি’তে লীন হইয়া যাইত। এই পথেই
ঠাকুরের সকল মনের সকল ভাব আয়ত্তীভূত
হইত। কারণ ঐ ‘বড় আমি’কে আশ্রয় করিয়াই
জগতে সকলের মনের যত প্রকার ভাব উঠিতেছে।
ঠাকুর ঐ বিশ্বব্যাপী ‘আমি’কে আশ্রয় করিয়া
অনুক্ৰমণ থাকিতে পারিতেন বলিয়াই বিশ্বমানে যত
ভাবতরঙ্গ উঠিতেছে, সকলই ধরিতে ও বুঝিতে
সক্ষম হইতেন। ঐরূপ উচ্চাবস্থায় ‘ভগবানের অংশ
আমি’, ঠাকুরের এ ভাবটিও ক্রমশঃ লীন হইয়া
যাইত, এবং ‘বিশ্বব্যাপী আমি’ বা শ্রীশ্রীজগন্মাতার
আমিত্বই ঠাকুরের ভিতর দিয়া প্রকাশিত হইয়া নিগ্রহানুগ্রহ-সমর্থ
গুরুরূপে প্রতিভাত হইত! কাজেই ঠাকুরকে দেখিলে তখন আর
‘দীনের দীন’ বলিয়া বোধ হইত না। তখন ঠাকুরের চাল-চলন,
অপরের সহিত ব্যবহার প্রভৃতি সমস্ত ক্রিয়াকলাপই অগ্নি আকার
ধারণ করিত। তখন কল্পতরুর মত হইয়া তিনি ভক্তকে জিজ্ঞাসা
করিতেন, “তুই কি চাস্?”—যেন ভক্ত যাহা চাহেন তাহা তৎক্ষণাৎ
অমানুষী শক্তিবলে পূরণ করিতে বসিয়াছেন! দক্ষিণেশ্বরে
বিশেষ বিশেষ ভক্তদিগকে রূপা করিবার জন্য ঐরূপ ভাবাপন্ন

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

হইতে ঠাকুরকে আমরা নিত্য দেখিয়াছি ; আর দেখিয়াছি ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারীতে । সেদিন ঠাকুর ঐরূপ ভাবাপন্ন হইয়া তৎকালে উপস্থিত সকল ভক্তদিগকে স্পর্শ করিয়া তাহাদের ভিতর ধর্মশক্তি সঞ্চারিত বা সুপ্ত ধর্মভাবকে জাগ্রত করিয়া দেন । সে এক অপূর্ব কথা ! এখানে বসিলে মন্দ হইবে না ।

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী, পৌষ মাস । কিঞ্চিদধিক দুই সপ্তাহ হইল ভক্তেরা শ্রীযুত মহেন্দ্রলাল সরকার ডাক্তার মহাশয়ের গুরুভাবে পরামর্শানুসারে ঠাকুরকে কলিকাতার উত্তরে ঠাকুরের ইচ্ছা কাশীপুরে রাণী কাত্যায়নীর জামাতা গোপাল ও স্পর্শমাত্রে বাবুর বাগানবাটীতে আনিয়া রাখিয়াছেন । অপরে ধর্মশক্তি জাগ্রত করিয়া ডাক্তার বলিয়াছেন কলিকাতার বায়ু অপেক্ষা দিবার দৃষ্টান্ত— বাগান অঞ্চলের বায়ু নির্মল ও যতদূর সম্ভব নির্মল ১৮৮৬ খৃঃ বায়ুতে থাকিলে ঠাকুরের গলরোগের উপশম হইতে ১লা জানুয়ারীর যটনা পারে । বাগানে আসিবার কয়েক দিন পরেই

ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল দত্ত ঠাকুরকে দেখিতে আসেন এবং লাইকোপোডিয়ম (২০০শ) ঔষধ প্রয়োগ করেন । উহাতে গলরোগটার কিছু উপকারও বোধ হয় । ঠাকুর কিন্তু এখানে আসা অবধি বাটার দ্বিতল হইতে একদিন একবারও নীচের তলে নামেন নাই বা বাগানে বেড়াইয়া বেড়ান নাই । আজ শরীর অনেকটা ভাল থাকায় অপরাহ্নে বাগানে বেড়াইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন । কাজেই ভক্তদিগের আজ বিশেষ আনন্দ ।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের গুরুভাব

স্বামী বিবেকানন্দের তখন তীব্র বৈরাগ্য—সাংসারিক উন্নতি-কামনাসমূহ ত্যাগ করিয়া ঠাকুরের নিকটে বাস করিতেছেন ও তাঁহার দ্বারা উপদিষ্ট হইয়া শ্রীভগবানের দর্শনের জন্য নানা-প্রকার সাধন করিতেছেন। সমস্ত রাত্রি বৃক্ষতলে ধুনি বা অগ্নি জ্বালাইয়া ধ্যান, জপ, ভজন, পাঠ ইত্যাদিতেই থাকেন। অপর কয়েক জন ভক্তও, যথা—ছোট গোপাল, কালী (অভেদানন্দ) ইত্যাদি, আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি আনয়ন প্রভৃতি করিয়া তাঁহাকে ঐ বিষয়ে সাহায্য করেন এবং আপনারাও যথাসাধ্য ধ্যান-ভজন করেন। গৃহী ভক্তেরা বিষয়-কর্মাদিতে নিযুক্ত থাকায় সর্বদা ঠাকুরের নিকটে থাকিতে পারেন না; সুবিধা পাইলেই আসা যাওয়া করেন, এবং যাহারা ঠাকুরের সেবায় নিরন্তর ব্যাপৃত, তাঁহাদের আহাৰাদি সকল বিষয়ের বন্দোবস্ত করিয়া দেন ও কখন কখন এক-আধ দিন থাকিয়াও যান। আজ ইংরেজী বর্ষের প্রথম দিন বলিয়া ছুটি থাকায় অনেকেই কাশীপুরের বাগানে উপস্থিত হইয়াছেন।

অপরাত্ন বেলা ৩টা বাজিয়া গিয়াছে। ঠাকুর লালপেড়ে ধুতি, একটি পিরান, লালপাড় বসান একখানি মোটা চাদর, কানটাকা টুপি ও চটি জুতাটি পরিয়া স্বামী অদ্ভুতানন্দের সহিত উপর হইতে ধীরে ধীরে নীচে নামিলেন এবং নীচেকার হল ঘরটি দেখিয়া পশ্চিমের দরজা দিয়া বাগানের পথে বেড়াইতে চলিলেন। গৃহী ভক্তেরা কেহ কেহ ঠাকুর ঐরূপে বেড়াইতে যাইতেছেন দেখিতে পাইয়া মানন্দে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন। শ্রীযুত নরেন্দ্র (স্বামী বিবেকানন্দ) প্রমুখ বালক বা

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

যুবক ভক্তেরা তখন সমস্ত রাত্রি জাগরণে ক্লান্ত থাকায় হল ঘরের পাশে যে ছোট ঘরটি ছিল, তাহার ভিতর নিদ্রা ঘাইতেছেন। শ্রীযুত লাট (স্বামী অদ্ভুতানন্দ) তাঁহাদিগকে ঐরূপে ঘাইতে দেখিয়া ঠাকুরের সহিত স্বয়ং আর অধিক দূর যাওয়া অনাবশ্যক বুঝিয়া হল ঘরের সম্মুখের ক্ষুদ্র পুকুরিণীটির দক্ষিণ পাড় পর্যন্ত আসিয়াই ফিরিলেন এবং অপর একজন যুবক ভক্তকে ডাকিয়া লইয়া ঠাকুর উপরে যে ঘরটিতে থাকেন সেটি বাঁটপাট দিয়া পরিষ্কার করিতে ও ঠাকুরের বিছানা প্রভৃতি রৌদ্রে দিতে ব্যাপৃত হইলেন।

গৃহী ভক্তগণের ভিতর শ্রীযুত গিরিশের তখন প্রবল অনুরাগ। ঠাকুর কোনও সময়ে তাঁহার অদ্ভুত বিশ্বাসের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া অন্য ভক্তগণকে বলিয়াছিলেন, “গিরিশের পাঁচ সিকে পাঁচ আনা বিশ্বাস! ইহার পর লোকে ওর অবস্থা দেখে অবাক হবে।” বিশ্বাস-ভক্তির প্রবল প্রেরণায় গিরিশ তখন হইতে ঠাকুরকে সাক্ষাৎ ভগবান—জীবোদ্ধারের জন্ম রূপায় অবতীর্ণ বলিয়া অনুক্ষণ দেখিতেন এবং ঠাকুর তাঁহাকে নিষেধ করিলেও তাঁহার ঐ ধারণা সকলের নিকট প্রকাশে বলিয়া বেড়াইতেন। গিরিশও সেদিন বাগানে উপস্থিত আছেন এবং শ্রীযুত রাম প্রমুখ অন্য কয়েকটি গৃহী ভক্তের সহিত একটি আমগাছের তলায় বসিয়া কথোপকথন করিতেছেন।

ঠাকুর ভক্তগণ পরিবৃত হইয়া উদ্যানমধ্যস্থ প্রশস্ত পথটি দিয়া বাগানের গেটের দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে হইতে প্রায় মধ্যপথে আসিয়া পথের ধারে আমগাছের ছায়ায় শ্রীযুত রাম ও

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের গুরুভাব

শ্রীযুত গিরিশকে দেখিতে পাইলেন এবং গিরিশকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “গিরিশ, তুমি কি দেখেছ (আমার সম্বন্ধে) যে অত কথা (আমি অবতার ইত্যাদি) যাকে তাকে বলে বেড়াও ?”

সহসা ঐরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়াও গিরিশের বিশ্বাস টলিল না। তিনি সমস্তম্বে উঠিয়া রাস্তার উপরে আসিয়া ঠাকুরের পদতলে জাহ্নু পাতিয়া করজোড়ে উপবিষ্ট হইলেন এবং গদগদ কণ্ঠে বলিলেন, “ব্যাস বাল্মীকি ঠাহার কথা বলিয়া অন্ত করিতে পারেন নাই, আমি ঠাহার সম্বন্ধে অধিক আর কি বলিতে পারি !”

গিরিশের ঐরূপ অদ্ভুত বিশ্বাসের কথা শুনিয়া ঠাকুরের সৰ্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল এবং মন উচ্চ ভূমিতে উঠিয়া তিনি সমাধিস্থ হইলেন। গিরিশও তখন ঠাকুরের সেই দেবভাবে প্রদীপ্ত মুখমণ্ডল দেখিয়া উল্লাসে চীৎকার করিয়া ‘জয় রামকৃষ্ণ’ ‘জয় রামকৃষ্ণ’ বলিয়া বার বার পদধূলি গ্রহণ করিতে লাগিলেন।

ইতিমধ্যে ঠাকুর অর্দ্ধবাহুদশায় হাশ্রমুখে উপস্থিত সকলের দিকে চাহিয়া বলিলেন, “তোমাদের কি আর বলিব, তোমাদের সকলের চৈতন্য হোক !” ভক্তেরা সে অভয়বাণী শুনিয়া তখন আনন্দে জয় জয় রব করিয়া কেহ প্রণাম, কেহ পুষ্পবর্ষণ এবং কেহ বা আসিয়া ঠাহার পদস্পর্শ করিতে লাগিলেন। প্রথম ব্যক্তি পদস্পর্শ করিয়া দণ্ডায়মান হইবামাত্র ঠাকুর ঐরূপ অর্দ্ধবাহুবস্থায় তাহার বক্ষঃ স্পর্শ করিয়া নীচের দিক হইতে উপর-দিকে হস্ত সঞ্চালিত করিয়া বলিলেন, “চৈতন্য হোক !” দ্বিতীয় ব্যক্তি আসিয়া প্রণাম করিয়া উঠিবামাত্র তাহাকেও ঐরূপ

শ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

করিলেন! তৃতীয় ব্যক্তিকেও ঐরূপ! চতুর্থকেও ঐরূপ! এইরূপে সমাগত ভক্তদিগের সকলকে একে একে ঐরূপে স্পর্শ করিতে লাগিলেন। আর সে অদ্ভুত স্পর্শে প্রত্যেকের ভিতর অপূর্ব ভাবান্তর উপস্থিত হইয়া কেহ হাসিতে, কেহ কাঁদিতে, কেহ বা ধ্যান করিতে, আবার কেহ বা নিজে আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া অহেতুক-দয়ানিধি ঠাকুরের কৃপালাভ করিয়া ধন্য হইবার জগু অপর সকলকে চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিলেন! সে চীৎকার ও জয়রবে ত্যাগী ভক্তেরা কেহ বা নিদ্রা ত্যাগ করিয়া, কেহ বা হাতের কাজ ফেলিয়া ছুটিয়া আসিয়া দেখেন, উদ্যানপথ-মধ্যে সকলে ঠাকুরকে ঘিরিয়া ঐরূপ পাগলের গায় ব্যবহার করিতেছেন এবং দেখিয়াই বুঝিলেন, দক্ষিণেশ্বরে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির প্রতি কৃপায় ঠাকুরের দিব্য-ভাবাবেশে যে অদৃষ্টপূর্ব লীলার অভিনয় হইত তাহারই অচ্যু এখানে সকলের প্রতি কৃপায় সকলকে লইয়া প্রকাশ! ত্যাগী ভক্তেরা আসিতে আসিতেই ঠাকুরের সে অবস্থা পরিবর্তিত হইয়া আবার সাধারণ সহজ ভাব উপস্থিত হইল। পরে গৃহী ভক্তদিগের অনেককে ঐ সময়ে কিরূপ অনুভব হইয়াছিল তদ্বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিয়া জানা গেল, ঠাকুরের ঐরূপ স্পর্শে আনন্দ—কাহারও চক্ষু মুদ্রিত করিবামাত্র যে ভক্তদিগের মূর্তির নিত্য ধ্যান করিতেন অথচ দর্শন পাইতেন প্রত্যেকের না, ভিতরে সেই মূর্তির জাজ্বল্য দর্শন—কাহারও দর্শন ও অনুভব ভিতরে পূর্বে অননুভূত একটা পদার্থ বা শক্তি যেন সড় সড় করিয়া উপরে উঠিতেছে, এইরূপ বোধ ও আনন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের গুরুভাব

এবং কাহারও বা পূর্বে যাহা কখনও দেখেন নাই একরূপ একটা জ্যোতির চক্ষু মুদ্রিত করিলেই দর্শন ও আনন্দানুভব হইয়াছিল! দর্শনাদি প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন হইলেও একটা অসাধারণ দিবা আনন্দে ভরপুর হইয়া যাইবার অনুভবটি সকলের সাধারণ প্রত্যক্ষ—এ কথাটি বেশ বুঝা গিয়াছিল। শুধু তাহাই নহে, ঠাকুরের ভিতরের অমানুষী শক্তি বিশেষই যে বাহ্যস্পর্শ দ্বারা সঞ্চারিত হইয়া প্রত্যেক ভক্তের ভিতর ঐরূপ অপূর্ব মানসিক অনুভব ও পরিবর্তন আনিয়া দিল, একথাটিও সকলের সাধারণ প্রত্যক্ষ বলিয়া বুঝিতে পারা গিয়াছিল। উপস্থিত ভক্ত

কখন কাহাকে
কৃপায় ঠাকুর
ঐ ভাবে স্পর্শ
করিবেন তাহা
বুঝা যাইত না

সকলের মধ্যে দুই জনকে কেবল ঠাকুর “এখন নয়” বলিয়া ঐরূপে স্পর্শ করেন নাই! এবং তাহারাই কেবল এ আনন্দের দিনে আপনাদিগকে হতভাগ্য জ্ঞান করিয়া বিষন্ন হইয়াছিলেন।^১ ইহা দ্বারা এ বিষয়টিও বুঝা গিয়াছিল যে, কখন কাহার প্রতি

কৃপায় ঠাকুরের ভিতর দিয়া ঐ দিব্যশক্তির প্রকাশ হইবে তাহার কিছুই স্থিরতা নাই! সাধারণ অবস্থায় ঠাকুর নিজেও তাহা জানিতে বা বুঝিতে পারিতেন কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ।

অতএব বেশ বুঝা যাইতেছে, কাঁচা বা ছোট আমিটাকে সম্পূর্ণরূপে বিসর্জন করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই ঠাকুর ‘বিশ্বব্যাপী আমি’ বা শ্রীশ্রীজগদম্বার শক্তিপ্রকাশের মহান ষট্-স্বরূপ হইতে পারিয়াছিলেন এবং ঐ কাঁচা ‘আমি’টাকে একে-বারে ত্যাগ করিয়া যথার্থ ‘দীনের দীন’ অবস্থায় উপনীত হইয়া-

১ পরে একদিন ঠাকুর ইহাদেরও ঐরূপে স্পর্শ করিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

ছিলেন বলিয়াই ঠাকুরের ভিতর দিয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথার লোক-
 'কাঁচা আমি'টার গুরু, জগৎগুরু-ভাবটির এইরূপে অপূর্ব বিকাশ
 লোপ বা সম্ভব হইয়াছিল! এইরূপে আমিত্বের লোপেই
 নাশেই গুরুভাব- গুরুভাব বা গুরুশক্তির বিকাশ যে, সকল ধর্মগত
 প্রকাশের সকল অবতারপুরুষগণের জীবনেই উপস্থিত
 কথা সকল সকল অবতারপুরুষগণের জীবনেই উপস্থিত
 ধর্মশাস্ত্রে আছে হইয়াছিল, জগতের ধর্মেতিহাস এ বিষয়ে চিরকাল
 সাক্ষ্য দিতেছে।

গুরুতে মনুষ্যবুদ্ধি করিলে ধর্মলাভ বা ঈশ্বরলাভ হয় না,
 একথা আমরা আবহমান কাল ধরিয়া শুনিয়া আসিতেছি।

‘গুরুব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণুর্গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ।’

—ইত্যাদি স্মৃতিকথা আমরা চিরকালই বিশ্বাস বা অবিশ্বাসের
 সহিত মন্ত্রদীক্ষাদাতা গুরুর উদ্দেশে উচ্চারণ করিয়া আসিতেছি।

অনেকে আবার বিদেশী শিক্ষার কুহকে পড়িয়া আপনাদের
 জাতীয় শিক্ষা ও ভাব বিসর্জন দিয়া মানববিশেষকে ঐরূপ বলা

গুরুভাব মানবীয় মহাপাপের ভিতর গণ্য করিয়া অনেক বাদানুবাদ
 ভাব নহে— করিতেও পশ্চাৎপদ হন নাই! কারণ কে-ই
 সাক্ষাৎ বা তখন বুঝে যে, কোন কোন মানবশরীরকে
 জগদম্বার ভাব আশ্রয় করিয়া প্রকাশ পাইলেও গুরুভাবটি মানবীয়
 মানবের শরীর ভাবরাজ্যেরই অন্তর্গত নহে। কে-ই বা তখন
 ও মনকে যন্ত্র- জানে যে শরীররক্ষার উপযোগী জল-বায়ু, আহার
 স্বরূপে অবলম্বন প্রভৃতি নিত্যাবশ্যকীয় বস্তুসমস্তের ন্যায় মায়াপাশে
 করিয়া বদ্ধ ত্রিতাপে তাপিত মানবমনের সমস্ত জ্বালানিবারণ ও শাস্তি-
 প্রকাশিত প্রভৃতি নিত্যাবশ্যকীয় বস্তুসমস্তের ন্যায় মায়াপাশে

বদ্ধ ত্রিতাপে তাপিত মানবমনের সমস্ত জ্বালানিবারণ ও শাস্তি-
 লাভের উপায়স্বরূপ হইয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথ স্বয়ংই ঐ ভাব ও

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের গুরুভাব

শক্তিরূপে শুদ্ধ, বুদ্ধ, অহমিকাশূন্য মানবমনের ভিতর দিয়া পূর্ণরূপে প্রকাশিত আছেন? এবং কে-ই বা তখন ধারণা করে যে, যাহার মন যতটা পরিমাণে অহঙ্কার ত্যাগ করিতে বা 'কাঁচা আমি'-টাকে ছাড়িতে পারে ততটা পরিমাণেই সে ঐ ভাব ও শক্তিপ্রকাশের যন্ত্রস্বরূপ হয়! সাধারণ মানবমনে ঐ দিব্যভাবের যৎসামান্য 'ছিটে ফোটা' মাত্র প্রকাশ, তাই আমরা ততটা ধরিতে ছুঁইতে পারি না। কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, চৈতন্য, শঙ্কর, যীশু প্রভৃতি পূর্ব পূর্ব যুগাবতারসকলে এবং বর্তমান যুগে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণে ঐ দিব্যশক্তির ঐরূপ অপূর্ব লীলা যখন বহুভাগ্যফলে কাহারও নয়নপথে পতিত হয়, তখনই সে প্রাণে-প্রাণে বুঝিয়া থাকে যে, এ শক্তিপ্রকাশ মানবের নহে—সাক্ষাৎ ঈশ্বরের। তখনই ভবরোগগ্রস্ত পথভ্রান্ত জিজ্ঞাসু মানবের মোহ মলিনতা দূরে অপসারিত হয় এবং সে বলিয়া উঠে, 'হে গুরু, তুমি কখনই মানুষ নও—তুমি তিনি!'

অতএব বুঝা যাইতেছে, শ্রীশ্রীজগন্নাথ যে ভাবরূপে মানব-মনের সকল প্রকার অজ্ঞান-মলিনতা দূর করেন, ঈশ্বর করুণায় ঐ ভাবাবলম্বনে সেই উচ্চ ভাবেরই নাম গুরুভাব বা গুরুশক্তি। মানব-মনের ঐ ভাবকেই শাস্ত্র গুরু নামে নির্দেশ করিয়াছেন ও অজ্ঞানমোহ ঐ ভাবকে উহার প্রতি মনের ষোল আনা শ্রদ্ধা, দূর করেন। ভক্তি ও বিশ্বাস অর্পণ করিতে বলিয়াছেন। কিন্তু সেজন্য স্থূলবুদ্ধি, ভক্তি-শ্রদ্ধাদি সবেমাত্র শিথিতে আরম্ভ গুরুভক্তি ও করিয়াছে এ প্রকার মানব-মন তো আর একটা ঈশ্বরভক্তি একই কথা অশরীরী ভাবকে ধরিতে, ছুঁইতে, ভালবাসিতে পারে না;

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

এ জগুই শাস্ত্র বলিয়াছেন দীক্ষাদাতা মানবকে গুরু বলিয়া ভক্তি করিতে। সেজগু যাহারা বলেন, আমরা গুরুভাবটিকে শ্রদ্ধা-ভক্তি করিতে পারি, কিন্তু যে দেহটা আশ্রয় করিয়া ঐ ভাব আমাদের নিকট প্রকাশিত হয় তাহাকে মাগু-ভক্তি কেন করিব—ঐ ভাব তো আর তাঁহার নহে? তাঁহাদিগকে আমরা বলি—‘ভাই, করিতে পার কর, কিন্তু দেখিও যেন নিজের মনের জুয়াচুরিতে ঠকিতে না হয়। শক্তি বা ভাব এবং যদবলম্বনে ঐ ভাব প্রকাশিত থাকে তদুভয়কে কখনও তো পৃথক্ পৃথক্ থাকিতে দেখ নাই, তবে কেমন করিয়া আগুন ও আগুনেক দাহিকাশক্তিকে পৃথক্ করিয়া একটিকে গ্রহণ ও ভক্তি-শ্রদ্ধা করিবে এবং অপরটিকে ত্যাগ করিবে, তাহা বলিতে পারি না!’ যে যাহাকে ভালবাসে বা ভক্তি করে সে প্রেমাস্পদের ব্যবহৃত অতি সামান্য জিনিসটাকেও হৃদয়ে ধারণ করে। তাঁহার স্পৃষ্ট ফুলটা বা কাপড়-চোপড়খানাও সে পবিত্র বলিয়া বোধ করে। তিনি যে স্থান দিয়া চলিয়া যান, সেখানকার মাটিটাও তাহার কাছে বহু মূল্যবান ও বহু আদরের জিনিস বলিয়া বোধ হয়। তবে তিনি যে শরীরটাতে অবস্থান করিয়া তাহার পূজা গ্রহণ করেন ও তাহাকে কৃপা করেন, সেটার প্রতি যে তাহার শ্রদ্ধা-ভক্তি হইবে—এটা কি আবার বুঝাইয়া বলিতে হইবে? যাহারা গুরুভাবটি কি তাহাই বুঝে না, তাহারাই ঐরূপ কথা বলিয়া থাকে। আর যাহার গুরুভাবের প্রতি ঠিক ঠিক ভক্তি হইবে তাহার ঐ ভাবের আধার গুরুর শরীরটার উপরেও ভক্তি-শ্রদ্ধার বিকাশ হইবেই হইবে। ঠাকুর এই বিষয়টি

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের গুরুভাব

বিভীষণের ভক্তির দৃষ্টান্ত দিয়া আমাদেরকে বুঝাইতেন।
যথা—

শ্রীরামচন্দ্রের মানবলীলাসংবরণের অনেককাল পরে কোন-
সময়ে নৌকা-ডুবি হইয়া একজন মানব লঙ্কার উপকূলে সমুদ্র-

গুরুভক্তি- তরঙ্গের দ্বারা নিক্ষিপ্ত হয়। বিভীষণ অমর,
বিষয়ে ঠাকুরের তিন কালই তিনি লঙ্কায় রাজত্ব করিতেছেন—
উপদেশ— তাঁহার নিকট ঐ সংবাদ পৌঁছিল। সভাস্থ অনেক
বিভীষণের রাক্ষসের সুকোমল মানবদেহরূপ খাড়ের আগমন-
গুরুভক্তির সংবাদে জিহ্বায় জল আসিল। রাজা বিভীষণের
কথা

কিন্তু ঐ সংবাদ শুনিয়া এক অপূর্ব ভাবাস্তর আসিয়া উপস্থিত
হইল। তিনি গলদশ্রলোচনে ভক্তি-গদগদ বাক্যে বার বার
বলিতে লাগিলেন, ‘অহো ভাগ্য!’ রাক্ষসেরা তাঁহার ভাব না
বুঝিতে পারিয়া সকলে একেবারে অবাক! তৎপরে বিভীষণ
তাহাদের বুঝাইয়া বলিতে লাগিলেন, ‘যে মানবশরীর আমার
রামচন্দ্র ধারণ করিয়া লঙ্কায় পদার্পণ করেন ও আমাকে কৃতার্থ
করেন, বহুকাল পরে আজ আবার সেই মানবশরীর দেখিতে
পাইব—এ কি কম ভাগ্যের কথা! আমার মনে হইতেছে যেন
সাক্ষাৎ রামচন্দ্রই পুনরায় ঐরূপে আসিয়াছেন।’ এই বলিয়া
রাজা পাত্র-মিত্র সভাসদসকলকে সঙ্গে লইয়া সমুদ্রোপকূলে
আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং বহু সম্মান ও আদর করিয়া
উক্ত মানবকে প্রাসাদে লইয়া যাইলেন। পরে তাহাকেই
সিংহাসনে বসাইয়া নিজে সপরিবারে অলুগত দাসভাবে তাহার
সেবা ও বন্দনাদি করিতে লাগিলেন! এইরূপে কিছুকাল

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

তাহাকে লঙ্কায় রাখিয়া নানা ধন-রত্ন-উপহার দিয়া সজ্জনমনে বিদায় দিলেন এবং অমুচরবর্গের দ্বারা বাণী পৌছাইয়া দিলেন !

গল্পটি বলিয়া ঠাকুর আবার বলিতেন, “ঠিক ঠিক ভক্তি হলে এইরূপ হয়। সামান্য জিনিস হতেও তার ঈশ্বরের উদ্দীপনা

ঠিক ঠিক
ভক্তিতে অতি
ভূচ্ছ বিষয়েও
ঈশ্বরের উদ্দী-
পন হয়। ‘এই
মাটিতে খোল
হয়’—বলিয়াই
শ্রীচৈতন্যের ভাব

হয়ে ভাবে বিভোর হয়। শুনিস নি—‘এই মাটিতে খোল হয়’ বলে চৈতন্যদেবের ভাব হয়েছিল ? এক সময়ে এক জায়গা দিয়ে যেতে যেতে তিনি শুনলেন যে সেই গ্রামে হরিসংকীর্ণের সময় যে খোল বাজে লোকে সেই খোল তৈয়ার ও উহা বিক্রয় করে দিনপাত করে। শুনেই তিনি বলে উঠলেন, ‘এই মাটিতে খোল হয়!’—বলেই ভাবে

বাহুজ্ঞানশূন্য হলেন। কেন না, উদ্দীপনা হলো; ‘এই মাটিতে খোল হয়, সেই খোল বাজিয়ে হরিনাম হয়, সেই হরি সকলের প্রাণের প্রাণ—সুন্দরের চাইতেও সুন্দর!’ একেবারে এত কথা মনে হয়ে হরিতে চিত্ত স্থির হয়ে গেল। সেই রকম যার গুরুভক্তি হয় তার গুরুর আত্মীয়-কুটুম্বদের দেখলে তো গুরুর উদ্দীপনা হবেই, যে গ্রামে গুরুর বাড়ী সে গ্রামের লোকদের দেখলেও ঐরূপ উদ্দীপনা হয়ে তাদের প্রণাম করে, পায়ের ধুলো নেয়, খাওয়ায় দাওয়ায় ও সেবা করে! এই অবস্থা হলে গুরুর দোষ আর দেখতে পাওয়া যায় না। তখনই এ কথা বলা চলে—

‘যতপি আমার গুর শুঁড়ীবাড়ী যায়।

তথাপি আমার গুর নিত্যানন্দ রায় ॥”^১

১ অর্থাৎ নিত্যানন্দস্বরূপ শ্রীভগবান বা ঈশ্বর।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের গুরুভাব

নইলে মানুষের তো দোষ-গুণ আছেই। সে তার ভক্তিতে কিন্তু তখন আর মানুষকে মানুষ দেখে না, ভগবান বলেই দেখে। যেমন ক্রীড়া-লাগা চোখে সব হলুদবর্ণ দেখে—সেই রকম; তখন তার ভক্তি তাকে দেখিয়ে দেয় যে, ঈশ্বরই সব—তিনিই গুরু, পিতা, মাতা, মানুষ, গরু, জড়, চেতন সব হয়েছেন।”

দক্ষিণেশ্বরে একদিন একজন সরল উদ্ধত যুবক ভক্ত^১ ঠাকুর যে বিষয়টি তাহাকে বলিতেছিলেন তৎসম্বন্ধে নানা আপত্তি-তর্ক উত্থাপিত করিতেছিল। ঠাকুর তিন-চারি বার তাহাকে ঐ বিষয়টি বলিলেও যখন সে বিচার করিতে লাগিল তখন ঠাকুর তাহাকে স্মৃষ্টি ভৎসনা করিয়া বলিলেন, “তুমি কেমন গা? আমি বল্চি আর তুমি কথাটা নিচ্চ না!” যুবকের এইবার ভালবাসায় হাত পড়িল। সে বলিল, “আপনি যখন বল্চেন তখন নিলুম বই কি। আগেকার কথাগুলো তর্কের খাতিরে বলেছিলাম।”

ঠাকুর শুনিয়া প্রসন্নমুখে হাসিতে হাসিতে বলিলেন, “গুরুভক্তি কেমন জান? গুরু যা বল্বে তা তখন দেখতে পাবে—সে ভক্তি ছিল অর্জুনের। একদিন অর্জুনের গুরু-
ভক্তির কথা।
শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের সঙ্গে রথে চড়ে বেড়াতে বেড়াতে আকাশের দিকে চেয়ে বললেন, ‘দেখ সখা, কেমন এক ঝাঁক পায়রা উড়ছে!’ অর্জুন অমনি দেখিয়া বলিলেন, ‘হাঁ সখা, অতি সুন্দর পায়রা!’ পরক্ষণেই শ্রীকৃষ্ণ আবার দেখিয়া বলিলেন, ‘না সখা, ও তো পায়রা নয়!’ অর্জুন

১ শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল

শ্রী শ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

দেখিয়া বলিলেন, ‘তাই তো সখা, ও পায়রা নয়।’ কথাটি এখন বোঝ—অর্জুন মহা-সত্যনিষ্ঠ, তিনি তো আর কৃষ্ণের খোশামোদ করিয়া ঐরূপ বলিলেন না? কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের কথায় তাঁর এত বিশ্বাস-ভক্তি যে, যেমন যেমন শ্রীকৃষ্ণ বলেন অর্জুনও তখন ঠিক ঠিক তা দেখতে পেলেন!”

শাস্ত্র যাঁহাকে অজ্ঞানানাককার-দূরীকরণসমর্থ গুরু বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন তাহা পূর্বোক্তরূপে ঐশ্বরিক ভাববিশেষ বলিয়া নির্ণীত হইলে সঙ্গে সঙ্গে আর একটি কথাও সত্য বলিয়া

স্বীকার করিতে হয়। তাহা এই—গুরু অনেক ঐশ্বরীয় ভাব-রূপে গুরু নহেন, এক। আধার বা যে যে শরীরাবলম্বনে এক। তথাপি ঐশ্বরের ঐ ভাব প্রকাশিত হয় তাহা ভিন্ন ভিন্ন নিজ গুরুতে হইলেও তোমার গুরু, আমার গুরু পৃথক নহেন—ভক্তি, বিশ্বাস ও নিষ্ঠা চাই। ভাবরূপে এক। মূন্ময় মূর্তিতে দ্রোণকে আচার্য্য-রূপে গ্রহণ ও ভক্তিপূর্বক একলব্যের ধনুর্বেদ-মানের কথা

লাভরূপ মহাভারতীয় কথাটি ইহারই দৃষ্টান্তস্বরূপে বলা যাইতে পারে। অবশ্য একথাটি যুক্তিতে দাঁড়াইলেও ঠিক-ঠিক হৃদয়ঙ্গম হওয়া অনেক সময় ও সাধন-সাপেক্ষ এবং হৃদয়ঙ্গম হইলেও যতক্ষণ মানবের নিজের দেহবোধ থাকে ততক্ষণ, যে শরীরের ভিতর দিয়া গুরুশক্তি তাঁহাকে রূপা করেন সেই শরীরাবলম্বনেই শ্রীগুরুর পূজা করা ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। ঠাকুর এই কথাটির দৃষ্টান্তে নিষ্ঠা-ভক্তির জলন্ত নিদর্শন হনুমানের কথা আমাদের কাছে বলিতেন। যথা—

লঙ্কাসমরে শ্রীরামচন্দ্র ও তাঁহার ভ্রাতা লক্ষ্মণ মহাবীর

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের গুরুভাব

মেঘনাদ কর্তৃক কোন সময়ে নাগপাশে আবদ্ধ হন এবং উহা হইতে মুক্তি পাইবার জন্য নাগকুলের চিরশত্রু গরুড়কে স্মরণ করিয়া আনয়ন করেন। গরুড়কে দেখিবামাত্র নাগকুল ভয়ত্রস্ত হইয়া যে যেদিকে পারিল পলায়ন করিল। রামচন্দ্রও নিজভক্ত গরুড়ের প্রতি প্রসন্ন হইয়া গরুড়ের চিরকালপূজিত ইষ্টমূর্তি বিষ্ণুরূপে তাহার সম্মুখে আবিভূত হইলেন ও তাহাকে বুঝাইয়া দিলেন—যিনি বিষ্ণু তিনিই তখন রামরূপে অবতীর্ণ। হনুমানের কিন্তু শ্রীরামচন্দ্রকে ঐরূপে বিষ্ণুমূর্তি পরিগ্রহ করিতে দেখা ভাল লাগিল না এবং কতক্ষণে তিনি পুনরায় রামরূপ পরিগ্রহ করিবেন এই কথাই ভাবিতে লাগিলেন। হনুমানের ঐ প্রকার মনোভাব বুঝিতে রামচন্দ্রের বিলম্ব হইল না। তিনি গরুড়কে বিদায় দিয়াই পুনরায় রামরূপ পরিগ্রহ করিয়া হনুমানকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “বৎস, আমার বিষ্ণুরূপ দেখিয়া তোমার ঐরূপ ভাবান্তর হইল কেন? তুমি মহাজ্ঞানী, তোমার তো আর জানিতে ও বুঝিতে বাকী নাই যে, যে রাম সেই বিষ্ণু।” হনুমান তাহাতে বিনীতভাবে উত্তর করিলেন, “সত্য বটে, এক পরমাত্মাই উভয় রূপ পরিগ্রহ করিয়াছেন এবং সেজন্য শ্রীনাথ ও জানকীনাথে কোন প্রভেদ নাই, কিন্তু তথাপি আমার প্রাণ সতত জানকীনাথেরই দর্শন চায়—কারণ তিনিই আমার সর্বস্ব। ঐ মূর্তির ভিতর দিয়াই আমি ভগবানের প্রকাশ দেখিয়া কৃতার্থ হইয়াছি—

শ্রীনাথে জানকীনাথে অভেদঃ পরমাত্মনি ।

তথাপি মম সর্বস্বঃ রামঃ কমললোচনঃ ॥”

এইরূপে গুরুভাবটি শ্রীশ্রীজগন্মাতার শক্তিবিশেষ ও সেই

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

শক্তি সকল মানবমনেই সূপ্ত বা ব্যক্তভাবে নিহিত রহিয়াছে
 সকল বলিয়াই গুরুভক্তিপরায়ণ সাধক শেষে এমন এক
 মানবেই অবস্থায় উপনীত হন যে, তখন ঐ শক্তি তাঁহার
 গুরুতাব নিজের ভিতর দিয়া প্রকাশিত হইয়া ধর্মের জটিল
 সুপ্তভাবে নিগূঢ় তত্ত্বসকল তাঁহাকে বুঝাইয়া দিতে থাকে ।

তখন সাধককে আর বাহিরের কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিয়া ধর্ম-
 বিষয়ক কোনরূপ সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া লইতে হয় না । গীতায়
 শ্রীভগবান অর্জুনকে বলিয়াছেন—

যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধিব্যাতিতরিণতি ।

তদা গন্তাসি নির্বেদং শ্রোতব্যং শ্রুতং চ ॥

গীতা—২।৫২

যখন তোমার বুদ্ধি অজ্ঞান-মোহ হইতে বিমুক্ত হইবে তখন আর
 এটা শুনা উচিত, ওটা শাস্ত্রে আছে ইত্যাদি কথায় আর তোমার
 প্রয়োজন থাকিবে না, তুমি ঐ সকলের পারে চলিয়া যাইয়া
 আপনিই তখন সকল বিষয় বুঝিতে পারিবে; সাধকের তখন
 ঐরূপ অবস্থা আসিয়া উপস্থিত হয় ।

ঠাকুর ঐ অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়াই বলিতেন, “শেষে মনই
 গুরু হয় বা গুরুর কাজ করে । মানুষ গুরু মন্ত্র দেয় কানে,

(আর) জগদ্গুরু মন্ত্র দেয় প্রাণে ।” কিন্তু সে মন

ঠাকুরের কথা
 —শেষে মনই
 গুরু হয়

আর এ মনে অনেক প্রভেদ । সে সময়ে মন

শুদ্ধসত্ত্ব পবিত্র হইয়া ঈশ্বরের উচ্চ শক্তিপ্রকাশের

যন্ত্রস্বরূপ হয়, আর এ সময়ে মন ঈশ্বর হইতে

বিমূখ হইয়া ভোগসুখ ও কামক্রোধাদিতেই মাতিয়া থাকিতে চায় ।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের গুরুভাব

ঠাকুর বলিতেন, “গুরু যেন সখী—যতদিন না শ্রীকৃষ্ণের
সহিত শ্রীরাধার মিলন হয় ততদিন সখীর কাজের বিয়াম
নাই, সেইরূপ যতদিন না ইষ্টের সহিত সাধকের
“গুরু যেন
সখী” মিলন হয় ততদিন গুরুর কাজের শেষ নাই।”
এইরূপে মহামহিমাবিত শ্রীগুরু জিজ্ঞাসু ভক্তের
হাত ধরিয়া উচ্চ হইতে উচ্চতর ভাবরাজ্যে আরোহণ করেন
এবং পরিশেষে তাহাকে ইষ্টমূর্তির সন্মুখে আনিয়া বলেন, “ও
শিষ্য, ঐ দেখ!” ইহা বলিয়াই অস্তহিত হন।

ঠাকুরকে একদিন ঐরূপ বলিতে শুনিয়া একজন অনুগত
ভক্ত ‘শ্রীগুরুর সহিত বিচ্ছেদ তবে তো একদিন
“গুরু শেষে
ইষ্টে লয় হন।
গুরু, কৃষ্ণ,
বৈষ্ণব—তিনে
এক, একে
তিন” অনিবার্য’ ভাবিয়া ব্যথিত হৃদয়ে জিজ্ঞাসা করেন—
“গুরু তখন কোথায় যান, মশাই?” ঠাকুর তদুত্তরে
বলেন, “গুরু ইষ্টে লয় হন। গুরু, কৃষ্ণ, বৈষ্ণব—
তিনে এক, একে তিন।”

চতুর্থ অধ্যায়

গুরুভাবের পূর্ববিকাশ

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্ ।

পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্ ॥—গীতা, ৯।১১

ঠাকুরের ভিতরে গুরুভাবের প্রকাশ বাল্যাবধিই দেখিতে পাওয়া যায়। তবে যৌবনে নির্বিকল্প-সমাধিলাভের পর ঐ ভাবের যে পূর্ণ বিকাশ, তাহাও স্বীকার করিতে হয়। বাল্যাবধি তাঁহাতে ঐ ভাবের প্রকাশ বলাতে কেহ না মনে করেন, আমরা ঠাকুরকে বাড়াইবার জন্য কথাটি অতিরঞ্জিত করিয়া বলিতেছি। যথার্থ নিরপেক্ষভাবে যদি কেহ ঠাকুরের জীবন আলোচনা করেন তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন, ঐ দোষে

কখনই তাঁহাকে লিপ্ত হইতে হইবে না। এ অদ্ভুত

বাল্যাবস্থা

হইতেই

গুরুভাবের

পরিচয় ঠাকুরের

জীবনে পাওয়া

যায়

অলৌকিক জীবনের ঘটনাবলী যিনি যতদূর পারেন

বিচার করিয়া দেখুন না কেন, দেখিবেন বিচার-

শক্তিই পরিশেষে হার মানিয়া স্তম্ভিত ও মুগ্ধ হইয়া

রহিয়াছে! আমাদের মনও বড় কম সন্দিগ্ধ ছিল

না; আমাদের ভিতরের অনেকেই ঠাকুরকে যে

ভাবে যাচাইয়া বাজাইয়া লইয়াছেন ঐরূপ করিতে এখনকার

কাহারও মন-বুদ্ধিতে উঠিবেই না বলিয়া আমাদের বোধ হয়।

ঐরূপে ঠাকুরকে সন্দেহ করা এবং পরীক্ষা করিতে যাইয়া নিজেই

গুরুভাবের পূর্ববিকাশ

পরাজিত হইয়া লজ্জায় অধোবদন হওয়া আমাদের ভিতর
কতবার কত লোকেই ভাগ্যে যে হইয়াছে তাহা বলা যায় না।
'লীলাপ্রসঙ্গে' ঐ বিষয়ের আভাস আমরা পূর্বেই পাঠককে
কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ দিয়াছি, পরে আরও অনেক দিতে হইবে।
পাঠক তখন নিজেই বুঝিয়া লইবেন; এজন্য এ বিষয়ে এখন
আর অধিক বলিবার আবশ্যকতা নাই।

“আগে ফল, তারপর ফুল—যেমন লাউ-কুমড়ার”—ঠাকুর
একথাটি নিত্যমুক্ত ঈশ্বরকোটিদের জীবনপ্রসঙ্গে সর্বদাই
ব্যবহার করিতেন। অর্থ—ঐরূপ পুরুষেরা জগতে
আসিয়া কোন বিষয়ে সিদ্ধ হইবার জন্য যাহা কিছু
সাধন করেন, তাহা কেবল ইতর-সাধারণকে
বুঝাইয়া দিবার জন্য যে, ঐ বিষয়ে ঐরূপ ফললাভ
করিতে হইলে এইরূপ চেষ্টা তাহাদের করিতে
হইবে। কারণ ঐরূপ পুরুষদিগের ‘জীবনালোচনা’ করিলে
দেখিতে পাওয়া যায় যে, যে জ্ঞানলাভের জন্য তাঁহারা এতটা
চেষ্টা জীবনে দেখান, সেই জ্ঞান আজীবন থাকিলে সকল কার্য
যে রূপভাবে করা যায়, ঐ সকল পুরুষেরা বাল্যাবধি ঠিক তদ্রূপ
ব্যবহারই সর্বত্রই সকল বিষয়ে করিয়া আসিয়াছেন। যেন ঐ
জ্ঞানলাভ করিবার ফল তাঁহারা পূর্বে হইতেই নিজস্ব করিয়া
রাখিয়াছেন! নিত্যমুক্তদিগের সম্বন্ধেই যখন ঐ কথা সত্য, তখন
ঈশ্বরাবতারদের তো কথাই নাই! তাঁহাদের জীবনে ঐরূপ
জ্ঞানের প্রকাশ আজীবনই দেখিতে পাওয়া যায়। সকল দেশের
সকল যুগের ঈশ্বরাবতারদের সম্বন্ধেই শাস্ত্র একথা সত্য বলিয়া

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। আবার ইহাও দেখা যায় যে, ভিন্ন ভিন্ন যুগের ঈশ্বরাবতারদিগের অনেক ব্যবহারের মধ্যে একটা সৌমাদৃশ্য আছে। যথা—স্পর্শ দ্বারা ধর্মজীবন-সঞ্চারের কথা যীশু, শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণ সকলের জীবনেই দেখিতে পাই। ঐরূপ, তাঁহাদের জন্মগ্রহণকালে বিশেষ বিশেষ ধর্মপরায়ণ ব্যক্তির ঐ বিষয় আলৌকিক উপায়ে জ্ঞাত হইবার কথা, বাল্যাবধি তাঁহাদের ভিতর গুরুভাব প্রকাশিত থাকিবার কথা, তাঁহারা যে মানবসাধারণকে উন্নত করিবার জন্ত বিশেষ বিশেষ পথ দেখাইতে কৃপায় অবতীর্ণ, এ বিষয়টি বাল্যাবধি উপলব্ধি করিবার কথা প্রভৃতি অনেক কথাই একরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব ঠাকুরের জীবনে বাল্যাবধি গুরুভাব প্রভৃতির প্রকাশ থাকার কথা শুনিয়া আশ্চর্য হইবার কিছু নাই। কারণ ‘অবতার’পুরুষদিগের থাক বা শ্রেণীই একটা পৃথক। সাধারণ মানবের জীবনে ঐরূপ ঘটনা কখনও সম্ভবে না বলিয়া অবতারপুরুষদিগের জীবনেও ঐরূপ হওয়া অসম্ভব মনে করিলে বিষম ভ্রমে পড়িতে হইবে।

ঠাকুরের জীবনে গুরুভাবের প্রথম জলন্ত নিদর্শন দেখিতে পাই তাঁহার জন্মভূমি কামারপুকুরে। তাঁহার তখন উপনয়ন হইয়া গিয়াছে; অতএব বয়স ঠাকুরের জীবনে গুরুভাবের প্রথম বিকাশ —কামার-পুকুরে ৯।১০ বৎসর হইবে। গ্রামের জমিদার লাহাবাবুদের বাটীতে শ্রাদ্ধোপলক্ষে তদঞ্চলের খ্যাতনামা পণ্ডিতবর্গের নিমন্ত্রণ হয় এবং অনেক পণ্ডিতের একত্র সমাবেশ হইলে যাহা হইয়া থাকে—খুব তর্কের

গুরুভাবের পূর্ববিকাশ

হড়াছড়ি পড়িয়া যায়। অনেক তর্কেও শাস্ত্রীয় গ্রন্থবিশেষের কোনরূপ মীমাংসা হইতেছিল না, এমন সময় লাহাবাবুদের বাটতে পণ্ডিতসভার শাস্ত্রবিচার বালক শ্রীরামকৃষ্ণ বা গদাধর পরিচিত জনৈক পণ্ডিতকে বলেন, “কথাটার এই ভাবে মীমাংসা হয় না কি?” সভায় পল্লীর অনেক বালকই কৌতূহলাক্ৰষ্ট হইয়া আসিয়াছিল এবং নানারূপ অঙ্গভঙ্গী করিয়া পণ্ডিতদিগের উচ্চরবে বাগযুদ্ধটার বিন্দুমাত্র অর্থবোধ না হওয়ায় কেহ বা উহাকে একটা রঙ্গরঙ্গের মধ্যে ভাবিয়া হাসিতেছিল, কেহ বা বিরক্ত হইয়া পণ্ডিতদিগের অঙ্গভঙ্গীর অমুকরণ করিয়া সোয়গোল করিতেছিল, আবার কেহ বা একেবারে অগ্ন্যম্বনা হইয়া আপনাদের ক্রীড়াতেই মন দিয়াছিল। কাজেই এ অপূর্ব বালক যে পণ্ডিতদিগের সকল কথা ধৈর্য্যসহকারে শুনিয়াছে, বুঝিয়াছে এবং মনে ভাবিয়া একটা সুমীমাংসায় উপনীত হইয়াছে, ইহা ভাবিয়া পণ্ডিতটি প্রথম অবাক হইলেন; তাহার পর নিজের পরিচিত পণ্ডিতদের নিকট গদাধরের মীমাংসার কথা বলিতে লাগিলেন; তাহার পর তাঁহারা সকলে উহাই ঐ বিষয়ের একমাত্র মীমাংসা বুঝিয়া অপরাপর সকল পণ্ডিতকে ঐ বিষয় বুঝাইয়া বলিলেন। তখন ঐ প্রশ্নের উহাই যে একমাত্র সমাধান তাহা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিলেন এবং কাহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ঐ অপূর্ব সমাধান প্রথম দেখিতে পাইল, তাহারই অমুসন্ধান করিতে লাগিলেন এবং যখন নিশ্চিত জানিতে পারিলেন উহা বালক গদাধরই করিয়াছে, তখন কেহ বা স্তম্ভিতপ্রায় হইয়া বালককে দৈবশক্তিসম্পন্ন ভাবিয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন,

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

আবার কেহ বা আনন্দপরিপূরিত হইয়া বালককে ক্রোড়ে তুলিয়া আশীর্বাদ করিতে লাগিলেন !

কথাটি আর একটু আলোচনা আবশ্যিক। ক্রীশ্চান ধর্ম-
 ঈশার জীবনে প্রবর্তক ভগবদবতার ঈশার জীবনেও ঠিক এইরূপ
 ঐরূপ ঘটনা। একটি কথা বাইবেলে^১ লিপিবদ্ধ আছে। তাঁহার
 জেরুজালেমের বয়ঃক্রম তখন দ্বাদশবর্ষ। তাঁহার দরিদ্র ধর্মপরায়ণ
 য়াভে-মন্দির পিতামাতা ইয়ুসুফ ও মেরি সে-বৎসর তাঁহাকে
 লইয়া অন্যান্য যাত্রীদের সহিত পদব্রজে নিজেদের বাসভূমি
 গ্যালিলি প্রদেশস্থ নাজারেথ্ নামক গণ্ডগ্রাম হইতে জেরুজালেম
 তীর্থে স্ববিখ্যাত মন্দিরে দেবদর্শন ও পূজা বলি ইত্যাদি দিবার
 জন্ত যাত্রা করিয়াছেন। য়াহুদিদিগের এই তীর্থ হিন্দুদিগের তীর্থ-
 সকলের গায়ই ছিল। এখানে স্বর্ণকোটায় য়াভে দেবতার আবির্ভাব
 ভক্তসাধক প্রত্যক্ষ করিয়া আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিত এবং উহার
 সম্মুখে একটি বেদীর উপর ধূপ-ধুনা জ্বালাইয়া পত্র-পুষ্প-ফলমূল ও
 মেষ-পায়রা প্রভৃতি পশু-পক্ষ্যাদি বলি দিয়া উক্ত দেবতার পূজা
 করিত। হিন্দুদিগের ৮কামাখ্যা পীঠ ও ৮বিষ্ণ্যবাসিনী প্রভৃতি
 তীর্থে অद्याপি পায়রা প্রভৃতি পক্ষী বলি দেওয়া এখনও প্রচলিত।

ইয়ুসুফ্ ও মেরি শাস্ত্রানুসারে দর্শন, পূজা, বলি ও হোমাদি
 সেকালের ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া সঙ্গীদিগের সহিত নিজ
 য়াহুদি তীর্থ- গ্রামাভিমুখে ফিরিলেন। সে সময়ে নানা দিগ্দেশ
 যাত্রী হইতে জেরুজালেমদর্শনে আগত যাত্রীদিগের
 অবস্থা অনেকটা রেল হইবার পূর্বে পদব্রজে ৮পুরী প্রভৃতি

গুরুভাবের পূর্ববিকাশ

তীর্থদর্শনে অগ্রসর যাত্রীদিগের মতই ছিল। সেই মধ্যে মধ্যে বৃক্ষ-কুপ-তড়াগাদিশোভিত একই প্রকার দীর্ঘ পথ, সেই মধ্যে মধ্যে বিশ্রামস্থান, চটী বা সরাই—ধর্মশালারও অভাব ছিল না। শুনা যায়—সেই তীর্থযাত্রীর সহচর পাণ্ডা, সেই চাল-ডাল-আটা প্রভৃতি নিতাস্ত আবশ্যকীয় খাদ্যাদিদ্রব্য-প্রাপ্তিস্থান মুদির দোকান, সেই ধূলা, সেই ধর্মভাববিস্মরণকারী নিদ্রালেশের বৈরী যাত্রীদিগের পরমবন্ধু মশককুল, সেই বিশেষ বিশেষ অঞ্চলের যাত্রিবর্গের দক্ষ্য-তক্ষরাদি হইতে পরম্পরের সাহায্যলাভ করিতে পারিবে বলিয়া দলবদ্ধ হইয়া গমন এবং পরিশেষে সেই যাত্রীদিগের একান্ত ঈশ্বরনির্ভরতা ও ভগবদ্ভক্তি !

ঈশার পিতা-মাতা আপন দলের সহিত প্রত্যাবর্তনের সময় ঈশাকে নিকটে দেখিতে না পাইয়া ভাবিলেন, বোধ হয় অপর কোন যাত্রী বালকের সহিত দলের পশ্চাতে আসিতেছে। কিন্তু অনেক দূর চলিয়া আসিয়াও যখন ঈশাকে দেখিতে পাইলেন না, তখন বিশেষ ভাবিত হইয়া তন্নতন্ন করিয়া দলমধ্যে অন্বেষণ করিয়া দেখিলেন ঈশা তাঁহাদের সঙ্গে নাই। কাজেই ব্যাকুল হইয়া পুনরায় জেরুজালেম অভিমুখে ফিরিলেন। সেখানে নানাস্থানে অনুসন্ধান করিয়া কোথাও বালকের তত্ত্ব পাইলেন না। পরিশেষে মন্দিরমধ্যে অনুসন্ধান করিতে যাইয়া দেখেন বালক ঈশা শাস্ত্রজ্ঞ সাধককুলের ভিতর বসিয়া শাস্ত্রবিচার করিতেছে এবং শাস্ত্রের জটিল প্রশ্নসকলের (যাহা পণ্ডিতেরাও সমাধান করিতে পারিতেছেন না) অপূর্ব ব্যাখ্যা করিয়া সকলকে মোহিত করিতেছে !

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

পণ্ডিত মোক্ষমূলর তৎকৃত শ্রীরামকৃষ্ণজীবনীতে শ্রীরামকৃষ্ণের পূর্বোক্ত বাল্যলীলার সহিত ঈশার বাল্যলীলার সৌন্দর্য্য পাইয়া

ঐ বিষয়ের সত্যতায় বিশেষ সন্দেহান হইয়াছেন ।

পণ্ডিত
মোক্ষমূলরের
মতধ্বনন

শুধু তাহাই নহে, একটু কটাক্ষ করিয়াও বলিয়াছেন

যে, শ্রীরামকৃষ্ণের ইংরাজীবিজ্ঞাভিজ্ঞ শিষ্যেরা গুরুর

মান বাড়াইবার জন্য ঈশার বাল্যলীলার কথাটি

শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত ইচ্ছা করিয়াই জুড়িয়া দিয়াছেন ! পণ্ডিত

ঐরূপে আপন তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিলেও আমরা নাচার,

কারণ শ্রীরামকৃষ্ণের ঐরূপ বাল্যলীলার কথা আমরা ঠাকুরের

জন্মভূমি কামারপুকুরের অনেক বৃদ্ধের মুখে শুনিয়াছি এবং ঠাকুরও

কখন-কখন ঐ বিষয় আমাদের কাহারও কাহারও নিকট নিজমুখে

বলিয়াছেন । এই পর্য্যন্ত বলিয়াই এখানে ক্ষান্ত থাকা ভাল ।

ঠাকুরের জীবনালোচনা করিতে ঘাইয়া সকলেরই মনে হয়—

ঠাকুর বিবাহিত হইলেন কেন ? স্ত্রীর সহিত বাহার কোনকালেই

শরীরসংস্কর রাখিবার সঙ্কল্প ছিল না, তিনি কেন

ঠাকুর বিবাহ
করিলেন

বিবাহ করিলেন ইহার কারণ বাস্তবিকই খুঁজিয়া

কেন ? আত্মীয়-
দিগের অনু-
রোধে ?—না

পাওয়া ভার । যদি বল, যৌবনে পদার্পণ করিয়াই

ঠাকুর 'ভগবান' 'ভগবান' করিয়া উন্মাদপ্রায়

হইলেন বলিয়াই আত্মীয়েরা জোর করিয়া বিবাহ

দিলেন, তদন্তরে আমরা বলি ওটা একটা কথাই নয় । জোর

করিয়া একটা ছোট কাজও তাঁহাকে বাধ্যবধি কেহ করাইতে

পারে নাই । যখন বাহা করিবেন মনে করিয়াছেন, তাহা কোনও

না কোন উপায়ে নিশ্চিত সাধিত করিয়াছেন । উপনয়নকালে

গুরুভাবের পূর্ববিকাশ

ধনী নাগ্নী জনৈকা কামারজাতীয়া কন্যাকে ভিক্ষামাতা করাতেই দেখ না। কামারপুকুরে কলিকাতার গায় সমাজবন্ধন শিখিল ছিল না যে, যাহার যাহা ইচ্ছা তাহাই করিবে; ঠাকুরের পিতামাতাও কম স্বধর্মনিষ্ঠ ছিলেন না, বংশগত প্রথাও ছিল—কোনও না কোন ব্রাহ্মণকন্যাকে ভিক্ষামাতারূপে নির্দিষ্ট করা এবং বালক গদাধরের অভিভাবকদিগের সকলেই বালকের কামারকন্যার নিকট হইতে প্রথম ভিক্ষাগ্রহণের বিরোধী ছিলেন। তথাপি কেবলমাত্র গদাধরের নির্বন্ধে ধনীর ভিক্ষামাতা হওয়া সাব্যস্ত হইল—ইহা একটি কম আশ্চর্যের বিষয় নহে! এইরূপে সকল ঘটনায় যখন দেখিতে পাই, ঠাকুরের ইচ্ছা ও কথাই সকল বিষয়ে অপর সকলের বিপরীত ভাব ও ইচ্ছাকে চিরকাল ফিরাইয়া দিয়াছে, তখন কেমন করিয়া বলি তাঁহার জীবনের অত বড় ঘটনাটা আত্মীয়দিগের ইচ্ছা ও অনুরোধের জোরে হইয়াছে?

আবার, যদি বল ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগে সর্বস্বত্যাগের ভাবটা যে ঠাকুরের আজীবন ছিল, এ কথাটা স্বীকার করিবার

আবশ্যকতা কি? ঐ কথাটা স্বীকার না করিয়া

ভোগবাসনা
ছিল বলিয়া?

যদি বল যে, মানবসাধারণের গায় ঠাকুরেরও

—না

বিবাহাদি করিয়া সংসার-সুখভোগ করিবার ইচ্ছাটা

প্রথম প্রথম ছিল, কিন্তু যৌবনে পদার্পণ করিয়াই

তাঁহার মনের গতির হঠাৎ একটা আমূল পরিবর্তন আসিয়া পড়িল;

সংসার-বৈরাগ্য ও ঈশ্বরানুরাগের একটা প্রবল ঝটিকা তাঁহার

প্রাণে বহিয়া তাঁহাকে এমন আত্মহারা করিয়া ফেলিল যে, তাঁহার

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

পূর্বেকার বাসনাসমূহ একেবারে চিরকালের মত কোথায় উড়িয়া যাইল। ঠাকুরের বিবাহটা ঐ বিরাগ-অনুরাগের ঝড়টা বহিবার আগেই হইয়াছিল বলিলেই তো সকল কথা মিটিয়া যায়? আমরা বলি—কথাটি আপাততঃ বেশ যুক্তিযুক্ত বোধ হইলেও তৎসম্বন্ধে কতকগুলি অখণ্ডনীয় আপত্তি আছে। প্রথম—চব্বিশ বৎসর বয়সে ঠাকুরের বিবাহ হয়, তখন বৈরাগ্যের ঝড় তাঁহার প্রাণে তুমুল বহিতেছে। আর আজীবন যিনি নিজের জ্ঞান কাহাকেও এতটুকু কষ্ট দিতে কুণ্ঠিত হইতেন, তিনি যে কিছুমাত্র না ভাবিয়া একজন পরের মেয়ের চিরকাল দুঃখ-ভোগের সম্ভাবনা বুঝিয়াও ঐ কার্যে অগ্রসর হইলেন, ইহা হইতেই পারে না। দ্বিতীয়—ঠাকুরের জীবনের কোন ঘটনাটাই যে নিরর্থক হয় নাই, একথা আমরা যতই বিচার করিয়া দেখি ততই বুঝিতে পারি। তৃতীয়—তিনি ইচ্ছা করিয়াই যে বিবাহ করিয়াছিলেন ইহা সুনিশ্চিত; কারণ বিবাহের পাত্রী অনুসন্ধান-কালে নিজের ভাগিনেয় হৃদয় ও বাটীর অন্ত্রাণ্ড সকলকে বলিয়া দেন যে, তাঁহার বিবাহ জয়রামবাটীনিবাসী শ্রীযুত রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কন্যার সহিত হইবে—ইহা পূর্ব হইতে স্থির আছে। কথাটি শুনিয়া পাঠক অবাক হইবে, অথবা অবিশ্বাস করিয়া বলিবে—
 “কেবলই অদ্ভুত কথার অবতারণা! বিংশ শতাব্দীতে
 ও সকল কথা কি চলে?” তদুত্তরে আমাদের
 বলিতে হয়, “তুমি বিশ্বাস কর আর নাই কর বাপু,
 কিন্তু ঘটনা বাস্তবিকই ঐরূপ হইয়াছিল। এখনও অনেকে বাঁচিয়া

বিবাহের পাত্রী-
 অন্বেষণের সময়ে
 ঠাকুরের কথা
 —“কুটো বেঁধে
 রাখা আছে,
 দেখ্গে যা।”
 অতএব স্বেচ্ছায়
 বিবাহ করা

গুরুভাবের পূর্ববিকাশ

আছেন যাহারা ঐ বিষয়ে সাক্ষ্য দিবেন। অমুসন্ধান করিয়া দেখই না কেন ?” পাত্রীর অশ্বেষণে যখন কোনটিই আত্মীয়দিগের মনোমত হইতেছিল না, তখন ঠাকুর স্বয়ং বলিয়া দেন অমুক গায়ের অমুকের “মেয়েটি কুটো বেঁধে^১ রাখা আছে দেখ্গে যা !” অতএব বুঝাই যাইতেছে ঠাকুর জানিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহার বিবাহ হইবে এবং কোথায় কাহার কন্যার সহিত হইবে। তিনি তাহাতে কোন আপত্তিও করেন নাই। অবশ্য ঐরূপ জানিতে পারা তাঁহার ভাবসমাধিকালেই হইয়াছিল।

তবে ঠাকুরের বিবাহ হইবার অর্থ কি ? শাস্ত্রজ্ঞ কোন পাঠক এইবার হয়ত বিরক্ত হইয়া বলিবেন—তুমি তো বড় অর্কাচীন

হে ! সামান্য কথাটা লইয়া এত গোল করিতেছ ?

প্রারন্ধ কর্ম-
ভোগের জন্তই
কি ঠাকুরের
বিবাহ ?

শাস্ত্র-টাস্ত্র একটু আধটু দেখিয়া সাধু-মহাপুরুষের

জীবনের ঘটনা লিখিতে কলম ধরিতে হয়। শাস্ত্র

বলেন—ঈশ্বরদর্শন বা পূর্ণজ্ঞান হইলে জীবের সঞ্চিত

ও আগামী কর্মের ক্ষয় হয়, কিন্তু প্রারন্ধ কর্মের ভোগ জীবকে

জ্ঞানলাভ হইলেও এই দেহে করিতে হয়। একটা ব্যাধের পিঠে

বাঁধা তুণে কতকগুলি তীর রহিয়াছে, হাতে একটি তীর এখনি

ছুড়িবে বলিয়া লইয়াছে, আর একটি তীর বৃক্ষোপরি একটি

১ পাড়াগাঁয়ে প্রথা আছে, শশা প্রভৃতি গাছের যে ফলটি ভাল বুঝিয়া ভগবানের ভোগ দিবে বলিয়া কৃষক মনে করে, স্মরণ রাখিবার জন্ত সেটিতে একটি কুটো বাঁধিয়া চিহ্নিত করিয়া রাখে। ঐরূপ করায় কৃষক নিজে বা তাহার বাটীর আর কেহ সেটি ভুলক্রমে তুলিয়া বিক্রয় করিয়া ফেলে না। ঠাকুর ঐ প্রথা স্মরণ করিয়াই ঐ কথা বলেন। অর্থ—অমুকের মেয়ের সহিত তাঁহার বিবাহ হইবে একথা পূর্ব হইতে স্থির হইয়া আছে, অথবা অমুক কন্যাটি তাঁহার বিবাহের পাত্রীস্বরূপে দৈবকর্তৃক রক্ষিত আছে।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

পক্ষীকে লক্ষ্য করিয়া সে এইমাত্র ছুড়িয়াছে। এমন সময় ধর ব্যাধের মনে হঠাৎ বৈরাগ্যের উদয় হইয়া সে ভাবিল আর হিংসা করিবে না। হাতের তীরটি সে ফেলিয়া দিল, পিঠের তীরগুলিও ঐরূপে ত্যাগ করিল, কিন্তু যে তীরটি সে পাখীটাকে লক্ষ্য করিয়া ছুড়িয়া ফেলিয়াছিল সেটাকে কি আর ফিরাইতে পারে? পিঠের তীরগুলি যেন তাহার জন্মজন্মান্তরের সঞ্চিত কর্ম, আর হাতের তীরটি আগামী কর্ম বা যে কর্মসকলের ফল সে এইভাবে ভোগ করিবে—ঐ উভয় কর্মগুলি জ্ঞানলাভে নাশ হয়। কিন্তু তাহার প্রারম্ভ কর্মগুলি হইতেছে—যে তীরটি সে ছুড়িয়া ফেলিয়াছে তাহার মত; তাহাদের ফল ভোগ করিতে হইবেই হইবে। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শ্রায় মহাপুরুষেরা কেবল প্রারম্ভ কর্মসকলের ভোগই শরীরে করিয়া থাকেন। ঐ ফলভোগ অবশ্যস্বাভাবী এবং তাঁহারা বুঝিতে বা জানিতেও পারেন যে, তাঁহাদের প্রারম্ভ অনুসারে তাঁহাদের জীবনে কিরূপ ঘটনাবলী আসিয়া উপস্থিত হইবে। কাজেই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ঐরূপে নিজ বিবাহ কোন্ পাত্রীর সহিত কোথায় হইবে, তাহা বলিয়া দেওয়াটা কিছু বিচিত্র নহে।

ঐ কথার উত্তরে আমরা বলি—অবশ্য শাস্ত্রজ্ঞান সম্বন্ধে আমরা বাস্তবিকই নিতান্ত অনভিজ্ঞ। কিন্তু যতটুকু দেখিয়াছি, তাহাতে

না—যথার্থ	যথার্থ জ্ঞানী পুরুষকে প্রারম্ভ কর্মসকলেরও ফল-
জ্ঞানী পুরুষের	ভোগ করিতে হয় না। কারণ সুখ-দুঃখাদি ভোগ
প্রারম্ভ ভোগ	করিবে যে মন, সে মন যে তিনি চিরকালের
করা-না-করা	নিমিত্ত ঈশ্বরে অর্পণ করিয়াছেন—তাহাতে আর
ইচ্ছাধীন	সুখ-দুঃখাদির স্থান কোথা? তবে যদি বল—তাঁহার শরীরটায়ও

সুখ-দুঃখাদির স্থান কোথা? তবে যদি বল—তাঁহার শরীরটায়ও

গুরুভাবের পূর্ববিকাশ

প্রারব্ধ ভোগ হয়, তাহাই বা কিরূপে হইবে? তিনি যদি ইচ্ছা করিয়া অল্পমাত্র আমিত্ত্ব কোন বিশেষ কারণে—যথা, পরোপকারাদির নিমিত্ত—রাখিয়া দেন, তবেই তাঁহার আবার শরীরমনের উপলব্ধি হয় ও সঙ্গে সঙ্গে প্রারব্ধ কর্মের ভোগ হয়। অতএব যথার্থ জ্ঞানী পুরুষ ইচ্ছা হইলে প্রারব্ধ ভোগ বা ত্যাগ করিতে পারেন; তাঁহাদের ঐরূপ ক্ষমতা আসিয়া উপস্থিত হয়। সেইজন্যই তাঁহাদিগকে ‘লোকজিৎ’, ‘মৃত্যুঞ্জয়’, ‘সর্বজ্ঞ’ ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়।

আর এক কথা—শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিজের অনুভব যদি বিশ্বাস করিতে হয় তাহা হইলে তাঁহাকে আর জ্ঞানী পুরুষ বলা

ঠাকুরের তো
কথাই নাই;
কারণ, তাঁহার
কথা—‘যে
রাম, যে কৃষ্ণ,
সে-ই ইদানীং
রামকৃষ্ণ’

চলে না; ঐ শ্রেণীমধ্যেই তাঁহাকে আর স্থান দিতে
পারা যায় না। কেননা, তাঁহাকে বার বার বলিতে
শুনিয়াছি, “যে রাম, যে কৃষ্ণ, সে-ই ইদানীং রাম-
কৃষ্ণ”, অর্থাৎ যিনি পূর্বে রামরূপে এবং কৃষ্ণরূপে
অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তিনিই বর্তমান যুগে

শ্রীরামকৃষ্ণশরীরে বর্তমান থাকিয়া অপূর্ব লীলার
বিস্তার করিতেছেন। কথাটি বিশ্বাস করিলে তাঁহাকে নিত্য-
শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্তস্বভাব ঈশ্বরবতার বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়।
আর ঐরূপ করিলে, তাঁহাকে প্রারব্ধাদি কোন কর্মেরই বশীভূত
আর বলা চলে না। অতএব ঠাকুরের বিবাহ সম্বন্ধে অণুপ্রকার
মীমাংসাই আমরা যুক্তিযুক্ত মনে করি এবং তাহাই এখানে
বলিব।

বিবাহের কথা আমাদের নিকট উত্থাপন করিয়া ঠাকুর অনেক

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

সময় রঙ্গরসও করিতেন। উহাও বড় মধুর। দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর
একদিন মধ্যাহ্নে ভোজন করিতে বসিয়াছেন ;
বিবাহের কথা
লইয়া ঠাকুরের
রঙ্গরস
নিকটে শ্রীযুত বলরাম বাবু ও অন্যান্য কয়েকটি
ভক্ত বসিয়া তাঁহার সহিত নানা কথা কহিতেছেন।
সেদিন শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী কামারপুকুরে যাত্রা
করিয়াছেন কয়েক মাসের জন্ত, কারণ ঠাকুরের ভাতুপুত্র
রামলালের বিবাহ।

ঠাকুর—(বলরাম বাবুকে লক্ষ্য করিয়া) আচ্ছা, আবার
বিয়ে কেন হলো বল দেখি ? স্ত্রী আবার কিসের জন্ত হলো ?
পরনের কাপড়ের ঠিক নেই—আবার স্ত্রী কেন ?

বলরাম ঈষৎ হাসিয়া চুপ করিয়া আছেন।

ঠাকুর—ওঃ, বুঝেছি ; (খাল হইতে একটু ব্যঞ্জন তুলিয়া ও
বলরামকে দেখাইয়া) এই—এর জন্তে হয়েছে ! নইলে কে আর
এমন করে বেঁধে দিত বল ? (বলরাম বাবু প্রভৃতি ভক্তগণের
হাস্ত) হাঁ গো, কে আর এমন করে খাওয়াটা দেখত। ওরা সব
আজ চলে গেল—(ভক্তেরা কে চলিয়া গেল বুঝিতে না পারায়)
রামলালের খুড়ী গো ; রামলালের বিয়ে হবে—তাই সব
কামারপুকুরে গেল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলুম, কিছুই মনে হলো
না ! সত্যি বলছি ; যেন কে তো কে গেল ! কিন্তু তারপর
কে বেঁধে দেবে বলে ভাবনা হল ! কি জান ?—সব রকম
খাওয়া তো আর পেটে সয় না, আর সব সময় খাওয়ার হুঁশও
থাকে না। ও (শ্রীশ্রীমা) বোঝে কি রকম খাওয়া সয় ; এটা ওটা
করে দেয় ; তাই মনে হলো—কে ক'রে দেবে !

গুরুভাবের পূর্ববিকাশ

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর একদিন বিবাহের কথা উত্থাপন করিয়া বলেন, “বিয়ে করতে কেন হয় জানিস্? ব্রাহ্মণশরীরের দশ রকম সংস্কার আছে—বিবাহ তারই মধ্যে একটা। দশপ্রকারের সংস্কার পূর্ণ করিবার জন্তই সাধারণ আচার্য্যদিগের বিবাহ করা। ঠাকুরের বিবাহও কি সেজন্ত?—না

ঐ দশ রকম সংস্কার হলে তবে আচার্য্য হওয়া যায়।” আবার কখন কখন বলিতেন, “যে পরমহংস হয়, পূর্ণ জ্ঞানী হয়, সে হাড়ি-মেথরের অবস্থা থেকে রাজা, মহারাজা, সম্রাটের অবস্থা পর্য্যন্ত সব ভুগে দেখে এসেছে। নইলে ঠিক ঠিক বৈরাগ্য আসবে কেন? যেটা দেখে নি (ভোগ করে নি), মন সেইটে দেখতে চাইবে ও চঞ্চল হবে;—বুঝলে? ঘুঁটিটা সব ঘর ঘুরে তবে চিকে উঠে—খেলার সময় দেখনি? সেই রকম।”

সাধারণ গুরুদিগের বিবাহ করিবার ঐরূপ কারণ ঠাকুর নির্দেশ করিলেও, ঠাকুরের নিজের বিবাহের বিশেষ কারণ যাহা আমরা বুঝিতে পারিয়াছি, তাহাই এখন বলিব।

ধর্মান্বিত
ভোগসহারে
ত্যাগে
পৌছাইবার
জন্তই হিন্দুর
বিবাহ

বিবাহটা ভোগের জন্ত নয়—একথা শাস্ত্র আমাদের প্রতি পদে শিক্ষা দিতেছেন। ঈশ্বরের সৃষ্টি-রক্ষারূপ নিয়ম-প্রতিপালন ও গুণবান্ পুত্র উৎপাদন করিয়া সমাজের কল্যাণসাধন করাই হিন্দুর বিবাহরূপ কর্মটার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত—শাস্ত্র বার বার এই কথাই আমাদের বলিয়া দিতেছেন। তবে কি উহাতে তাঁহার নিজ স্বার্থ কিছুমাত্র থাকিবে না—শাস্ত্র এইরূপ অসম্ভব কথা বলেন? না, তাহা নহে। শাস্ত্রকার ঋষিগণ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

দুর্বল মানবচরিত্রের অন্তঃস্বর পর্য্যস্ত দেখিয়াই বুঝিয়াছিলেন যে, দুর্বল মানব স্বার্থ ভিন্ন এ জগতে আর কোন কথাই বুঝে না ; লাভ-লোকমান না খতাইয়া অতি সামান্য কার্যেও অগ্রসর হয় না। শাস্ত্রকার ঐ কথা বুঝিয়াও যে পূর্বোক্ত আদেশ করিয়াছেন তাহার কারণ—তিনি এ কথাও বুঝিয়াছেন যে, ঐ স্বার্থ টাকে যদি একটা মহান উদ্দেশ্যের সহিত সর্বদা জড়িত রাখিতে পারে তবেই মঙ্গল ; নতুবা মানবকে পুনঃ পুনঃ জন্ম-মৃত্যুর বন্ধনে পড়িয়া অশেষ দুঃখভোগ করিতে হইবে। নিজের নিত্য-মুক্ত আত্মস্বরূপ ভুলিয়াই মানব ইন্দ্রিয়দ্বার দিয়া বাহ্যজগতের রূপ-রসাদি ভোগের নিমিত্ত ছুটিতেছে, আর মনে করিতেছে—ঐ সকল বড়ই মধুর, বড়ই মনোরম ! কিন্তু জগতের প্রত্যেক সুখটাই যে দুঃখের সঙ্গে

বিচার-সংযুক্ত
ভোগ করিতে
করিতে কালে
বোধ হয়—
“দুঃখের মুকুট
পরিয়া সুখ
আসে”

চিরসংযুক্ত, সুখটা ভোগ করিতে গেলেই যে সঙ্গে সঙ্গে দুঃখটাও লইতে হইবে—এ কথা কয়টা লোক ধরিতে বা বুঝিতে পারে ? শ্রীযুত বিবেকানন্দ স্বামীজি বলিতেন, “দুঃখের মুকুট মাথায় পরে সুখ এনে মানুষের কাছে দাঁড়ায়,”—মানুষ তখন সুখকে লইয়াই ব্যস্ত ! তাহার মাথায় যে দুঃখের মুকুট,

উহাকে আপনার বলিয়া গ্রহণ করিলে পরিণামে যে দুঃখটাকেও লইতে হইবে—একথা তখন সে আর ভাবিবার অবসর পায় না। শাস্ত্র সেজন্য তাহাকে ঐ কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া বলেন, ‘সুখলাভটাই নিজের স্বার্থ—একথা মনে কর কেন ? সুখ বা দুঃখের একটা লইতে গেলে যে অপরটাকেও লইতে হইবে। স্বার্থটাকে একটু উচ্চ সুরে বাঁধিয়া ভাব না যে, সুখটাও আমার

গুরুভাবের পূর্ববিকাশ

শিক্ষক, দুঃখটাও আমার শিক্ষক; আর যাহাতে ঐ দুয়ের হস্ত হইতে চিরকালের নিমিত্ত পরিভ্রাণ পাওয়া যায়—তাহাই আমার স্বার্থ বা জীবনের উদ্দেশ্য।’ অতএব বুঝা যাইতেছে—বিবাহিত জীবনে বিচারসংযুক্ত ভোগের দ্বারা এবং সুখ-দুঃখপূর্ণ নানা অবশ্যস্বাভাবী অবস্থার অনুভবের দ্বারা ক্ষণভঙ্গুর সংসারের সকল আপাতসুখের উপর বিরক্ত হইয়া যাহাতে জীব ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগে পূর্ণ হয় এবং তাঁহাকেই সারাংশের জানিয়া তাঁহার দর্শন-লাভের দিকে মহোৎসাহে অগ্রসর হয়, ইহা শিক্ষা দেওয়াই শাস্ত্র-কারের উদ্দেশ্য। বিচার করিতে করিতে সংসারের কোনও বিষয়টা ভোগ করিতে যাইলেই যে মন ঐ বিষয় ত্যাগ করিবে একথা নিশ্চিত; এজন্যই ঠাকুর বলিতেন, “ওরে, সদসদ্বিচার চাই।

ভোগসুখ
ত্যাগ করিতে
মনকে কি
ভাবে বুঝাইতে
হয়, তদ্বিষয়ে
ঠাকুরের
উপদেশ

সর্বদা বিচার করে মনকে বলতে হয় যে, মন তুমি এই জিনিষটা ভোগ করবে, এটা খাবে, ওটা পরবে বলে ব্যস্ত হচ্ছ—কিন্তু যে পঞ্চভূতে আলু পটল চাল ডাল ইত্যাদি তৈরী হয়েছে, সেই পঞ্চভূতেই আবার সন্দেশ রসগোল্লা ইত্যাদি তৈরী হয়েছে; যে পঞ্চভূতের হাড়-মাস-রক্ত-মজ্জায় নারীর সুন্দর শরীর হয়েছে, তাতেই আবার তোমার, সকল মানুষের ও গরু ছাগল ভেড়া ইত্যাদি প্রাণীরও শরীর হয়েছে; তবে কেন ওগুলো পাবার জন্য এত হাঁই-ফাঁই কর? ওতে তো আর সচ্চিদানন্দলাভ হবে না! তাতেও যদি না মানে তো বিচার করতে করতে দু-একবার ভোগ করে সেটাকে ত্যাগ করতে হয়। যেমন ধর, রসগোল্লা খাবে বলে মন ভারি ধরেছে,

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

কিছুতেই আর বাগ্ মানচে না—যত বিচার করচ সব যেন ভেসে যাচ্ছে ; তখন কতকগুলো রসগোল্লা এনে এগাল ওগাল করে চিবিয়ে খেতে খেতে মনকে বলবে—‘মন, এরই নাম রসগোল্লা ; এ-ও আলু-পটলের মত পঞ্চভূতের বিকারে তৈরী হয়েছে ; এ-ও খেলে শরীরে গিয়ে রক্ত-মাংস-মল-মূত্র হবে ; যতক্ষণ গালে আছে ততক্ষণই এটা মিষ্টি—গলার নীচে নাব্লে আর ঐ আশ্বাদের কথা মনে থাকবে না ; আবার বেশী খাও তো অসুখ হবে ; এর জন্তু এত লালায়িত হও ! ছিঃ ছিঃ !—এই খেলে, আর খেতে চেও না।’ (সন্ন্যাসী ভক্তদিগকে লক্ষ্য করিয়া) সামান্য সামান্য বিষয়গুলো এই রকম করে বিচারবুদ্ধি নিয়ে ভোগ করে ত্যাগ করা চলে, কিন্তু বড় বড় গুলোতে ও রকম করা চলে না ; ভোগ করতে গেলেই বন্ধনে পড়ে যেতে হয় । সে জন্তু বড় বড় বাসনা-গুলোকে বিচার করে, তাতে দোষ দেখে, মন থেকে তাড়াতে হয় ।”

শাস্ত্র বিবাহের ঐরূপ উচ্চ উদ্দেশ্য উপদেশ করিলেও কয়টা লোকের মনে সে কথা আজকাল স্থান পায় ? কয়জন বিবাহিত

বিবাহিত জীবনে যথাসাধ্য ব্রহ্মচর্য পালন করিয়া আপনা-
 জীবনে ব্রহ্মচর্য দিগকে এবং জনসমাজকে ধন্য করিয়া থাকেন ?
 পালন করিবার কয়জন স্ত্রী স্বামীর পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে লোক-
 প্রথার উচ্ছেদ হিতকর উচ্চব্রতে—ঈশ্বরলাভের কথা দূরে থাকুক
 হওয়াতেই—প্রেরণা দিয়া থাকেন ? কয়জন পুরুষই বা
 হিন্দুর বর্তমান ‘ত্যাগই জীবনের উদ্দেশ্য’ জানিয়া স্ত্রীকে তাহা শিক্ষা
 জাতীয় দিয়া থাকেন ? হায় ভারত ! পাশ্চাত্যের ভোগ-
 অবনতি সর্বস্ব জড়বাদ ধীরে ধীরে তোমার অস্থি-মজ্জায় প্রবিষ্ট হইয়া

গুরুভাবের পূর্ববিকাশ

তোমাকে কি মেরুদণ্ডহীন পশুবিশেষে পরিণত করিয়াছে তাহা একবার ভাবিয়া দেখ দেখি! সাধে কি আর শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহার সন্ন্যাসি-ভক্তদিগকে বর্তমান বিবাহিত জীবনে দোষ দেখাইয়া বলিতেন, “ওরে, (ভোগটাকে সর্কস্ব বা জীবনের উদ্দেশ্য করাই যদি দোষ হয়, তবে বিবাহের সময়) একটা ফুল ফেলে সেটা করলেই কি শুদ্ধ হয়ে গেল—তার দোষ কেটে গেল ?” বাস্তবিক বিবাহিত জীবনে ইন্দ্রিয়পরতা আর কখনও ভারতে এত প্রবল হইয়াছিল কি না সন্দেহ। ইন্দ্রিয়-পরিতৃষ্ণি ভিন্ন বিবাহের যে অপর একটা মহাপবিত্র, মহোচ্চ উদ্দেশ্য আছে—এ কথা আমরা আজকাল একপ্রকার ভুলিয়াই গিয়াছি, আর দিন দিন ঐ কারণে পশুরও অধম হইতে বসিয়াছি! নব্য ভারত-ভারতীর ঐ পশুত্ব ঘুচাইবার জন্তই লোকগুরু ঠাকুরের বিবাহ। তাঁহার জীবনের সকল কার্যের গায় বিবাহরূপ কাষাটাও লোক-কল্যাণের নিমিত্ত অনুষ্ঠিত।

ঠাকুর বলিতেন, “এখানকার যা কিছু করা সে তোদের জন্ত। ওরে, আমি ষোল টাং করলে তবে যদি তোরা এক টাং করিস্। নিজে অনুষ্ঠান আর, আমি যদি দাঁড়িয়ে মূর্তি তো তোরা শালায়া করিয়া পাক্ দিয়ে দিয়ে তাই কর্ণি।” এই জন্তই ঠাকুরের দেখাইয়া বিবাহিত জীবনের কর্তব্য ঘাড়ে লইয়া মহোচ্চ ঐ আদর্শ আদর্শসকলের চক্ষুর সন্মুখে অনুষ্ঠান করিয়া পুনরায় আদর্শসকলের চক্ষুর সন্মুখে অনুষ্ঠান করিয়া প্রচলনের দেখান। ঠাকুর যদি স্বয়ং বিবাহ না করিতেন জন্তই ঠাকুরের তাহা হইলে গৃহস্থ মানব বলিত, “বিবাহ তো বিবাহ করেন নাই, তাই অত ব্রহ্মচর্যের কথা বলা চলিতেছে। স্ত্রীকে

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

আপনার করিয়া এক সঙ্গে একত্র তো বাস কখন করেন নাই, তাই আমাদের উপর লক্ষ্য লক্ষ্য উপদেশ দেওয়া চলিতেছে।’ সে জগুই ঠাকুর শুধু যে বিবাহ করিয়াছিলেন মাত্র তাহা নহে, শ্রীশ্রীজগন্নাথার পূর্ণদর্শনলাভের পর যখন দিব্যান্বাদাবস্থা তাঁহার সহজ হইয়া গেল, তখন পূর্ণযৌবনা বিবাহিতা স্ত্রীকে দক্ষিণেশ্বরে নিজ সমীপে আনাইয়া রাখিলেন, তাঁহাতে জগদম্বার আবির্ভাব সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহাকে শ্রীশ্রীষোড়শী মহাবিদ্যাঙ্কানে পূজা ও আত্মনিবেদন করিলেন, আটমাস কাল নিরন্তর একত্র বাস ও তাঁহার সহিত এক শয্যায় শয়ন পর্য্যন্ত করিলেন এবং স্ত্রীর শিক্ষা এবং প্রাণের শাস্তি ও আনন্দের জন্য অতঃপর কামারপুকুরে এবং কখন কখন শ্বেতুরালয় জয়রামবাটীতেও স্বয়ং যাইয়া দুই-এক মাস কাল অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। দক্ষিণেশ্বরে যখন ঠাকুর স্ত্রীর সহিত এইরূপে একত্র বাস করেন, তখনকার কথা স্মরণ করিয়া শ্রীশ্রীমা এখনও স্ত্রী-ভক্তদিগকে বলিয়া থাকেন, “সে যে কি অপূর্ব দিব্যভাবে থাকতেন, তাহা বলে বোঝাবার নয়! কখন ভাবের ঘোরে কত কি কথা, কখন স্ত্রীর সহিত ঠাকুরের শরীর-হাসি, কখন কান্না, কখন একেবারে সমাধিতে স্থির সঙ্গ-রহিত হয়ে যাওয়া—এই রকম, সমস্ত রাত! সে কি এক অদৃষ্টপূর্ব আবির্ভাব আবেশ, দেখে ভয়ে আমার সর্বশরীর প্রেমসম্বন্ধ। কাপ্ত, আর ভাবতুম কখন রাতটা পোহাবে! ভাবসমাধির কথা তখন তো কিছু বুঝি না; এক দিন তাঁর আর সমাধি ভাঙ্গে না দেখে ভয়ে কেঁদে কেটে হৃদয়কে ডেকে পাঠালুম। সে এসে কানে নাম শুনাতে শুনাতে তবে

গুরুভাবের পূর্ববিকাশ

কতক্ষণ পরে তাঁর চৈতন্য হয়! তারপর ঐরূপে ভয়ে কষ্ট পাই দেখে তিনি নিজে শিখিয়ে দিলেন—এই রকম ভাব দেখলে এই নাম শুনাবে, এই রকম ভাব দেখলে এই বীজ শুনাবে। তখন আর তত ভয় হত না, ঐ সব শুনালেই তাঁর আবার হাঁশ হত। তারপর অনেকদিন এইরূপে গেলেও, কখন তাঁর কি ভাবসমাধি হবে বলে সারা রাত্তির জেগে থাকি ও ঘুমুতে পারি না—একথা একদিন জানতে পেরে, নহবতে আলাদা শুতে বললেন!” পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমা বলেন, এইরূপে প্রদীপে শলতেটি কি ভাবে রাখিতে হইবে, বাড়ীর প্রত্যেকে কে কেমন লোক ও কাহার সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে, অপরের বাড়ী যাইয়া কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে প্রভৃতি সংসারের সকল কথা হইতে ভজন, কীর্তন, ধ্যান, সমাধি ও ব্রহ্মজ্ঞানের কথা পর্য্যন্ত সকল বিষয় ঠাকুর তাঁহাকে শিক্ষা দিয়াছেন।—হে গৃহী মানব, কয়জন তোমরা এই ভাবে নিজ নিজ স্ত্রীকে শিক্ষা দিয়া থাক? তুচ্ছ শরীরসম্বন্ধটা যদি আজ হইতে কোন কারণে উঠিয়া যায়, তাহা হইলে কয় জন তোমরা স্ত্রীকে ঐরূপে মাগু, ভক্তি ও নিঃস্বার্থ ভালবাসা আজীবন দিতে পার? সেই জগুই বলি, এ অপূর্ব যুগাবতারের বিবাহ গৃহী মানবের করিয়া, একদিনের জগুও শরীর-সম্বন্ধ না শিক্ষার জগুই পাতাইয়া, স্ত্রীর সহিত এই অদ্ভুত, অদৃষ্টপূর্ব প্রেম-ঠাকুরের ঐরূপ লীলার বিস্তার কেবল তোমারই জগু। তুমিই শিখিতে পারিবে বলিয়া যে—ইন্দ্রিয়পরতা ভিন্ন বিবাহের অপর মহোচ্চ উদ্দেশ্য আছে এবং এই উচ্চ আদর্শে

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

লক্ষ্য স্থির রাখিয়া যাহাতে তুমিও বিবাহিত জীবনে ব্রহ্মচর্যের যথাসাধ্য অনুষ্ঠান করিয়া স্ত্রী-পুরুষে ধন্য হইতে পার এবং মহা মেধাবী, মহা তেজস্বী, গুণবান্ সন্তানের পিতা-মাতা হইয়া ভারতের বর্তমান হীনবীর্য্য, হতশ্রী, হতশক্তিক সমাজকে ধন্য করিতে পার, সেইজন্য । শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, যীশু, শ্রীশঙ্কর, শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি রূপে পূর্ব পূর্ব যুগে যে লীলা লোকগুরুদিগের জগৎকে দেখাইবার প্রয়োজন হয় নাই, তাহাই এই যুগে তোমার প্রয়োজনের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ-শরীরে প্রদর্শিত হইয়াছে । আজীবন-ব্যাপী কঠোর তপস্যা ও সাধনাবলে উদ্বাহবন্ধনের অদৃষ্টপূর্ব্ব পবিত্র ‘ছাঁচ’ জগতে এই প্রথম প্রস্তুত হইয়াছে । এখন, ঠাকুর যেমন বলিতেন—তোমরা নিজ নিজ জীবন সেই আদর্শ ছাঁচে ফেল, আর নূতনভাবে গঠিত করিয়া তোল ।

‘কিন্তু’—গৃহমেধিমানব এখনও বলিতেছে—‘কিন্তু—’ ! ওঃ,

ঠাকুরের আদর্শ বিবাহিত জীবন গঠন করিতে এবং অন্ততঃ আংশিক- ভাবেও ব্রহ্মচর্য পালন করিতে হইবে । নতুবা আমাদের কল্যাণ নাই	বুঝিয়াছি এবং শ্রীশ্রী বিবেকানন্দ আমাদের সাধন-ভজন সম্বন্ধে যেমন বলিতেন তাহাই তদুত্তরে বলিতেছি, “তোরা মনে করেছিস্ বুঝি প্রত্যেকে এক একটা রামকৃষ্ণ পরমহংস হবি? সে নয় মণ তেলও পুড়বে না, রাধাও নাচবে না । রামকৃষ্ণ পরমহংস জগতে একটাই হয়—বনে একটা সিঙ্গিই (সিংহ) থাকে ।” হে গৃহী মানব, আমরাও তোমার ‘কিন্তু’-র উত্তরে সেইরূপ বলিতেছি—ঠাকুরের ন্যায় স্ত্রীর সহিত বাস করিয়া একেবারে অথগু ব্রহ্মচর্য্য রাখা তোমার যে সাধ্যাতীত তাহা
--	--

গুরুভাবের পূর্ববিকাশ

ঠাকুর বিলক্ষণ জানিতেন এবং জানিয়াও যে ঐরূপ করিয়া তোমায় দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহা কেবল তুমি অন্ততঃ 'এক টাং' বা আংশিকভাবে উহার অনুষ্ঠান করিবে বলিয়া। কিন্তু জানিও, ঐ উচ্চ আদর্শের অনুষ্ঠান করিয়া যদি তুমি স্ত্রীজাতিকে জগদম্বার সাক্ষাৎ প্রতিক্রম বলিয়া না দেখিতে এবং হৃদয়ের যথাসাধ্য নিঃস্বার্থ ভালবাসা না দিতে চেষ্টা কর, জগতের মাতৃস্থানীয়া স্ত্রীমূর্তিসকলকে তোমার ভোগমাত্রেকসহায়্যা পরাধীনা দাসী বলিয়া ভাবিয়া চিরকাল পশুভাবেই দেখিতে থাক, তবে তোমার আর গতি নাই; তোমার বিনাশ হ্রব এবং অতি নিকটে। শ্রীকৃষ্ণের কথা উপেক্ষা করিয়া যদুবংশের কি হইল, তাহা ভাবিও, ঈশার কথা উপেক্ষা করিয়া য্যাছদী জাতিটার কি দুর্দশা, তাহা স্মরণ রাখিও। যুগাবতারকে উপেক্ষা করা সর্ব-কালেই জাতিসকলের ধ্বংসের কারণ হইয়াছে।

আর একটি প্রশ্নের এখানে উত্তর দিয়াই আমরা উদ্বাহবন্ধনের ভিতর দিয়া ঠাকুরের গুরুভাবের অদৃষ্টপূর্ব বিকাশের কথা সাজ

করিয়া ঐ বিষয়ের অপর কথাসকল বলিব।

বিবাহ করিয়া
ঠাকুরের শরীর-
সম্বন্ধ সম্পূর্ণ
রহিত হইয়া
থাকা সম্বন্ধে
কয়েকটি
আপত্তি ও
তাহার খণ্ডন

রূপ-রসাদি বিষয়ের দাস, বহিস্মুখ মানবমনে এখনও

নিশ্চিত উদয় হইতেছে যে, ঠাকুর যদি বিবাহই

করিলেন, তবে একটিও অন্ততঃ সস্তানোৎপাদন

করিয়া স্ত্রীর সহিত শরীরসম্বন্ধ ত্যাগ করিলে

ভাল হইত। ঐরূপ করিলে বোধ হয় ভগবানের

সৃষ্টিরক্ষা করাটা যে মানুষমাত্রেই কর্তব্য, তাহা

দেখান হইত এবং সঙ্গে সঙ্গে শাস্ত্রমর্যাদাটাও রক্ষা পাইত।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

পূজা করে, তাহা হইলে নিশ্চয় বুঝা যায়, সে লোকটা বাহিরে যে আদর্শ দেখায় তাহাতে কিছুমাত্র ভেল নাই। ঠাকুরের সম্বন্ধে সেজন্য ঐ কথা যত নিশ্চয় করিয়া আমরা বলিতে পারি, এমন আর কাহারও সম্বন্ধে নহে। পরিণীতা পত্নীর সহিত ঠাকুরের অপূর্ব প্রেমলীলার অনেক কথা বলিবার থাকিলেও, ইহা তাহার স্থান নহে। সেজন্য এখানে ঐ বিষয়ের ভিতর দিয়া ঠাকুরের অদ্ভুত গুরুভাব-বিকাশের কথঞ্চিৎ আভাসমাত্র দিয়াই আমরা কান্ত রহিলাম।

পঞ্চম অধ্যায়

যৌবনে গুরুভাব

নাহং প্রকাশঃ সৰ্বশ্চ যোগমায়াসমাবৃতঃ ।

মুঢ়োহয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্ ॥—গীতা, ৭।২৫

ঠাকুরের জীবনে গুরুভাবের বিশেষ বিকাশ আরম্ভ হয়
যেদিন হইতে তিনি দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীজগদম্বার
পূজায় ব্রতী হইয়া তথায় অবস্থান করিতে থাকেন ।
গুরু ও নেতা
হওয়া মানবের
ইচ্ছাধীন নহে
ঠাকুরের তখন সাধনার কাল—ঈশ্বরপ্রেমে
উন্মাদাবস্থা । কিন্তু হইলে কি হয় ? যিনি গুরু,
তিনি চিরকালই গুরু—যিনি নেতা, তিনি বাল্যকাল হইতেই
নেতা । লোকে কমিটি করিয়া পরামর্শ আটিয়া যে তাঁহাকে গুরু
বা নেতার আসন ছাড়িয়া দেয়, তাহা নহে । তিনি যেমন আসিয়া
লোকসমাজে দণ্ডায়মান হন, অমনি মানবসাধারণের মন তাঁহার
প্রতি ভক্তিপূর্ণ হয় ; অমনি নতশিরে তাহারা তাঁহার নিকট
শিক্ষাগ্রহণ ও তাঁহার আজ্ঞাপালন করিতে থাকে—ইহাই
নিয়ম । স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন, মানুষ মানুষকে যে নেতা
বা গুরু করিয়া তোলে, তাহা নহে ; ষাঁহারা গুরু বা নেতা হন,
তাঁহারা ঐ অধিকার লইয়াই জন্মগ্রহণ করেন । 'A leader is
always born and never created.'—সেজন্য দেখা যায়,

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

অপর সাধারণে যে সকল কাজ করিলে সমাজ চটিয়া দণ্ডবিধান করে, লোকগুরুরা সেই সকল কাজ করিলেও অবনতশিরে তাঁহাদের পদানুসরণ করিয়া থাকে। গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ঐ সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

‘স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকজননুবর্ততে।’

—তিনি যাহা কিছু করেন, তাহাই সংকার্যের প্রমাণ বা পরিমাপক হইয়া দাঁড়ায় এবং লোকে তদ্রূপ আচরণই তদবধি করিতে থাকে। বড়ই আশ্চর্যের কথা, কিন্তু বাস্তবিকই ঐরূপ চিরকাল হইয়া আসিয়াছে এবং পরেও হইতে থাকিবে। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, ‘আজ হইতে ইন্দ্রের পূজা বন্ধ হইয়া গোবর্ধনের পূজা হইতে থাকুক’—লোকে তাহাই করিতে লাগিল! বুদ্ধ বলিলেন, ‘আজ হইতে পশুহিংসা বন্ধ হউক,’ অমনি ‘যজ্ঞে হনন করিবার জগুই পশুগণের সৃষ্টি,’ ‘যজ্ঞার্থে পশবো সৃষ্টাঃ’রূপ নিয়মটি সমাজ পাল্টাইয়া বাঁধিল! যীশু মহাপবিত্র উপবাসের দিনে শিষ্যদিগকে ভোজন করিতে অনুমতি দিলেন—তাহাই নিয়ম হইয়া দাঁড়াইল! মহম্মদ বহু বিবাহ করিলেন, তবুও লোকে তাঁহাকে ধর্মবীর, ত্যাগী ও নেতা বলিয়া মাগু করিতে থাকিল! সামান্য বা মহৎ সকল বিষয়েই ঐরূপ—তাঁহারা যাহা বলেন ও করেন, তাহাই সদাচরণের আদর্শ।

কেন যে ঐরূপ হয় তাহাও ইতিপূর্বে আমরা বলিয়াছি—লোকগুরুদিগের ক্ষুদ্র স্বার্থপর ‘আমি’টা চিরকালের মত একেবারে বিনষ্ট হইয়া তাহার স্থলে বিরাটভাবমুখী ‘আমিত্ব’টার বিকাশ আসিয়া উপস্থিত হয়। সে ‘আমি’টার দশের কল্যাণ-খোঁজাই

যৌবনে গুরুভাব

স্বভাব। আর, ফুল ফুটিলে ভ্রমর যেমন আপনিই জানিতে পারিয়া মধুলোভে তথায় আসিয়া উপস্থিত হয়, ফুলকে আর ভ্রমরের নিকট সাদর নিমন্ত্রণ পাঠাইতে হয় না, সেইরূপ যেমনি কাহারও ভিতর ঐ বিরাট 'আমি'টার বিকাশ হয়, অমনি সংসারে তাপিত লোকসকল আপনিই তাহা কেমন করিয়া জানিতে পারিয়া শান্তিলাভের নিমিত্ত ছুটিয়া আসে। সাধারণ মানবের ভিতর ঐ বিরাট 'আমি'টার একটু আধটু ছিটে-ফোটার মত বিকাশ অনেক কষ্টে আসিয়া উপস্থিত হয়; কিন্তু লোকগুরুদিগের জীবনে বাল্য

হইতেই উহার কিছু না কিছু বিকাশ, যৌবনে অধিকতর প্রকাশ এবং পরিশেষে পূর্ণ প্রকাশে অদ্ভুত লীলাসকল দেখিয়া আমরা স্তম্ভিত হইয়া ঈশ্বরের সহিত তাঁহাদিগকে একেবারে অপৃথকভাবে দেখিতে থাকি। কারণ তখন ঐ অমানুষ-ভাবপ্রকাশ তাঁহাদের এত সহজ হইয়া দাঁড়ায় যে, উহা খাওয়া-পরা, চলা-ফেরা, নিঃশ্বাস-ফেলার মত একটা সাধারণ নিত্যকর্মের মধ্যে হইয়া দাঁড়ায়। কাজেই সাধারণ মানুষ আর কি করিবে?—দেখে যে, তাহার ক্ষুদ্র স্বার্থের মাপকাঠি দ্বারা তাঁহাদের দেবচরিত্র মাপা চলে না এবং তজ্জন্য কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া তাঁহাদের দেবতাজ্ঞানে ভক্তি-বিশ্বাস ও শরণগ্রহণ করে।

ঠাকুরের জীবনালোচনায়ও আমরা ঐরূপ দেখিতে পাই— যৌবনে সাধকাবস্থায় দিনের পর দিন ঐ ভাবের ক্রমে ক্রমে বিকাশ হইতে হইতে দ্বাদশ বৎসর কঠোর সাধনাস্তে ঐ ভাবের

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

পূর্ণ প্রকাশ হইয়া উহা একেবারে সহজ হইয়া দাঁড়ায় ।
তখন কখন যে তিনি কোন্ 'আমি'-বুদ্ধিতে
ঠাকুরের জীবনে গুরুভাবের পূর্ণ-
বিকাশ হইয়া তাঁহার সহায়ের গুরুভাবাবেশ হইল, তাহা অনেক
সময়ে সাধারণ মানব-মনবুদ্ধির গোচর হইত না ।
কিন্তু ওটা ঐ ভাবের পূর্ণ পরিণত অবস্থার কথা
এবং যেখানকার কথা সেইখানেই উহার বিশেষ
পরিচয় পাওয়া যাইবে ; এখন, যৌবনে সাধকবস্থায় ঐ ভাবে
আত্মহারা হইয়া তিনি অনেক সময়ে যেরূপ আচরণ করিতেন,
তাহারই কিছু পাঠককে অগ্রে বলা আবশ্যিক ।

যৌবনে ঠাকুরের গুরুভাবের প্রথম বিকাশ দেখিতে পাই
দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীর প্রতিষ্ঠাত্রী রাণী রাসমণি ও তাঁহার
জামাতা মথুরানাথ বা মথুরবাবুকে লইয়া । অবশ্য
সাধনকালে ঐ ইহাদের দুইজনের কাহাকেও দেখা আমাদের
ভাব—রাণী কাহারও ভাগ্যে হয় নাই । তবে ঠাকুরের নিজ
রাসমণি ও কাহারও ভাগ্যে হয় নাই । তবে ঠাকুরের নিজ
তদীয় জামাতা মুখ হইতে যাহা শুনিয়াছি, তাহাতে বেশ বুঝা যায়
মথুরের সহিত যে, প্রথম দর্শনেই ইহাদের মনে ঠাকুরের প্রতি
ব্যবহারে একটা ভালবাসার উদয় হইয়া ক্রমে ক্রমে উহা
এতই গভীরভাব ধারণ করে যে, এরূপ আর কুত্রাপি দেখা যায় না ।
মানুষকে মানুষ যে এতটা ভক্তি-বিশ্বাস করিতে, এতটা ভালবাসিতে
পারে, তাহা আমাদের অনেকের মনে বোধ হয় ধারণা না হইয়া
একটা রূপকথার মত মনে হইবে । অথচ উপর উপর দেখিলে
ঠাকুর তখন একজন সামান্য নগণ্য পূজক ব্রাহ্মণমাত্র এবং তাঁহার

যৌবনে গুরুভাব

সমাজে জাত্যাংশে বড় না হইলেও ধনে, মানে, বিদ্যায় ও বুদ্ধিতে সমাজের অগ্রণী বলিলে চলে ।

আবার এদিকে ঠাকুরের স্বভাবও বাল্যাবধি অতি বিচিত্র ।
ধন, মান, বিদ্যা, বুদ্ধি, নামের শেষে বড় বড় উপাধি প্রভৃতি যে

সকল লইয়া লোকে লোককে বড় বলিয়া গণ্য
ঠাকুরের অপূর্ব
করে, তাঁহার গণনায়, তাঁহার চক্ষে ওগুলো
স্বভাব

চিরকালই ধর্তব্যের মধ্যে বড় একটা ছিল না ।

ঠাকুর বলিতেন, “মনুমেণ্টে উঠে দেখলে তিনতলা চারতলা
বাড়ী, উঁচু উঁচু গাছ ও জমির ঘাস, সব এক সমান হয়ে গেছে
দেখায়” ; আমরাও দেখি, ঠাকুরের নিজের মন বাল্যাবধি সত্য-
নিষ্ঠা ও ঈশ্বরানুরাগ সহায়ে সর্বদা এত উচ্চে উঠিয়া থাকিত যে
সেখান হইতে ধন-মান-বিদ্যাতির একটু আধটু তারতম্য—যাহা
লইয়া আমরা একেবারে ফুলিয়া ফাটিয়া যাইবার মত হই ও
‘ধরাকে সরা জ্ঞান’ করি—সব এক সমান দেখা যাইত । অথবা
ঠাকুরের মন চিরকাল প্রত্যেক কার্যটা কেন করিব ও প্রত্যেক
ব্যক্তি ও পদার্থের সহিত সম্বন্ধের চরম পরিণতিতে কি কতদূর
দাঁড়াইবে—তাহা ভাবিয়া অপরের ঐ ঐ বিষয়ে কিরূপ বা অবস্থা
দাঁড়াইয়াছে তাহা দেখিয়া একটা বন্ধমূল ধারণায় পূর্ব হইতেই
উপস্থিত হইত । কাজেই ঐ সকল বিষয় যে, উদ্দেশ্য ও চরম-
পরিণতি লুকাইয়া মধুর ছদ্মবেশে তাঁহাকে ভুলাইয়া অন্ততঃ কিছু-
কালের জগুও মিছামিছি ঘুরাইবে, তাহার কোনও পথই ছিল না ।
পাঠক বলিবে—‘কিন্তু ওরূপ বুদ্ধিতে সকল বিষয়ের দোষগুলিই
তো আগে চক্ষে পড়িয়া মানুষকে জড়ভাবাপন্ন করিয়া তুলিবে,

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

জগতের কোন কার্য করিতেই আর অগ্রসর হইতে দিবে না।’
বাস্তবিকই তাহা। মন যদি পূর্ব হইতে বাসনাশূন্য বা পবিত্র না
হইয়া থাকে এবং ঈশ্বরলাভরূপ মহৎ উদ্দেশ্যে যদি উহার গোড়া
বাঁধা না থাকে, তাহা হইলে ঐরূপ বুদ্ধি বাস্তবিকই মানবকে
কিংকর্তব্যবিমূঢ় করিয়া উত্তমরহিত এবং কখন কখন উচ্ছৃঙ্খল ও
যথেচ্ছাচারী করিয়া তুলে। নতুবা পবিত্রতা ও উচ্চ লক্ষ্যে যদি
মনের সুর চড়াইয়া বাঁধা থাকে, তাহা হইলে ঐরূপ সকল
বিষয়ের অস্তুস্তলস্পর্শী দোষদর্শী বুদ্ধিই মানবকে ঈশ্বরদর্শনের
পথে দ্রুতপদে অগ্রসর করাইয়া দেয়। গীতাতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ
ঐজন্ম শ্রদ্ধাভক্তিসম্পন্ন মানবকেই সর্বদা সংসারে ‘জন্ম-মৃত্যু-জরা-
ব্যাধি-দুঃখ-দোষানুদর্শন’ করিয়া বৈরাগ্যবান হইতে বলিয়াছেন।
ঠাকুরের চরিত্রে বাল্যাবধি ঐ দোষদৃষ্টি কতদূর পরিস্ফুট
তা দেখ ;—লেখা-পড়া করিতে গিয়া কোথায় ‘তর্কালঙ্কার’,
‘বিজ্ঞাবাগীশ’ প্রভৃতি উপাধি ও নাম-যশের দিকে দৃষ্টি পড়িবে,
তাহা না হইয়া দেখিতে পাইলেন, বড় বড় ‘তর্কবাগীশ’, ‘গায়চুঞ্চু’
মহাশয়দের গায়-বেদান্তের লম্বা লম্বা কথা আওড়াইয়া ধনী
দ্বারে খোশামুদি করিয়া ‘চাল কলা বাঁধা’ বা জীবিকার সংস্থান
করা! বিবাহ করিতে যাইয়া কোথায় সংসারের ভোগসুখ
আমোদ-প্রমোদের দিকে নজর পড়িবে, তাহা না হইয়া দেখিলেন
ছুদিনের সুখের নিমিত্ত চিরকালের মত বন্ধন গলায় পরা, অভাব-
বুদ্ধি করিয়া টাকার চিন্তায় ছুটাছুটি করিয়া বেড়ান ও সেই দুই
দিনের সুখেরও অনিশ্চয়তা। টাকাতে সংসারে সব করিতে ও
সব হইতে পারা যায় দেখিয়া কোথায় কোমর বাঁধিয়া রোজগারে

যৌবনে গুরুভাব

লাগিয়া যাইবেন,—না, দেখিলেন টাকাতে কেবল ডাত, ডাল, কাপড় ও ইট, মাটি, কাঠ-লাভই হইতে পারে, কিন্তু ঈশ্বরলাভ হয় না। সংসারে গরীব-দুঃখীর প্রতি দয়া করিয়া পরের দুঃখমোচন করিয়া ‘দাতা’ ‘পরোপকারী’ ইত্যাদি নাম কিনিবেন—না, দেখিলেন আজীবন চেষ্টার ফলে বড় জোর দু’চারটে ফ্রী-স্কুল ও দু’চারটে দাতব্য ডাক্তারখানা, না হয় দু’চারটে অতিথিশালা স্থাপন করা যায় ; তারপর মৃত্যু। জগতের যেমন অভাব ছিল, তেমনিই থাকিল !—এইরূপ সকল বিষয়ে।

ঐরূপ স্বভাবাপন্ন ঠাকুরকে কাজেই ঠিক ঠিক ধরা বা বুঝা সাধারণ মানবের বড়ই কঠিন, বিশেষতঃ আবার বিদ্যাভিমাত্রী ধনী ও পণ্ডিতদের ও ধনীদের ; কারণ স্পষ্ট কথা সংসারে কাহারও ঠাকুরকে নিকট গুণিতে না পাইয়া লোকমান্ত ও ধনমতে চিনিতে পারা কঠিন। শুনিবার ক্ষমতাটি পর্য্যস্ত তাঁহারা অনেকস্থলে উহার কারণ হারাইয়া বসেন। কাজেই তাঁহারা ঠাকুরকে অনেক সময় না বুঝিতে পারিয়া যে অসভ্য, পাগল বা অহঙ্কারী মনে করিবেন, ইহা বিচিত্র নহে। সেজন্যই রাণী রাসমণি ও মথুর বাবুর ভক্তি-ভালবাসা দেখিয়া আরও অবাক হইতে হয়। মনে হয়, ঈশ্বররূপায় মহাভাগ্যোদয় হইয়াছিল বলিয়াই তাঁহারা ঠাকুরের উপর ভালবাসা শুধু যে অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিয়াছিলেন তাহা নহে, কিন্তু তাঁহার দিব্য গুরুভাবের পরিচয় দিন দিন প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার শ্রীচরণে সর্বতোভাবে আত্মবিক্রয়ে সমর্থ হইয়াছিলেন। নতুবা, যে ঠাকুর কালীবাটী-প্রতিষ্ঠার দিনে আপনার অগ্রজ পূজায় ব্রতী হইলে এবং শ্রীশ্রীজগদম্বার প্রসাদ ভোজন

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

করিলেও শূদ্রের ভোজন করিতে হইবে বলিয়া তথায় উপবাস করিয়াছিলেন এবং পরেও কিছুকাল পর্যন্ত ঐ নিমিত্ত কালীবাটীর গঙ্গাতীরে বহুসং পাক করিয়া খাইয়াছিলেন, যে ঠাকুর মথুর বাবু বার বার ডাকিলেও বিষয়ী লোক বলিয়া তাঁহার সহিত আলাপ করিতে কুণ্ঠিত হইয়াছিলেন এবং পরে মা কালীর পূজায় ব্রতী হইবার জন্য তাঁহার সাদর অনুরোধ বার বার প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন, অভিমান এবং ধনমদ ত্যাগ করিয়া সেই ঠাকুরকে প্রথম হইতে ভালবাসা এবং বরাবর ঐ ভাব ঠিক রাখা রানী রামমণি ও মথুর বাবুর সহজ হইত না।

ঠাকুরের তখন বিবাহ হইয়া গিয়াছে—পূর্ণ যৌবন। বিবাহ

বিবাহের পর

ঠাকুরের

অবস্থা।

মথুরের উহা

লক্ষ্য করিয়া

ক্রমশঃ তাঁহার

প্রতি আকৃষ্ট

হওয়া। অপর

সাধারণের

ঠাকুরের বিষয়ে

মতামত

করিয়া দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাগমন করিয়াছেন এবং

মা-কালীর পূজায় ব্রতী হইয়াছেন; পূজায় ব্রতী

হইয়াই আবার ঈশ্বরপ্রেমে পাগলের মত হইয়াছেন।

ঈশ্বরলাভ হইল না বলিয়া কখন কখন ভূমিতে

গড়াগড়ি দিয়া মুখ ঘসড়াইয়া ‘মা’ ‘মা’ বলিয়া এত

ক্রন্দন করেন যে, লোক দাঁড়াইয়া যায়! লোকে

ব্যথিত হইয়া বলাবলি করে, ‘আহা, লোকটির কোন

উৎকট রোগ হইয়াছে নিশ্চয়; পেটের শূলব্যথায়

মানুষকে অমনি অস্থির করে।’ কখন বা পূজার

সময় যত ফুল নিজের মাথায় চাপাইয়া নিষ্পন্দ হইয়া যান। কখন

বা সাধকদিগের পদাবলী উন্নতভাবে কতক্ষণ ধরিয়া গাহিতে

থাকেন। নতুবা যখন কতকটাও সাধারণভাবে থাকেন তখন

যাহার সহিত যেমন ব্যবহার করা উচিত, যাহাকে যেমন মান

যৌবনে গুরুভাব

দেওয়া রীতি, সে সমস্ত পূর্বের গায়ই করেন। কিন্তু জগন্নাথার ধ্যানে যখন ঐরূপ ভাবাবেশ হয়—এবং সে ভাবাবেশ যে, দিনের ভিতর এক আধবার একটু আধটু হইত, তাহা নহে—তখন ঠাকুরের আর কোন ঠিক-ঠিকানাই থাকে না, কাহারও কোন কথা শুনে না বা উত্তর দেন না। কিন্তু তখনও সে দেবচরিত্রের মাধুর্যের অনেক সময় লোকে পরিচয় পায়; তখনও যদি কেহ বলে, ‘মা-র নাম ছুটো শুনাও না’—অমনি ঠাকুর তাহার প্রীতির জন্ত মধুর কণ্ঠে গান ধরেন এবং গাহিতে গাহিতে গানের ভাবে নিজে বিভোর হইয়া আত্মহারা হন।

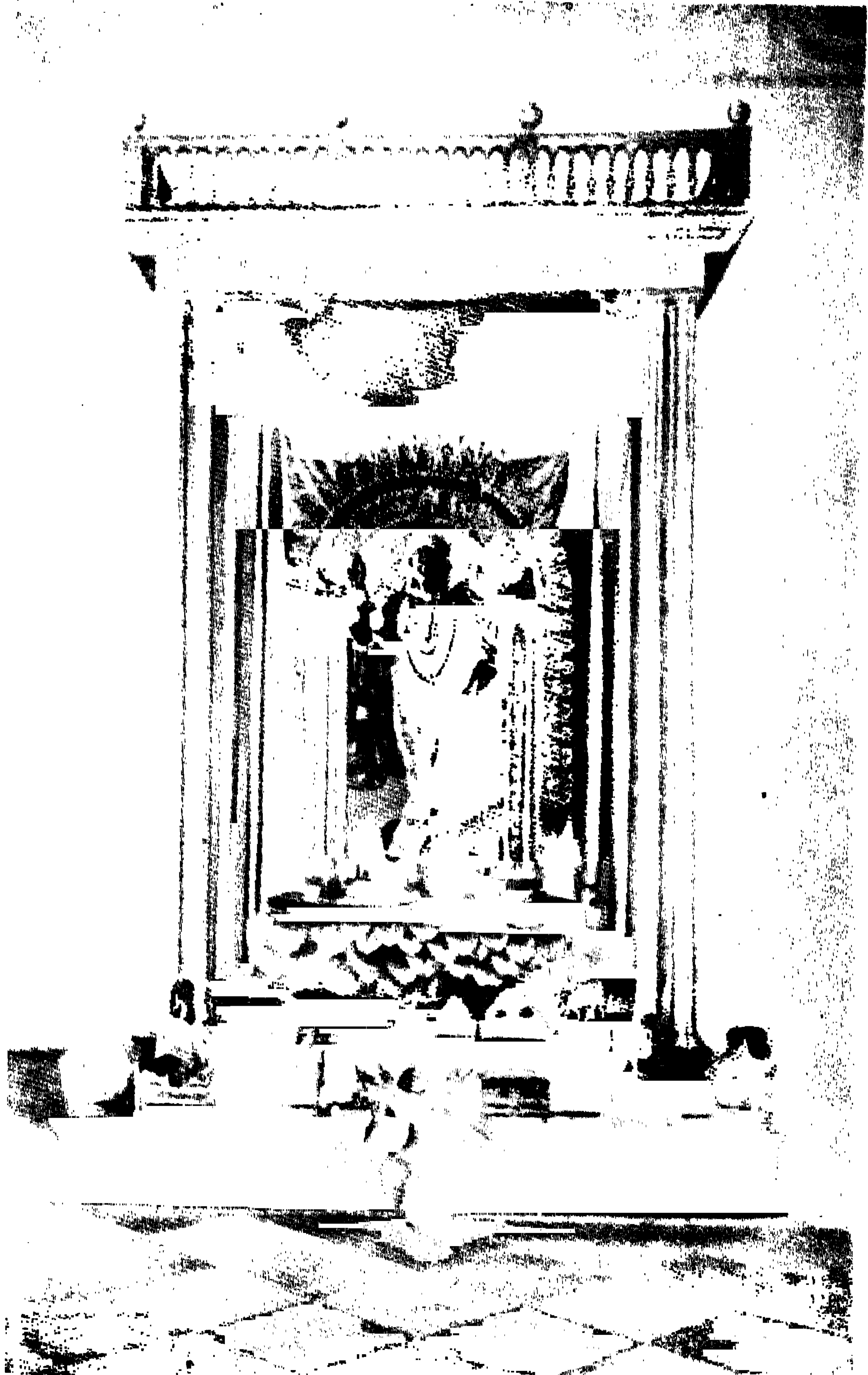
ইতিপূর্বেই রাণী রাসমণি ও মথুরবাবুর কর্ণে হীনবুদ্ধি নিম্ন-পদস্থ কর্মচারিগণ এবং ঠাকুরবাড়ীর প্রধান কর্মচারী খাজাঞ্চী মহাশয়ও পূজার সময় ঠাকুরের অনাচারের অনেক কথা তুলিয়া বলিয়াছেন ‘ছোট ভট্টাচার্য’ সব মাটি করলে; মা-র (কালীর) পূজা, ভোগ, রাগ কিছুই হইতেছে না; ওরূপ অনাচার করলে মা কি কখন পূজা ভোগ গ্রহণ করেন?’ ইত্যাদি। কিন্তু বলিয়াও কিছুমাত্র সফলমনোরথ হন নাই; কারণ মথুরবাবু স্বয়ং মাঝে মাঝে কাহাকেও কোন সংবাদ না দিয়া হঠাৎ মন্দিরে আসিয়া অন্তরালে থাকিয়া ঠাকুরের পূজার সময় ভক্তিবিশ্বল বালকের গায় ব্যবহার ও শ্রীশ্রীজগদম্বার প্রতি আব্দার অনুরোধাদি দেখিয়া চক্ষের জল ফেলিতে ফেলিতে তাঁহাদের আজ্ঞা করিয়াছেন—‘ছোট ভট্টাচার্য মহাশয় যেভাবে যাহাই করুন

১ ঠাকুরের অগ্রজকে ‘বড় ভট্টাচার্য’ বলিয়া ডাকায় ঠাকুর তখন এই নামে নির্দিষ্ট হইতেন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

না কেন, তোমরা তাঁহাকে বাধা দিবে না বা কোন কথা বলিবে না। আগে আমাকে জানাইবে, পরে আমি যেমন বলি তেমনি করিবে।’

রাণী রাসমণিও মধ্যে মধ্যে আসিয়া মা-র শিকার (ফুলের সাজ) ইত্যাদি দেখিয়া এবং ঠাকুরের মধুর কণ্ঠে মা-র নাম শুনিয়া এতই মোহিত হইয়াছেন যে, যখনই কালীবাড়ীতে আসেন তখনই ছোট ভট্টাচার্য্যকে নিকটে ডাকাইয়া মা-র নাম (গান) করিতে অনুরোধ করেন। ঠাকুরও গান করিতে করিতে কাহাকেও যে শুনাইতেছেন একথা একেবারে ভুলিয়া যাইয়া ভাবে বিভোর হইয়া শ্রীশ্রীজগদম্বাকেই যেন শুনাইতেছেন, এই ভাবে গান গাহিতে থাকেন। এইরূপে দিনের পর দিন চলিয়া যাইতেছে, জগৎ-রূপ বৃহৎ সংসারের ন্যায় ঠাকুর-বাড়ীর ক্ষুদ্র সংসারেও যে যাহার কাজ লইয়াই ব্যস্ত এবং সাংসারিক কাজকর্ম ও স্বার্থচিন্তা বাদে যতটুকু সময় পায় তাহাতে পরনিন্দা পরচর্চাদি রুচিকর বিষয়সকলের আন্দোলন করিয়া নিজ নিজ মনের একদেশিতার অবসাদ দূর করিয়া থাকে। কাজেই ছোট ভট্টাচার্য্যের ভিতরে ঈশ্বরপ্রেমে যে কি পরিবর্তন হইতেছে, তাহার খবর রাখে কে? ‘ও একটা উন্মাদ, বাবুদের কেমন একটা স্নজরে পড়িয়াছে, তাই এখনও চাকরিটি বজায় আছে; তাই বা কদিন? কোন্ দিন একটা কি কাণ্ড করিয়া বসিবে ও তাড়িত হইবে! বড়লোকের মেজাজ—কিছু কি ঠিক-ঠিকানা আছে? খুশী হইতেও যতক্ষণ, আর গরম হইতেও ততক্ষণ’—ঠাকুরের সম্বন্ধে এইরূপ কথাবার্ত্তাই



যৌবনে গুরুভাব

কর্মচারীদের ভিতর কখন কখন হইয়া থাকে, এই মাত্র।
ঠাকুরের ভাগিনেয় ও সেবক হৃদয়ও তৎপূর্বেই ঠাকুরবাড়ীতে
আসিয়া জুটিয়াছে।

আজ রাণী রাসমণি স্বয়ং ঠাকুরবাড়ীতে আসিয়াছেন। কর্ম-
চারীরা সকলে শশব্যস্ত। যে ফাঁকিদার সে-ও আজ আপন কর্তব্য

গুরুভাবে অতি যত্নের সহিত করিতেছে। গঙ্গায় স্নানান্তে রাণী
ঠাকুরের রাণী কালীঘরে দর্শন করিতে যাইলেন। তখন ৮কালীর
রাসমণিকে পূজা ও বেশ হইয়া গিয়াছে। জগন্নাথাকে প্রণাম
দণ্ডবিধান করিয়া রাণী মন্দিরমধ্যে শ্রীমূর্তির নিকটে আসনে

আহ্নিক-পূজা করিতে বসিলেন এবং ছোট ভট্টাচার্য বা ঠাকুরকে
নিকটে দেখিয়া মা-র নাম গান করিতে অনুরোধ করিলেন।
ঠাকুরও রাণীর নিকটে বসিয়া ভাবে বিভোর হইয়া রামপ্রসাদ,
কমলাকান্ত প্রভৃতি সাধকদিগের পদাবলী গাহিতে লাগিলেন;
রাণী পূজা-জপাদি করিতে করিতে ঐ সকল শুনিতে লাগিলেন।
কিছুক্ষণ এই ভাবে কাটিলে ঠাকুর হঠাৎ গান থামাইয়া বিরক্ত
হইয়া উগ্রভাবে রুক্ষস্বরে বলিয়া উঠিলেন, “কেবল ঐ ভাবনা,
এখানেও ঐ চিন্তা?”—বলিয়াই রাণীর কোমল অঙ্গে করতল দ্বারা
আঘাত করিলেন। সন্তানের কোনরূপ অন্যায়াচরণ দেখিয়া পিতা-
যে রূপ কুপিত হইয়া কখন কখন দণ্ডবিধান করেন, ঠাকুরেরও এখন
ঠিক সেই ভাব; কিন্তু কে-ই বা তাহা বুঝে!

মন্দিরের কর্মচারী ও রাণীর পরিচারিকারা সকলে হৈ-টৈ
করিয়া উঠিল। দ্বারপাল শশব্যস্তে ঠাকুরকে ধরিতে ছুটিল।
বাহিরের কর্মচারীরাও মন্দিরমধ্যে এত গোল কিমের ভাবিয়া

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া সেদিকে অগ্রসর হইল। কিন্তু ঐ গোল-
যোগের প্রধান কারণ যাহারা—ঠাকুর ও রাণী
উহার ফল রাসমণি—তাঁহারা উভয়েই এখন স্থির, গম্ভীর।
কর্মচারীদের বকাবকি ছুটাছুটির দিকে লক্ষ্য না করিয়া একেবারে
উদাসীন থাকিয়া ঠাকুর আপনাতে আপনি স্থির ও তাঁহার
মুখে মৃদু মৃদু হাসি; শ্রীশ্রীজগদম্বার ধ্যান না করিয়া আজ
কেবলই একটি বিশেষ মোকদ্দমার ফলাফলের বিষয় ধ্যান করিতে-
ছিলেন, রাণী রাসমণি নিজের অন্তর পরীক্ষা দ্বারা ইহা দেখিতে
পাইয়া ঈষৎ অপ্রতিভ ও অনূতাপে গম্ভীর! আবার ঠাকুর
ঐ কথা কি করিয়া জানিতে পারিলেন ভাবিয়া রাণীর ঐ ভাবের
সহিত কতক বিস্ময়ের ভাবও মনে বর্তমান। পরে কর্মচারীদের
গোলযোগে রাণীর চমক ভাঙ্গিল ও বুঝিলেন—নিরপরাধ ঠাকুরের
প্রতি এই ঘটনায় হীনবুদ্ধি লোকদিগের বিশেষ অত্যাচার হইবার
সম্ভাবনা বুঝিয়া সকলকে গম্ভীরভাবে আজ্ঞা করিলেন,
“ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কোন দোষ নাই। তোমরা উহাকে কেহ
কিছু বলিও না।” পরে মথুর বাবুও নিজ শ্বশুরঠাকুরাণীর নিকট
হইতে ঘটনাটির সকল কথা আত্মোপাস্ত শ্রবণ করিয়া কর্মচারী-
দিগের উপর পূর্বোক্ত হুকুমই বাহাল রাখিলেন। ইহাতে
তাঁহাদের কেহ কেহ বিশেষ দুঃখিত হইল; কিন্তু কি করিবে,
‘বড় লোকের বড় কথায় আমাদের কাজ কি’ ভাবিয়া চুপ করিয়া
রহিল।

ঘটনাটি শুনিয়া পাঠক হয়ত ভাবিবে—এ আবার কোন্‌দিশি
গুরুভাব? লোকের অঙ্গে আঘাত করিয়া এ আবার কি প্রকার

বৌদনে গুরুভাব

গুরুভাবের প্রকাশ ? আমরা বলি—জগতের ধর্মোত্তিহাস পাঠ কর,
 শ্রীচৈতন্য ও হেথিবে লোকগুরু আচার্যদিগের জীবনে একরূপ
 ঈশার জীবনে ঘটনার উল্লেখ আছে। শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জীবনে
 একরূপ ঘটনা কাজিদলন, গুরুভাবে আত্মহারা হইয়া অর্ধেত প্রভুকে
 প্রহার করিয়া ভক্তিদান প্রভৃতির কথা স্মরণ কর। ভাবিয়া দেখ,
 মহামহিম ঈশার জীবনেও একরূপ ঘটনার অভাব নাই।

শিষ্যপরিবৃত ঈশা জেজেলামের 'ম্যাভে' দেবতার মন্দিরে
 দর্শন-পূজাদি করিবার জন্ত আসিয়া উপস্থিত। ৬বারাণসী,
 শ্রীবৃন্দাবনাদি তীর্থে দেবস্থানসকল দর্শন করিতে যাইয়া হিন্দুর
 মনে যে রূপ অপূর্ব পবিত্র ভাবের উদয় হয়, ম্যাভে-মনে জেজ-
 জেলামের মন্দির-দর্শনেও ঠিক তদ্রূপ হইবে—ইহাতে আর সন্দেহ
 কি ? তাহার উপর আবার ভাবমুখে অবস্থিত ঈশার মন ! দূর
 হইতে মন্দির দর্শনেই ঈশা ভগবৎপ্রেমে বিভোর হইয়া দেবদর্শন
 করিতে ছুটিলেন। মন্দিরের বাহিরে, দ্বারে, প্রাঙ্গণমধ্যে কত
 লোক কত প্রকারে দু'পয়সা রোজগার প্রভৃতি ছনিয়াদারিতেই
 ব্যস্ত ; পাণ্ডা পুরোহিতেরা দেবদর্শন হউক আর নাই হউক,
 ষাত্রীদিগের নিকট হইতে দু'পয়সা ঠকাইয়া লইতেই নিযুক্ত।
 আর দোকানি পসারিরা পূজার পশু পুষ্পাদি দ্রব্যসম্ভার এবং
 অন্যান্য দ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়া কিসে দু'পয়সা অধিক লাভ
 করিব, এই চিন্তাতেই ব্যাপ্ত। ভগবানের মন্দিরে তাঁহার
 নিকটে রহিয়াছি—একথা ভাবিতে কাহার আর মাথাব্যথা
 পড়িয়াছে ? যাহা হউক, ভাববিভোর ঈশার চক্ষে মন্দির প্রবেশ-
 কালে এ সকল কিছুই পড়িল না। সরাসর মন্দিরমধ্যে যাইয়া

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

দেবদর্শন করিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইলেন এবং প্রাণের প্রাণ আত্মার আত্মারূপে তিনি অন্তরে রহিয়াছেন দেখিতে পাইয়া আত্মহারা হইলেন। মন্দির ও তন্মধ্যগত সকল বস্তু ও ব্যক্তিকে আপনার হইতেও আপনার বলিয়া বোধ করিতে লাগিলেন; কারণ এখানে আসিয়াই ত তিনি প্রাণারামের দর্শন পাইলেন! পরে মন যখন আবার নীচে নামিয়া ভিতরের ভাবপ্রকাশ বাহিরের ব্যক্তি ও বস্তুর ভিতর দেখিতে যাইল, তখন দেখেন সকলই বিপরীত। কেহই তাঁহার প্রাণারামের সেবায় নিযুক্ত নহে; সকলেই কাম-কাঙ্ক্ষনের সেবাতেই ব্যাপ্ত; তখন নিরাশা ও দুঃখে তাঁহার হৃদয় পূর্ণ হইল। ভাবিলেন—একি? তোরা বাহিরে সংসারের ভিতর যাহা করিস্ কর না, কিন্তু এখানে যেখানে ঈশ্বরের বিশেষ প্রকাশ—এখানে আবার এ সকল দুনিয়াদারি কেন? কোথায় এখানে আসিয়া দু'দণ্ড তাঁহার চিন্তা করিয়া সংসারের জ্বালা দূর করিবি, তাহা না হইয়া এখানেও সংসার আনিয়া পুরিয়াছিস্!—ভাবিয়া তাঁহার হৃদয় ক্রোধে পূর্ণ হইল এবং বেত্রহস্তে উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া তিনি সকল দোকানি পসারিদের বলপূর্ব্বক মন্দিরের বাহিরে তাড়াইয়া দিলেন। তাহারাও তখন তাঁহার কথায় ঋণিক চৈতন্য লাভ করিয়া যথার্থই দুঃক্ষম করিতেছি ভাবিতে ভাবিতে স্ফুড় স্ফুড় করিয়া বাহিরে গমন করিল; অতি বদ্ধ জীব—যাহার কথায় চৈতন্য হইল না, সে তাঁহার কশাঘাতে ঐ জ্ঞানলাভ করিয়া বহির্গমন করিল। কিন্তু কেহই ক্রোধপূর্ণ হইয়া তাঁহার উপর অত্যাচার করিতে সাহসী হইল না।

যৌবনে গুরুভাব

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জীবনেও এইরূপে আহত ব্যক্তির জ্ঞানলাভ হইয়া তাঁহাকে ভগবদ্বুদ্ধিতে স্তবস্তুতি করার কথা, অতি বদ্ধ জীবকুলের তাঁহার প্রতি অত্যাচার করিতে আসিয়া তাঁহার হাশ্বে বা কথায় স্তম্ভিত ও হতবুদ্ধি হইয়া যাইবার কথা প্রভৃতি অনেক ঘটনা দেখিতে পাওয়া যায়। যাক এখন ঐ সকল পৌরাণিকী কথা।

গুরুভাবে সম্পূর্ণ আত্মহারা হইয়া থাকুর যে কি ভাবে অপরের সহিত ব্যবহার ও শিক্ষাদি প্রদান করিতেন, এই ঘটনাটি উহার একটি জ্বলন্ত নিদর্শন। ঘটনাটি তলাইয়া দেখিলে বড় কম ব্যাপার বলিয়া বোধ হয় না। কোথায় একজন সামান্য বেতনমাত্রভোগী নগণ্য পূজারী ব্রাহ্মণ এবং কোথায় রাণী রাসমণি —যাঁহার ধন, মান, বুদ্ধি, ধৈর্য্য, সাহস ও প্রতাপে কলিকাতার তখনকার মহা মহা বুদ্ধিমানেরাও স্তম্ভিত। এরূপ দরিদ্র ব্রাহ্মণ যে তাঁহার নিকট অগ্রসর হইতেই পারিবে না, ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত করিতে হয় ; অথবা যদি কখন কোন কারণে তাঁহার সমীপস্থ হয় তো চাটুকারিতা প্রভৃতি উপায়ে তাঁহার তিলমাত্র সন্তোষ উৎপাদন করিতে পারিলে আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিবে এবং তন্নিমিত্তই অবসর অনুসন্ধান করিতে থাকিবে। তাহা না হইয়া একেবারে তদ্বিপরীত ! তাঁহার অন্য় আচরণের খালি প্রতিবাদ নহে, শারীরিক দণ্ডবিধান ! ঠাকুরের দিক হইতে দেখিলে ইহা যেমন অল্প বিশ্বয়ের কথা মনে হয় না, রাণীর দিক হইতে দেখিলে ঐরূপ ব্যবহারে যে তাঁহার

শ্রী শ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

মনে ক্রোধ-অভিমান-হিংসাদির উদয় হইল না, ইহাও একটি কম-
কথা বলিয়া মনে হয় না। তবে পূর্বেই যেমন আমরা বলিয়া
আসিয়াছি—স্বার্থগন্ধহীন বিরাট ‘আমি’টার সহায়ে যখন মহা-
পুরুষদিগের মনে এইরূপে গুরুভাব আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন
ইচ্ছা না থাকিলেও সাধারণ মানবকে তাঁহার নিকট নতশির হইতে
হইবেই হইবে; রাণীর গায় ভক্তিমতী সাত্বিকপ্রকৃতির তো
কথাই নাই। কারণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থনিবন্ধদৃষ্টি মানব-মন তখন
তাঁহাদের কৃপা ও শক্তিতে উন্নত হইয়া তাঁহারা যাহা করিতে
বলিতেছেন তাহাতেই তাহার বাস্তবিক স্বার্থ—এ কথাটি আপনা-
আপনি বুঝিতে পারে। কাজেই তখন তদ্রূপ করা ভিন্ন আর
উপায়ান্তর থাকে না। আর এক কথা, ঠাকুর যেমন বলিতেন—
“তাঁহার (ঈশ্বরের) বিশেষ অংশ ভিতরে না থাকিলে কেহ কখন
কোন বিষয়ে বড় হইতে পারে না, বা মান, ক্ষমতা প্রভৃতি হজম^১
করিতে পারে না!” সাত্বিক-প্রকৃতি-সম্পন্ন রাণীর ভিতর ঐরূপ
ঐশী শক্তি বিद्यমান ছিল বলিয়াই তিনি এরূপ কঠোরভাবে
প্রকাশিত হইলেও ঠাকুরের গুরুভাবে কৃপা গ্রহণ করিতে
পারিয়াছিলেন। ঠাকুর বলিতেন, “রাণী রাসমণি শ্রীশ্রীজগদম্বার
অষ্ট নায়িকার একজন। ধরাধামে তাঁহার পূজা-প্রচারের জগৎ
আসিয়াছিলেন। জমিদারীর দলিল-পত্রাদি অঙ্কিত করিবার
তাঁহার যে শীলমোহর ছিল তাহাতেও লেখা ছিল—‘কালীপদ-

১ মান প্রভৃতি হজম করা অর্থাৎ এ সকল লাভ করিয়াও মাথা ঠিক
রাখা; অহঙ্কৃত হইয়া ঐ সকলের অপব্যবহার না করা।

যৌবনে গুরুভাব

‘অভিলাষী, শ্রীমতী রাসমণি দাসী।’ রাণীর প্রতি কার্যেই ঐক্যে জগন্মাতার উপর অচলা ভক্তি প্রকাশ পাইত।”

আর এক কথা—সর্বতোভাবে ঈশ্বরে তন্ময় মনের নানা ভাবে অবস্থানের কথা শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ আছে। আচার্য্য-শ্রীমৎ শঙ্কর তৎকৃত ‘বিবেকচূড়ামণি’ নামক গ্রন্থে উহা সুন্দরভাবে বর্ণনা করিয়াছেন—

দিগম্বরো বাপি চ সাধুরো বা হৃগম্বরো বাপি চিদম্বরম্হঃ ।

উন্নতবদ্বাপি চ বালবদ্বা পিশাচবদ্বাপি চরত্যবণ্যাম্ ॥ ৫৪০

—ঈশ্বরলাভ বা জ্ঞানলাভে সিদ্ধকাম পুরুষদিগের কেহ বা জ্ঞানরূপ বস্ত্রমাত্র পরিধান করিয়া সম্পূর্ণ উলঙ্গ হইয়া, আবার কেহ বা বন্ধন বা সাধারণ লোকের ন্যায় বস্ত্র পরিধান করিয়া, কেহ বা উন্মাদের ন্যায়, আবার কেহ বা বহিদৃষ্টে কামকাঞ্চনগন্ধহীন বালক, বা শৌচাচারবিবজ্জিত পিশাচের ন্যায় পৃথিবীতে বিচরণ করিয়া থাকেন।

‘বিরাট আমি’টার সহিত তন্ময়ভাবে অনেকক্ষণ অবস্থান করায় সাধারণ লোকের দৃষ্টিতে ইহাদের ঐক্যে অবস্থা লক্ষিত হইয়া থাকে; কিন্তু ঈশ্বরের অজ্ঞানাক্রম দূরীকরণসমর্থ গুরুভাব ইহাদের ভিতর দিয়াই বিশেষভাবে প্রকাশিত হয়। কারণ, পূর্বেই বলিয়াছি—ক্ষুদ্র স্বার্থময় ‘আমি’টার লোপ বা বিনাশেই জগদ্ব্যাপী বিরাট আমিত্ব এবং তৎসহ লোককল্যাণসাধনকারী শ্রীগুরুভাবের প্রকাশ।

ঐ সকল জ্ঞানী পুরুষদিগের ভিতর আবার যাহারা ঈশ্বরেচ্ছায়

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

সর্বদা গুরু বা ঋষি-পদবীতে অবস্থান করেন, তাঁহাদের আবার অপরের শিক্ষার নিমিত্ত সন্ধিষয়ে তীব্রানুরাগ, অসন্ধিষয়ে তীব্র বিরাগ বা ক্রোধ, আচার, নিষ্ঠা, নিয়ম, তর্ক, যুক্তি, শাস্ত্রজ্ঞান বা পাণ্ডিত্য ইত্যাদি সকল ভাবই অবস্থানুযায়ী সাধারণ পুরুষদিগের ন্যায় দেখাইতে হয়। ‘দেখাইতে হয়’ বলিতেছি এজন্য যে, ভিতরে, ‘একমেবাদ্বিতীয়ং’ ব্রহ্মভাবে ভাল-মন্দ ধর্মাধর্ম, পাপ-পুণ্যাদি মায়া-রাজ্যের অন্তর্গত সকল পদার্থে ও ভাবে একাকার জ্ঞান বা দৃষ্টি পূর্ণভাবে বিদ্যমান থাকিলেও, অপরকে মায়া-রাজ্যের পারে ঘাইবার পথ দেখাইবার জন্য ঐ সকল ভাব লইয়া তাঁহারা কাল-যাপন করিয়া থাকেন। সাধারণ গুরু বা ঋষিদিগেরই যখন ঐরূপে লোককল্যাণের নিমিত্ত অনেক সময় কালযাপন করিতে হয়, তখন ঈশ্বরাবতার বা জগদ্গুরুরূপদবীস্থ আচার্য্যকুলের তো কথাই নাই। এজন্য তাঁহাদের বুঝা, ধরা সাধারণ মানবের এত কঠিন হইয়া উঠে; বিশেষতঃ আবার বর্তমান যুগাবতার ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের চেষ্টা ও ব্যবহারাদি ধরা ও বুঝা। কারণ অবতারকূলে যে সকল বাহ্যিক ঐশ্বর্য্য, শক্তি বা বিভূতির প্রকাশ শাস্ত্রে এ পর্য্যন্ত লিপিবদ্ধ আছে, সে সকল ইহাতে এত গুপ্তভাবে প্রকাশিত ছিল যে, যথার্থ তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়া ইহার কূপালাভ করিয়া ইহার সহিত বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে নিবন্ধ না হইলে, ইহাকে দুই-চারি বার ভাসা ভাসা উপর উপর মাত্র দেখিয়া কাহারও ঐ সকলের পরিচয় পাইবার উপায় ছিল না। দেখ না, বাহ্যিক কোন গুণ দেখিয়া তুমি তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইবে? বিচার— একেবারে নিরক্ষর বলিলেই চলে! শ্রুতিধরত্ব গুণে বেদ বেদান্তাদি

যৌবনে গুরুভাব

সকল শাস্ত্র শুনিয়া যে তিনি সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিয়া রাখিয়াছেন, একথা তুমি কেমন করিয়া বুঝিবে? বুদ্ধিতে তাঁহাকে ধরিবে? “আমি কিছু নহি, কিছু জানি না—সব আমার মা জানেন”—সর্বদা এইরূপ বুদ্ধির ঝাঁহাতে প্রকাশ, তাঁহার নিকট তুমি কোন্ বিষয়ে কি বুদ্ধি লইতে যাইবে? আর লইতে যাইলেও তিনি যখন বলিবেন, “মাকে জিজ্ঞাসা কর, তিনি বলিবেন”, তখন কি তুমি তাঁহার কথায় বিশ্বাস স্থির রাখিয়া ঐরূপ করিতে পারিবে? তুমি ভাবিবে—“কি পরামর্শ ই দিলেন! ও কথা তো আমরা সকলে ‘কথামালা’ ‘বোধোদয়’ পড়িবার সময় হইতেই শুনিয়া আসিতেছি—ঈশ্বর সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান্ নিরাকার চৈতন্য-স্বরূপ, ইচ্ছা করিলে সকল বিষয় জানাইয়া ও বুঝাইয়া দিতে পারেন; কিন্তু ঐ কথা লইয়া কাজ করিতে যাইলে কি চলে?” ধনে, নাম-যশে তাঁহাকে ধরিবে? ঠাকুরের নিজের তো ও সকল খুবই ছিল! আবার ও সকল তো ত্যাগ করিতেই প্রথম হইতেই উপদেশ! এইরূপ সকল বিষয়ে। কেবল আকৃষ্ট হইয়া ধরিবার একমাত্র উপায় ছিল—তাঁহার পবিত্রতা, ঈশ্বরানুরাগ ও প্রেম দেখিয়া। ইহাতে তুমি যদি আকৃষ্ট হইলে তো হইলে, নতুবা তাঁহাকে ধরা ও বুঝা তোমার পক্ষে বহু দূরে! তাই বলি রাণী রাসমণি যে ঐরূপ কঠোরভাবে প্রকাশিত ঠাকুরের গুরুভাব ধরিতে পারিলেন এবং তিনি ঐরূপে যে শিক্ষা দান করিলেন, তাহা অভিমান-অহঙ্কারে ভাসাইয়া না দিয়া হৃদয়ে ধারণ করিয়া ধন্য হইলেন—ইহা তাঁহার কম ভাগ্যোদয়ের কথা নহে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

গুরুভাব ও মথুরানাথ

হস্ত তে কথয়িষ্যামি দিব্যা হ্যঅবিভূতয়ঃ ।

প্রাধান্যতঃ কুরুশ্রেষ্ঠ নাস্ত্যন্তো বিস্তরস্ত মে ॥—গীতা, ১০।১৯

পূর্বে বলিয়াছি, ঠাকুরের জীবনে গুরুভাবের ধীর বিকাশ
রাণী রাসমণি ও মথুর বাবুর চক্ষের সম্মুখেই অনেকটা হইতে
থাকে। উচ্চাঙ্গের ভাববিকাশ সম্বন্ধে ঠাকুর
'বড় ফুল
ফুটতে দেৱী
লাগে।'
বলিতেন, “বড় ফুল ফুটতে দেৱী লাগে, সারবান্
গাছ অনেক দেৱীতে বাড়ে।” ঠাকুরের জীবনেও
অদৃষ্টপূর্বে গুরুভাবের বিকাশ হইতে বড় কম সময় ও
সাধনা লাগে নাই; ছাদশবৎসরব্যাপী নিরন্তর কঠোর সাধনার
আবশ্যক হইয়াছিল। সে সাধনার যথাসাধ্য পরিচয় দিবার ইহা
স্থান নহে। এখানে চিংসূর্য্যের কিরণমালায় সম্যক্ সমুদ্ভাসিত
গুরুভাবরূপ কুম্মটির সহিতই আমাদের বিশেষ সম্বন্ধ; তাহার
কথাই বিশেষ করিয়া বলিয়া যাইব। তবে ঐ ভাববিকাশের কথা
পূর্ক্কাবধি শেষ পর্য্যন্ত বলিতে যাইয়া প্রসঙ্গক্রমে কোনও কোন
কথা আসিয়া পড়িবে। যে সকল ভক্তের সহিত ঠাকুরের ঐ ভাবের
পূর্ক্কা-পূর্ক্কাবস্থার সময়ে সম্বন্ধ, তাহাদের কথাও কিছু না কিছু
আসিয়া পড়িবে নিশ্চয়।

গুরুভাব ও মথুরানাথ

মথুর বাবুর সহিত ঠাকুরের সম্বন্ধ এক অদ্ভুত ব্যাপার !
মথুর ধনী অথচ উচ্চপ্রকৃতিসম্পন্ন, বিষয়ী হইলেও ভক্ত,
হঠকারী হইয়াও বুদ্ধিমান, ক্রোধপরায়ণ হইলেও
মথুরের সহিত ঠাকুরের অদ্ভুত সম্বন্ধ। মথুর
কিরূপ প্রকৃতির লোক ছিল
ধৈর্যশীল এবং ধীরপ্রতিজ্ঞ ছিলেন। মথুর
ইংরাজী-বিদ্যাভিজ্ঞ ও তार्কিক, কিন্তু কেহ কোন
কথা বুঝাইয়া দিতে পারিলে উহা বুঝিয়াও বুঝিব
না—এরূপ স্বভাবসম্পন্ন ছিলেন না ; ঈশ্বরবিশ্বাসী ও
ভক্ত, কিন্তু তাই বলিয়া ধর্মসম্বন্ধে যে যাহা বলিবে
তাহাই যে চোখ-কান বুঝিয়া অবিচারে গ্রহণ করিবেন, তাহা ছিল
না, তা তিনি ঠাকুরই হউন বা গুরুই হউন বা অন্য যে কেহই
হউন ; উদার-প্রকৃতি ও সরল, কিন্তু তাই বলিয়া বিষয়-কর্মে
বা অন্য কোন বিষয়ে যে বোকার মত ঠকিয়া আসিবেন, তাহা
ছিলেন না, বরং বিষয়ী জমিদারগণ যে কূটবুদ্ধি এবং সময়ে সময়ে
অসত্বপায়-সহায়ে প্রতিনিয়ত বিষয়বুদ্ধি করিয়া থাকেন, সে
সকলেরও তাঁহাতে কখন কখন প্রকাশ দেখা গিয়াছে। বাস্তবিকই
পুত্রহীনা রাণী রাসমণির অন্যান্য জামাতা বর্তমান থাকিলেও,
বিষয়কর্মের তত্ত্বাবধান ও সুবন্দোবস্তে কনিষ্ঠ মথুর বাবুই তাঁহার
দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিলেন এবং শাশুড়ী ও জামাই উভয়ের বুদ্ধি
একত্রিত হওয়াতেই রাণী রাসমণির নামের তখন এতটা দপ্পণা
হইয়া উঠিয়াছিল।

পাঠক হয়ত বলিবে—‘এ ধান ভানতে শিবের গীত’ কেন ?
ঠাকুরের কথা বলিতে বলিতে আবার মথুর বাবু কেন ? কারণ
গুটি কাটিয়া ভাবরূপী প্রজাপতিটি যখন বাহির হইয়াছিল,

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

তখন মথুরাই তাহার ভাবী সৌন্দর্যের আভাস কিঞ্চিৎ প্রাপ্ত হইয়া তাহার প্রধান রক্ষক ও সহায়স্বরূপ হইয়াছিলেন। রাণী রাসমণি একটা মহা শুদ্ধ পবিত্র প্রেরণায় এ ঠাকুরের গুরু-ভাব-বিকাশে রাণী রাসমণি ও মথুরের অজ্ঞাতভাবে সহায়তা। বন্ধু বা শত্রুভাবে সম্বন্ধ যাবতীয় লোক অবতার-পুরুষের শক্তি-বিকাশের সহায়তা করে

অদ্ভুত চরিত্রের বিকাশ ও প্রসারোপযোগী স্থান নির্মাণ করিলেন, আর তাঁহার জামাতা মথুর ঐরূপ উচ্চ প্রেরণায় সেই দেবচরিত্র-বিকাশের সময় অগ্র যাহা কিছু প্রয়োজন হইল, তৎসমস্ত যোগাইলেন। অবশ্য এ কথা আমরা এখন এতদিন পরে ধরিতে পারিতেছি; তাঁহারা উভয়ে কিন্তু এই বিষয়ের আভাস কখন কখন কিছু কিছু পাইলেও ঐ সকল কার্য্য যে কেন করিতেছেন, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পরেও যে সম্পূর্ণ সক্ষম হইয়াছিলেন, তাহা বোধ হয় না। যুগে যুগে সকল মহাপুরুষদিগের জীবনালোচনা করিতে যাইলেই ঐরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। দেখা যায়, কি একটা অজ্ঞাত শক্তি অলক্ষ্যে থাকিয়া কোথা হইতে তাঁহাদের সকল বিষয়ের পথ পরিষ্কার করিয়া দেন, সকল সময়ে সর্বাবস্থায় তাঁহাদের সর্বতোভাবে রক্ষা করেন, অপর সকল ব্যক্তির শক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া তাঁহাদের অধীনে আনিয়া দেন; অথচ ঐ সকল ব্যক্তি জানিতেও পারে না যে, তাহারা নিজে স্বাধীনভাবে, প্রেমে বা ঐ সকল দেবচরিত্রের উপর বিদ্বেষে যাহা করিয়া যাইতেছে, তাহা তাঁহাদেরই জগৎ—তাঁহাদেরই কার্যের সহায়ক হইবে বলিয়া—তাঁহাদেরই গন্তব্য পথের বাধা-বিঘ্নগুলি সরাইয়া

গুরুভাব ও মথুরানাথ

তাঁহাদের ভিতরের শক্তি উদ্দীপিত করিবে বলিয়া!—আর মাহুঘ বহুকাল পরে উহা বুঝিতে পারিয়া অবাক হইয়া থাকে। কৈকেয়ীর শ্রীরামচন্দ্রকে বনে পাঠাইবার ফল দেখ; বহুদেব দেবকীকে কারাগারে রাখিয়া কংসের আজীবন চেষ্টার শেষ দেখ; সিদ্ধার্থের পাছে বৈরাগ্যোদয় হয় বলিয়া রাজা শুক্লোদনের প্রমোদকানন-নির্মাণ দেখ; ক্রুর কাপালিক বৌদ্ধদিগের আচার্য্য শঙ্করকে অভিচারাদি সহায়ে বিনষ্ট করিবার চেষ্টা দেখ; রাজ-পুরুষাদির সহায়ে শ্রীচৈতন্যের প্রেমধর্মপ্রচারের বিদ্বেষ ও বিপক্ষতাচরণের ফল দেখ; আর দেখ মহামহিম ঈশাকে মিথ্যা-পরাধে নিহত করিবার ফল!—সর্বত্রই ‘উন্টা বুঝিলু রাম’^১ হইয়া গেল! অথচ মহাপরাক্রান্ত বুদ্ধিমান্ বিপক্ষ ও স্নেহপরবশ স্বপক্ষকুল কূটনীতি বা বিষয়বুদ্ধি-সহায়ে চিরকালই অন্তরূপ

১ নিম্নলিখিত গল্পটি হইতে প্রচলিত উক্তিটির উৎপত্তি হইয়াছে। যথা—এক বৈরাগী সাধু বহুকাল পর্য্যন্ত তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন। সঙ্গে সাথী—তসলা, লোটা প্রভৃতি আবশ্যকীয় জব্যগুলির মোটটি নিজেই বহন করিতেন। একদিন সাধুর মনে হইল, একটি ঘোড়া পাই তো মোটটি আর নিজে বহিয়া কষ্ট পাই না। ভাবিয়াই ‘এক ঘোড়া দেলায় দে রাম’ বলিয়া চীৎকার করিয়া ঘোড়া-ভিক্ষার চেষ্টায় ফিরিতে লাগিলেন। তখন সেই স্থান দিয়া রাজার পন্টন যাইতেছিল। পশ্চিমধ্যে একটি ঘোটকীর শাবক হওয়ার উহার আরোহী ভাবিতে লাগিল, “তাইত, পন্টন এখনি এ স্থান হইতে অশ্রুত কুচ করিবে; ঘোটকী হাঁটিয়া যাইতে পারিবে, কিন্তু সজোজাত শাবকটিকে কেমন করিয়া লইয়া যাই?” ভাবিয়া চিন্তিয়া শাবকটিকে বহন করিবার জন্ত একটি লোকের অন্বেষণে বাহির হইয়াই ‘ঘোড়া দেলায় দে রাম’-সাধুর সহিত দেখা হইল এবং সাধুকে বলিষ্ঠ দেখিয়া কোন বিচার না করিয়া একেবারে বলপূর্বক তাঁহাকে দিয়া শাবকটি বহন করাইয়া লইয়া চলিল। সাধু তখন কাপরে পড়িয়া বলিতে লাগিলেন— ‘উন্টা বুঝিলু রাম!’ কোথায় ঘোড়া তাঁহার মোটটি ও তাঁহাকে বহন করিবে, না, তাঁহাকে ঘোটকী-শাবক বহন করিতে হইল!

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

ভাবিয়া অণ্ড উদ্দেশ্যে কার্য্য করিয়াছে এবং ভবিষ্যতেও ভাবিতে ও করিতে থাকিবে। তবে শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থসকলে যেসকল লিপিবদ্ধ আছে—শক্রভাবে, ঐ ঐশী শক্তির উদ্দেশ্য ও গতিবিধির বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ থাকিয়া যাইতে হয়, আর ভক্ত শ্রদ্ধা-ভক্তির সহিত ঐ ঐশী শক্তির অনুগামী হইয়া কখনও কখনও উহার কিছু কিছু হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে এই মাত্র এবং ঐ জ্ঞানের সহায়ে ক্রমে ক্রমে বাসনাবর্জিত হইয়া মুক্তি ও চির-শান্তির অধিকারী হইয়া থাকে। মথুর বাবুর ক্রিয়াকলাপও শেষ ভাবের হইয়াছিল।

অবতার-মহাপুরুষদিগের জীবনেই যে কেবল এই দৈবী শক্তির খেলা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা নহে। তবে তাঁহাদের জীবনে

সাধারণ মানব- জীবনেও ঐরূপ। কারণ উহার সহিত অবতারপুরুষের জীবনের বিশেষ সৌসাদৃশ্য আছে	উহার উজ্জ্বল খেলা সহজে ধরিতে পারিয়া আমরা অবাক্ হই—এই পর্য্যন্ত। নতুবা আপন আপন দৈনন্দিন জীবন এবং জগতের ব্যবহারিক জীবনের ইতিহাসের আলোচনা করিলেও আমরা ঐ বিষয়ের যৎসামান্য প্রকাশ দেখিতে পাই। বহুদর্শিতা বা মানবজীবনের বহু ঘটনার তুলনায় আলোচনায় ইহা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, মানব ঐ দৈবী শক্তির হস্তে
--	--

সর্বক্ষণই ক্রীড়াপুত্তলীস্বরূপ হইয়া রহিয়াছে! অবতার-মহাপুরুষ-
দিগের জীবনের সহিত সাধারণ মানবজীবনের ঐরূপ সৌসাদৃশ্য
ধাকাটাও কিছু বিচিত্র ব্যাপার নহে। কারণ তাঁহাদের অলৌকিক
জীবনাবলীই ত ইতরসাধারণের জীবন-গঠনের ছাঁচ (type
or model)-স্বরূপ। তাঁহাদের জীবনাদর্শেই তো সাধারণ মানব

গুরুভাব ও মথুরানাথ

আপন জীবনগঠনের প্রয়াস পাইতেছে ও চিরকালই পাইবে। দেখ না, নানা জাতির নানা ভাবের সম্মিলনভূমি বিশাল ভারত-জীবন রাম, কৃষ্ণ, চৈতন্য প্রভৃতি কয়েকটি মহাপুরুষ কেমন অধিকার করিয়া বসিয়াছেন। আবার ঐ সকল পূর্ব পূর্ব মহাপুরুষদিগের জীবনাদর্শসকলের একত্র সম্মিলনে অদৃষ্টপূর্ব নূতন ভাবে গঠিত বর্তমান যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনাদর্শ কেমন দ্রুতপদে আপন প্রভাব বিস্তার করিয়া এই স্বল্পকাল মধ্যেই ভারত-ভারতীর জীবন অধিকার করিয়া বসিতেছে। কালে ইহা কি ভাবে কতদূর যাইয়া দাঁড়াইবে, তাহা তোমার সাধ্য হয় বল; আমরা কিন্তু হে পাঠক, উহা বুঝিতে ও বলিতে সম্পূর্ণ অপারক।

আর এক কথা—মথুর বাবু ঠাকুরকে যেরূপ অকপটে ‘পাঁচ-সিকে পাঁচ আনা’ ভক্তি-বিশ্বাস করিতেন, তাহা শুনিয়া আমাদের

গ্রায় সন্দেহহুঁষ্ট মন প্রথমেই ভাবিয়া ফেলে—

মথুর ভক্ত
ছিল বলিয়া
নির্বোধ
ছিল না

‘লোকটা বোকা বাঁদর গোছ একটা ছিল আর কি, নতুবা মানুষকে মানুষ এতটা বিশ্বাস-ভক্তি করিতে পারে কখন? আমরা যদি হইতাম ত একবার দেখিয়া লইতাম—শ্রীরামকৃষ্ণদেব কেমন করিয়া

নিজ চরিত্রবলে অতটা ভক্তি-বিশ্বাসের উদয় আমাদের প্রাণে করিতে পারিতেন!’—যেন প্রাণের ভিতর ভক্তি-বিশ্বাসের উদয় হওয়াটা একটা বিশেষ নিন্দার ব্যাপার। সেজন্য ঠাকুরের নিকট হইতে মথুর বাবুর বিষয় আমরা যতটুকু যেরূপ শুনিয়াছি ও বুঝিয়াছি, তাহাই এখানে পাঠককে বলিয়া বুঝাইবার প্রয়াস পাইতেছি যে, মথুর বাবু ঐরূপ স্বভাবাপন্ন ছিলেন না। তিনি

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

আমাদের অপেক্ষা বড় কম বুদ্ধিমান বা সন্ধিগমনা ছিলেন না। তিনিও ঠাকুরের অলৌকিক চরিত্র ও কার্যকলাপে সন্দেহবান হইয়া তাঁহাকে প্রথম প্রথম প্রতিপদে বড় কম যাচাইয়া লন নাই। কিন্তু করিলে কি হইবে? কখনও কোন যুগে মানব যেরূপ নয়ন-গোচর করে নাই বিজ্ঞাননাদিনী প্রেমাবর্ত্তশালিনী মহা ওজস্বিনী ঠাকুরের ভাব-মন্দাকিনীর গুরুগম্ভীর বেগ মথুরের সন্দেহ-ঐরাবত আর কতক্ষণ সহ করিতে পারে? অল্পকালেই স্থলিত, মথিত, ধ্বস্ত ও বিপর্যাস্ত হইয়া চিরকালের মত কোথায় ভাসিয়া গিয়াছিল! কাজেই সর্বতোভাবে পরাজিত মথুর তখন আর কি করিতে পারে? অনন্তমনে ঠাকুরের শ্রীপদে শরণ লইয়াছিল। অতএব মথুরের কথা বলিলেও আমরা ঠাকুরের গুরুভাবেরই কীর্ত্তন করিতেছি, ইহা বুঝিতে বিলম্ব হইবে না।

ঠাকুরের সরল বালকভাব, মধুর প্রকৃতি এবং সুন্দর রূপে মথুর প্রথম দর্শনেই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হন। পরে সাধনার প্রথমা-

বস্থায় ঠাকুরের যখন কখন কখন দিব্যোন্মাদাবস্থা
আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল, যখন শ্রীশ্রীজগদম্বার
পূজা করিতে করিতে আত্মহারা হইয়া এবং
আপনার ভিতর তাঁহার দর্শনলাভ করিয়া তিনি
কখন কখন আপনাকেই পূজা করিয়া ফেলিতে
লাগিলেন, যখন অনুরাগের প্রবল বেগে তিনি বৈধী

ভক্তির সীমা উল্লঙ্ঘন করিয়া প্রেমপূর্ণ নানারূপ অবৈধ, সাধারণ
নয়নে অহেতুক আচরণ দৈনন্দিন জীবনে করিয়া ফেলিয়া ইতর-
সাধারণের নিন্দা ও সন্দেহ-ভাজন হইতে লাগিলেন, তখন বিষয়ী

গুরুভাব ও মথুরানাথ

মথুরের তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও শ্রায়পরতা বলিয়া উঠিল, 'বাহাকে প্রথম দর্শনে সুন্দর সরলপ্রকৃতিবিশিষ্ট বলিয়া বুঝিয়াছি, স্বচক্ষে না দেখিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে কোন কথা বিশ্বাস করা হইবে না।' সেই জন্মই মথুরের গোপনে গোপনে দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে আসিয়া ঠাকুরের কার্যকলাপ তন্ন তন্ন ভাবে নিরীক্ষণ করা এবং ঐরূপ করিবার ফলেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যে, 'যুবক গদাধর অমুরাগ ও সরলতার মূর্তিমান জীবন্ত প্রতিমা; ভক্তি-বিশ্বাসের আতিশয্যেই ঐরূপ করিয়া ফেলিতেছেন।' তাই বুদ্ধিমান বিষয়ী মথুরের তাঁহাকে বুঝাইবার চেষ্টা যে, 'যা রয় সয়, তাই করা ভাল; ভক্তি-বিশ্বাস করাটা ভাল কথা, কিন্তু একেবারে আত্মহারা হইলে চলে কি? উহাতে লোকের নিন্দাভাঞ্জন তো হইতে হইবেই, আবার দশে যাহা বলে তাহা না শুনিয়া নিজের মনোমত আচরণ বরাবর করিয়া যাইলে বুদ্ধিব্রষ্ট হইয়া পাগলও হইবার সম্ভাবনা।' কিন্তু ঐ সকল কথা ঐরূপে বুঝাইলেও মথুরের অস্তর্নিহিতা সুপ্তা ভক্তি সংসর্গগুণে জাগরিতা হইয়া কখন কখন বলিয়া উঠিত, কিন্তু রামপ্রসাদ প্রভৃতি পূর্ব পূর্ব সাধককুলেরও তো ভক্তিতে এইরূপ পাগলের শ্রায় ব্যবহারের কথা শুনা গিয়াছে; শ্রীগদাধরের ঐরূপ আচরণ ও অবস্থাও তো সেইরূপ হইতে পারে!' কাজেই, মথুর ঠাকুরের আচরণে বাধা না দিয়া কতদূর কি দাঁড়ায় তাহাই দেখিয়া যাইতে সঙ্কল্প করিলেন এবং দেখিয়া শুনিয়া পরে যাহা যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হইবে তাহাই করিবেন, ইহাই স্থির করিলেন। বিষয়ী প্রভুর অধীনস্থ সামান্ত কর্মচারীর উপর ঐরূপ ব্যবহার কম ধৈর্যের পরিচায়ক নহে।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

ভক্তির একটা সংক্রামিকা শক্তি আছে। শারীরিক বিকার-
সকলের গ্ৰায় মানসিক ভাবসমূহেরও এক হইতে অল্পে সংক্রমণ
আমরা নিত্য দেখিতে পাই। কারণ একই
ভক্তির
সংক্রামিকা
শক্তিতে মথুরের
পরিবর্তন
পদার্থের বিকারে একই নিয়মে যে স্থূল ও সূক্ষ্ম
সমগ্র জগৎ গ্রথিত রহিয়াছে, ইহা আজকাল আর
কেবলমাত্র বৈদিক ঋষিদিগের অনুভূতি দ্বারা প্রমাণ
করিবার আবশ্যকতা নাই—জড়বিজ্ঞানও একথা প্রায় প্রমাণিত
করিয়া আনিয়াছে। অতএব একের ভক্তিরূপ মানসিক ভাব
জাগ্রত হইয়া অল্পের মধ্যে নিহিত সূপ্ত ঐ ভাবকে যে জাগ্রত
করিবে ইহাতে আর বিচিত্র কি! এই জগুই শাস্ত্র সাধুসঙ্গকে
ধর্মভাব উদ্দীপিত করিবার বিশেষ সহায়ক বলিয়া এত করিয়া
নির্দেশ করিয়াছেন। মথুরের ভাগ্যেও যে ঠিক ঐরূপ হইয়াছিল
ইহা বেশ অনুমিত হয়। তিনি ঠাকুরের ক্রিয়াকলাপ যতই
দিন দিন লক্ষ্য করিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার ভিতরের ভক্তি-
ভাব তাঁহার অজ্ঞাতসারে জাগ্রত হইয়া উঠিতে লাগিল। তাঁহার
পর পর কার্যসকলে আমরা ইহা বেশ পরিচয় পাইয়া থাকি।
তবে বিষয়ী মনের যেমন হয়—এই ভক্তিবিশ্বাসের উদয়, আবার
পরক্ষণেই সন্দেহ—এইরূপ বারবার হইয়া অনেক দিন পর্যন্ত
দোলায়মান থাকিয়া তবে যে মথুরের হৃদয়ে ঠাকুরের আসন
দৃঢ় ও অবিচল হয়, ইহা সূনিশ্চিত। সেইজগুই দেখিতে পাই
ঠাকুরের ব্যাকুল অনুরাগ ও আচরণাদি প্রথম প্রথম মথুরের
নয়নে ভক্তির আতিশয্য বলিয়া বোধ হইলেও ঠাকুরের জীবনে
দিন দিন ঐ সকলের যতই বৃদ্ধি হইতে লাগিল, অমনি মথুরানাথের

গুরুভাব ও মথুরানাথ

মনে সন্দেহের উদয়—ইহার ত বুদ্ধিব্রংশ হইতেছে না? কিন্তু এ সন্দেহে তাঁহার মনে দয়ারই উদয় হয় এবং স্বেচ্ছিকিৎসকের সহায়ে ঠাকুরের শারীরিক স্বাস্থ্যের উন্নতি হইয়া যাহাতে ঐ সকল মানসিক বিকার প্রশমিত হয়, মথুর সেই বিষয়েই মনোনিবেশ করেন।

ইংরাজীতে ব্যাপ্তি মথুর বাবুর মন্দ ছিল না এবং ইংরাজী বিচার সহায়ে পাশ্চাত্য চিন্তাপ্রণালী ও ভাবশ্রোত মনের ভিতর প্রবেশ করিয়া ‘আমিও একটা কেও-কেটা নই, বর্তমান ভাবে শিক্ষিত মথুরের ঠাকুরের সহিত তর্ক-বিচার। প্রাকৃতিক নিয়মের পরি-বর্তন ঈশ্বরে-চ্ছায় হইয়া থাকে। লাল জবাগাছে সাদা জবা

অপর সকলের সহিত সমান’—এইরূপ যে একটা স্বাধীনভাব মানুষের মনে আনিয়া দেয়, সে ভাব-টাও মথুর বাবুর কম ছিল না। সেজন্য যুক্তি-তর্কাদি দ্বারা ঠাকুরকে ঐরূপে ঈশ্বরভক্তিতে একেবারে আত্মহারা হওয়ার পথ হইতে নিরস্ত করিবার প্রয়াসও আমরা মথুর বাবুর ভিতর দেখিতে পাইয়া থাকি। দৃষ্টান্তস্বরূপ এখানে ঠাকুর ও মথুর বাবুর জাগতিক ব্যাপারে ঈশ্বরকে স্বকৃত নিয়মের (Law) বাধ্য হইয়া চলিতে হয়

কি না—এ বিষয়ে কথোপকথনের উল্লেখ করা যাইতে পারে। ঠাকুর বলিতেন, “মথুর বলেছিল, ‘ঈশ্বরকেও আইন মেনে চলতে হয়। তিনি যা নিয়ম একবার করে দিয়েছেন, তা রদ করবার তাঁরও ক্ষমতা নেই।’ আমি বল্লুম, ‘ও কি কথা তোমার? যার আইন, ইচ্ছে কলে সে তখনি তা রদ করতে পারে বা তার জায়গায় আর একটা আইন করতে পারে।’ ও কথা সে

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

কিছুতেই মানলে না। বলে, 'লালফুলের গাছে লালফুলই হয়, সাদা ফুল কখনও হয় না; কেননা, তিনি নিয়ম করে দিয়েছেন। কৈ, লালফুলের গাছে সাদা ফুল তিনি এখন করুন দেখি?' আমি বল্লুম, 'তিনি ইচ্ছে করলে সব করতে পারেন, তাও করতে পারেন।' সে কিন্তু ও কথা নিলে না। তার পরদিন ঝাউতলার দিকে শোচে গেছি; দেখি যে একটা লাল জবাফুলের গাছে, একই ডালে দুটো ফেঁকড়িতে দুটি ফুল—একটি লাল, আর একটি ধপ্পে সাদা, এক ছিটেও লাল দাগ তাতে নেই। দেখেই ডালটি শুদ্ধ ভেঙ্গে এনে মথুরের সামনে ফেলে দিয়ে বল্লুম, 'এই দেখ।' তখন মথুর বলে, 'হাঁ বাবা, আমার হার হয়েছে!' এইরূপে শারীরিক বিকারেই যে ঠাকুরের মানসিক বিকার উপস্থিত হইয়া ঐরূপ ভক্তির আতিশয্যরূপে প্রকাশ পাইতেছে, কখন কখন এ বিশ্বাসে মথুর যে তাঁহার সহিত নানা বাদানুবাদ করিয়া তাঁহার ঐ ভাব ফিরাইবার চেষ্টা করিতেন, ইহা আমরা বেশ বুঝিতে পারি।

এইরূপে কতক কৌতূহলে, কতক ঠাকুরের ভাববিহ্বলতাটা শারীরিক রোগবিশেষ মনে করিয়া দয়ায় এবং কখন কখন ঠাকুরের ঐরূপ অবস্থা ঠিক ঠিক ঈশ্বরভক্তির ফল ভাবিয়া বিস্ময় ও ভক্তি-পূর্ণ হইয়া বিষয়ী মথুর তাঁহার সহিত ক্রমে ক্রমে অনেক কাল কাটাইতে এবং তাঁহার বিষয়ে অনেক চিন্তা ও আন্দোলনও যে করিতে থাকেন, ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়। আর স্থির নিশ্চিতই বা থাকেন কিরূপে? ঠাকুর যে নবানুরাগের প্রবল

গুরুভাব ও মধুরানাথ

প্রবাহে নিত্যই এক এক নূতন ব্যাপার করিয়া বসেন ! আজ পূজার আসনে বসিয়া আপনার ভিতর শ্রীশ্রীজগদম্বার দর্শন-লাভ করিয়া পূজার সামগ্রীসকল নিজেই ব্যবহার করিয়াছেন, কাল তিন ঘণ্টা কাল ধরিয়া শ্রীশ্রীজগন্মাতার আরতি করিয়া মন্দিরের কর্মচারীদের ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছেন, পরন্তু ভগবানলাভ হইল না বলিয়া ভূমে গড়াগড়ি দিয়া মুখ ঘসুড়াইতে ঘসুড়াইতে এমন ব্যাকুল ক্রন্দন করিয়াছেন যে, চারিদিকে লোক দাঁড়াইয়া গিয়াছে ! এইরূপ এক এক দিনের এক এক ব্যাপারের কত কথাই না ঠাকুরের নিকট আমরা শুনিয়াছি !

একদিন শিবমন্দিরে প্রবেশ করিয়া ঠাকুর 'মহিমঃস্তোত্র' পাঠ করিয়া মহাদেবের স্তব করিতে লাগিলেন ।
পড়িতে পড়িতে
ঠাকুরের সমাধি
ও মধুর
পাঠ করিতে করিতে ক্রমে যখন এই শ্লোকটি আবৃত্তি করিতে লাগিলেন, তখন একেবারে অপূর্ব ভাবে আত্মহারা হইয়া পড়িলেন—

অসিতগিরিসমং শ্রাৎ কজ্জলং সিদ্ধপাত্রে

স্বরতরুশাখা লেখনী পত্রমুর্বা ॥

লিখতি যদি গৃহীত্বা সারদা সর্বকালং

অপি তব গুণানামীশ পারং ন ঘাতি ॥ ৩২

হে মহাদেব, সমুদ্রগভীর পাত্রে বিশাল হিমালয়শ্রেণীর মত পুঞ্জ পুঞ্জ কালি রাখিয়া, কোনরূপ অসম্ভব পদার্থের কামনা করিলেও ষাঁহার তৎক্ষণাৎ তাহা সৃষ্টি বা রচনা করিয়া যাচকের মনোরথ পূর্ণ করিবার ক্ষমতা আছে—সেই কল্পতরু-শাখার কলম ও পৃথিবীপৃষ্ঠসদৃশ আয়ত বিস্তৃত কাগজ লইয়া, স্বয়ং বাগ্‌দেবী

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

সরস্বতী যদি তোমার অনন্ত মহিমার কথা লিখিয়া শেষ করিবার প্রয়াস পান, তাহা হইলেও কখনও তাহা করিতে পারেন না !

শ্লোকটি পড়িতে পড়িতে ঠাকুর শিবমহিমা হৃদয়ে জ্বলন্ত অমুভব করিয়া একেবারে বিহ্বল হইয়া স্তব, স্তবের সংস্কৃত, পর-পর আবৃত্তি করা প্রভৃতি সকল কথা একেবারে ভুলিয়া গিয়া চীৎকার করিয়া কেবলই বার বার বলিতে লাগিলেন, “মহাদেব গো ! তোমার গুণের কথা আমি কেমন করে বলব !”— আর তাঁহার গণ্ড বহিয়া দরদরিত ধারে নয়নাশ্রু অবিরাম বক্ষে এবং বক্ষ হইতে বস্ত্র ও ভূমিতে পড়িয়া মন্দিরতল সিক্ত করিতে লাগিল ! সে ক্রন্দনের রোল, পাগলের ত্রায় গদগদ বাক্য ও অদৃষ্টপূর্ব আচরণে ঠাকুরবাড়ীর ভৃত্য ও কর্মচারীরা চতুর্দিক হইতে ছুটিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল এবং ঠাকুরকে ঐরূপ ভাবাপন্ন দেখিয়া কেহ বা অবাক হইয়া শেষটা কি হয় দেখিতে লাগিল, কেহ বা ‘ও ছোট ভট্টাচার্যের পাগলামি ! আমি বলি আর কিছু—আজ কিছু বেশী বাড়াবাড়ি দেখচি’ ; কেহ বা ‘শেষে শিবের ঘাড়ে চড়ে বসবে না তো হে ? হাত ধরে টেনে আনা ভাল’ ইত্যাদি নানা কথা বলিতে লাগিল এবং রঙ্গ-রঙ্গের ঘটনাও যে হইতে থাকিল, তাহা আর বলিতে হইবে না !

ঠাকুরের কিন্তু বাহিরের ছঁশ আদৌ নাই । শিবমহিমামুভাবে তন্ময় মন তখন বাহ্যজগৎ ছাড়িয়া বহু উর্ধ্বে উঠিয়া গিয়াছে— সেখানে এ জগতের মলিন ভাবরাশি ও কথাবার্তা কখনও পৌঁছে না । কাজেই কে কি ভাবিতেছে, বলিতেছে বা ব্যঙ্গ করিতেছে, তাহা তাঁহার কানে যাইবে কিরূপে ?

গুরুভাব ও মথুরানাথ

মথুর বাবু সেদিন ঠাকুরবাড়ীতে ; তিনিও ঐ গোলমাল ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে লইয়া, শুনিতে পাইয়াই সেখানে উপস্থিত হইলেন। কর্মচারীরা সমস্ত্রমে পথ ছাড়িয়া দিল। মথুর বাবু আসিয়াই ঠাকুরকে ঐ ভাবাপন্ন দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন এবং ঐ সময়ে কোন কর্মচারী ঠাকুরকে শিবের নিকট হইতে বলপূর্ব্বক সরাইয়া আনার কথা কহায় বিশেষ বিরক্ত হইয়া বলিলেন, “যাহার মাথার উপর মাথা আছে, সে-ই যেন এখন ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে স্পর্শ করিতে যায়।” কর্মচারীরা কাজেই ভীত হইয়া আর কিছু বলিতে বা করিতে সাহসী হইল না। পরে কতকণ বাদে ঠাকুরের বাহুজগতের ছঁশ আসিল এবং ঠাকুরবাড়ীর কর্মচারীদের সহিত মথুর বাবুকে সেখানে দণ্ডায়মান দেখিয়া বালকের গায় ভীত হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, “আমি বেসামাল হয়ে কিছু করে ফেলেছি কি?” মথুরও তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, “না, বাবা, তুমি স্তব পাঠ করছিলে ; পাছে কেহ না বুঝিয়া তোমায় বিরক্ত করে, তাই আমি এখানে দাঁড়াইয়াছিলাম।”

ঠাকুর আমাদের নিকট একদিন তাঁহার সাধনকালের অবস্থা স্বরণ করিয়া বলিয়াছিলেন, “তখন তখন (সাধন-কালে) যারা এখানে আসত, এখানকার সঙ্গে থেকে তাদের অতি শীঘ্র ঈশ্বর-উদ্দীপন হোত। বরানগর থেকে দুজন আসত—তারা জেতে খাট, কৈবত্ কি জামলি এমনি একটা ; বেশ ভাল ; খুব ভক্তি-বিশ্বাস করত ও প্রায়ই আসত। একদিন পঞ্চবটীতে তাদের সঙ্গে বসে আছি—আর তাদের ভেতর একজনের

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

একটা অবস্থা হলো! দেখি বুকটা লাল হয়ে উঠেছে, চোখ ঘোর লাল, ধারা বেয়ে পড়ছে, কথা কইতে পাচ্ছে না, দাঁড়াতে পাচ্ছে না, ছ'বোতল মদ খাইয়ে দিলে যেমন হয় তেমনি! কিছুতেই তার আর সে ভাব ভাঙ্গে না। তখন ভয় পেয়ে মাকে বলি, 'মা, একে কি কল্লি? লোকে বলবে, আমি কি করে দিয়েছি! ওর বাপ-টাপ সব বাড়ীতে আছে, এখনই বাড়ী যেতে হবে।' তার বুক হাত বুলিয়ে দিই আর মাকে ঐ রকম বলি। তবে কতক্ষণ বাদে সে একটু ঠাণ্ডা হয়ে বাড়ী যায়।"

ঠাকুরের জলন্ত জীবনের সংস্পর্শে মথুর বাবুরও যে ঐরূপ একটা অদ্ভুত অবস্থার একসময়ে উদয় হইয়া তাঁহার বিশ্বাস-ভক্তি সহস্রগুণে বর্দ্ধিত হইয়া উঠে, ইহা আমরা ঠাকুরের শ্রীমুখ হইতে শুনিয়াছি। সর্বদাই আপন ভাবে বিভোর ঠাকুর একদিন তাঁহার ঘরের উত্তর পূর্ব কোণে যে লম্বা বারাণ্ডাটি পূর্ব পশ্চিমে বিস্তৃত আছে, তথায় আপন মনে গৌ-ভরে পদচারণ করিতেছিলেন! ঠাকুরবাড়ী ও পঞ্চবটীর মধ্যে যে একটি পৃথক বাড়ী আছে, যাহাকে এখনও 'বাবুদের কুঠি' বলিয়া ঠাকুরবাড়ীর কর্মচারীরা নির্দেশ করিয়া থাকে, তাহারই একটি প্রকোষ্ঠে মথুর বাবু তখন একাকী আপন মনে বসিয়াছিলেন। মথুর বাবু যেখানে বসিয়াছিলেন, সেখান হইতে ঠাকুর যেখানে বেড়াইতেছিলেন সে স্থানটির ব্যবধান বড় বেশী না হওয়ায় বেশ নজর হইতেছিল। কাজেই মথুর বাবু কখনও ঠাকুরের ঐরূপ গৌ-ভরে বিচরণ লক্ষ্য করিয়া তাঁহার বিষয় চিন্তা করিতেছিলেন, আবার কখনও বা

গুরুভাব ও মথুরানাথ

বিষয়-সম্বন্ধীয় এ কথা সে কথার মনে মনে আন্দোলন করিয়া ভবিষ্যৎ কার্যপ্রণালী নির্ধারণ করিতেছিলেন। মথুর বাবু যে বৈঠকখানায় বসিয়া ঠাকুরকে মাঝে মাঝে ঐরূপে লক্ষ্য করিতেছেন, ঠাকুর তাহা আদৌ জ্ঞাত ছিলেন না। আর জানা থাকিলেই বা কি?—দুইজনের সাংসারিক, সামাজিক ও অন্তর্গত সর্বপ্রকার অবস্থার অন্তর এতদূর যে, জানা থাকিলেও কেহ কাহারও জন্ত বড় বেশী ব্যতিব্যস্ত হইবার কারণ ছিল না। সে পক্ষে বরং ঠাকুরেরই, ঈশ্বরীয় ভাবে তন্ময় ও অগ্ৰমনা না থাকিলে, মথুর বাবুর কথা টের পাইয়া সঙ্কুচিত হইয়া সে স্থান হইতে সরিয়া যাইবার কথা ছিল। কারণ ধনী, মানী, বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন বাবু, যাহাকে ঠাকুরবাড়ীর ও রাণীর সমস্ত বিষয়ের মালিক বলিলেও চলে এবং যাহার সুনামে পড়িয়াছিলেন বলিয়াই ঠাকুর এখনও ঐ স্থান হইতে তাড়িত হন নাই, তাঁহার সম্মুখে একজন সামান্ত নগণ্য দরিদ্র পূজক ব্রাহ্মণ, যাহাকে লোকে তখন নির্বোধ, উন্মাদ, অনাচারী বলিয়াই জানিত ও বিদ্ৰোপাদি করিতেও ছাড়িত না, কেমন করিয়া ভীত, সঙ্কুচিত না হইয়া থাকে? কিন্তু ঘটনা অভাবনীয়, অচিন্তনীয় হইয়া দাঁড়াইল—মথুর বাবুই হঠাৎ ব্যস্তসমস্ত হইয়া দৌড়াইয়া ঠাকুরের নিকট আগমন করিলেন এবং প্রণত হইয়া তাঁহার পদদ্বয় জড়াইয়া ধরিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

ঠাকুর বলেন, “বল্লম, তুমি এ কি কর্চ? তুমি বাবু, রাণীর জামাই, লোকে তোমায় এমন করতে দেখলে কি বলবে? স্থির হও, ওঠ।” সে কি তা শোনে! তারপর ঠাণ্ডা হয়ে সকল কথা ভেঙ্গে বললে—অদ্ভুত দর্শন হয়েছিল! বললে—‘বাবা, তুমি বেড়াচ্ছ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

আর আমি স্পষ্ট দেখলুম, যখন এদিকে এগিয়ে আসছি, দেখছি তুমি নও, আমার ঐ মন্দিরের মা! আর যাই পেছন ফিরে ওদিকে যাচ্ছি, দেখি কি যে সাক্ষাৎ মহাদেব! প্রথম ভাবলুম চোখের ভ্রম হয়েছে; চোখ ভাল করে পুঁছে ফের দেখলুম—দেখি তাই! এইরূপ যতবার করলুম দেখলুম তাই।’ এই বলে আর কাঁদে! আমি বল্লুম ‘আমি তো কৈ কিছু জানি না, বাবু’—কিন্তু সে কি শোনে! ভয় হল, পাছে এ কথা কেউ জেনে গিন্নিকে, রাণী রাসমণিকে বলে দেয়। সেই বা কি ভাববে—হয়ত বলবে কিছু গুণ টুন্ করেছে! অনেক করে বুঝিয়ে সুঝিয়ে বলায় তবে সে ঠাণ্ডা হয়! মথুর কি সাধে এতটা করত—ভাল-বাসত? মা তাকে অনেক সময় অনেক রকম দেখিয়ে শুনিয়ে দিয়েছিল। মথুরের ঠিকুজীতে কিন্তু লেখা ছিল, বাবু, তার ইষ্টের তার উপর এতটা কৃপাদৃষ্টি থাকবে যে, শরীর ধারণ করে তার সঙ্গে সঙ্গে ফিরবে, রক্ষা করবে।”

এখন হইতে মথুরের বিশ্বাস অনেকটা পাকা হইয়া দাঁড়ায়। কারণ, ইহাই তাঁহার প্রথম আভাস পাওয়া যে প্রথম দর্শনেই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, অপরে না ঐ দর্শনের ফল বুঝিয়া নিন্দা করিলেও তাঁহার মনোভাব ও আচরণ তিনি অনেক সময় ধরিতে ও বুঝিতে পারিয়াছেন, সে ঠাকুর বাস্তবিকই সামান্য নহেন; জগদম্বা তাঁহারই প্রতি কৃপা করিয়া ঠাকুরের শরীরের ভিতরে সাক্ষাৎ বর্তমান রহিয়াছেন। এই সময় হইতেই তাঁহার মনে হয়, মন্দিরের পাষাণময়ীই বা শরীর ধারণ করিয়া তাঁহার জন্মপত্রিকার কথামত তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে

গুরুভাব ও মথুরানাথ

ফিরিতেছেন!—এখন হইতে ঠাকুরের সহিত মথুর বাবুর ঘনিষ্ঠতা বিশেষরূপে বৃদ্ধি পাইল।

মথুরের বাস্তবিকই মহাভাগ্যোদয় হইয়াছিল! শাস্ত্র বলেন,
যতদিন শরীর থাকিবে ততদিন ভাল-মন্দ দুই প্রকার
কর্ম মানুষকে করিতে হইবেই হইবে—সাধারণ
মানুষের তো কথাই নাই, মুক্ত পুরুষদিগেরও!
সাধারণ মানব স্বয়ংই নিজ সুকৃত-দুষ্কৃতের ফল ভোগ
করে। এখন মুক্ত পুরুষদিগের শরীরকৃত পাপপুণ্যে ফলভোগ
করে কে? তাঁহারা তো আর নিজে উহা করিতে পারেন না?
কারণ সুখদুঃখাদি ভোগ করিবে যে অভিমান-অহংকার,
তাহা তো চিরকালের মত তাঁহাদের ভিতর হইতে উড়িয়া-পুড়িয়া
গিয়াছে; তবে উহা করে কে? আবার কর্মফল তো অবশ্যস্বাধী
এবং মুক্ত পুরুষদিগের শরীরটা যতদিন জীর্ণ পত্রের মত পড়িয়া
না যায়, ততদিন তো উহার দ্বারা ভাল-মন্দ কতকগুলি কাজ
হইবেই হইবে। শাস্ত্র এখানে বলেন—যে সকল বদ্ধ পুরুষেরা
তাঁহাদের সেবা করে, ভালবাসে, তাহারাই মুক্তাত্মাদিগের কৃত
শুভকর্মের এবং যাঁহারা তাঁহাদের ঘেঁষ করে, তাহারাই তাঁহাদের
শরীরকৃত অশুভ কর্মের ফল ভোগ করিয়া থাকে।^১ সাধারণ মুক্ত

১ বেদান্তসূত্র, ৩য় অধ্যায়, ৩য় পাদ, ২৬ সূত্রের শাস্ত্রভাষ্যে এইরূপ লিখিত
আছে—তথা শাট্যায়নিনঃ পঠন্তি—“তস্য পুত্রা দারম্পযন্তি মুহূদঃ সাধুকৃত্যাং
দ্বিষন্তঃ পাপকৃত্যাম্” ইতি। তথৈব কোষীতকিনঃ—“তৎ সুকৃতদুষ্কৃতে বিধুদুতে
তস্য প্রিয়াঃ জ্ঞাতয়ঃ সুকৃতমুপবন্ত্যপ্রিয়া দুষ্কৃতম্” ইতি।

পরবর্তী ভাষ্যেও ঐ বিষয়ের উল্লেখ আছে।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

পুরুষদিগের সেবার দ্বারাই যদি ঐরূপ ফললাভ হয়; তবে ঈশ্বরাবতারদিগের ভক্তিপ্রীতিপূর্ণ সেবার যে কতদূর ফল তাহা কে বলিতে পারে?

দিনের পর দিন যতই চলিয়া যাইতে লাগিল, মথুর বাবুও ততই ঠাকুরের গুরুভাবের পরিচয় স্পষ্ট—স্পষ্টতর পাইতে থাকিয়া,

ঠাকুরের প্রতি অবিচলা ভক্তি করিতে লাগিলেন।

ঠাকুরের দিন-
দিন গুরুভাবের
অধিকতর
বিকাশ ও
মথুরের
তাঁহাকে
পরীক্ষা করিয়া
অনুভব

ইতিমধ্যে অনেক ঘটনা হইয়া গেল; যথা—

ভগবদ্বিরহে ঠাকুরের বিষম গাত্রদাহ ও তাহার

চিকিৎসা; ব্রাহ্মণী ভৈরবীর দক্ষিণেশ্বরে শুভাগমন

ও বৈষ্ণবগ্রন্থ হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া মথুর

বাবুর দ্বারা আহূত পণ্ডিতমণ্ডলীর সম্মুখে ঠাকুরের

অবতারত্ব-প্রতিপাদন; মহা বৈদান্তিক জ্ঞানী

তোতাপুরীর আগমন ও ঠাকুরের সন্ন্যাসগ্রহণ; ঠাকুরের বৃদ্ধা জননীর

দক্ষিণেশ্বরে আগমন ও বাস ইত্যাদি, ইত্যাদি। কিন্তু পূর্বোক্ত

অদ্ভুত দর্শনের দিন হইতে মথুরানাথ ঠাকুরের জীবনের প্রায়

সকল দৈনন্দিন ঘটনাবলীর সহিতই বিশেষভাবে সম্বন্ধ। ঠাকুরের

চিকিৎসার জ্ঞাত মথুর কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ ৩গঙ্গাপ্রসাদ

সেন ও ডাক্তার ৩মহেন্দ্রলাল সরকারকে দেখাইবার বন্দোবস্ত

করিয়া দিলেন; ঠাকুরের শ্রীশ্রীজগদম্বাকে, পশ্চিমী স্ত্রীলোকেরা

যে রূপ পাইজোর প্রভৃতি অলঙ্কার ব্যবহার করেন, সেইরূপ

পর্যায়ের সাধ হইল—মথুর তৎক্ষণাৎ তাহা গড়াইয়া দিলেন;

ঠাকুর বৈষ্ণবতন্ত্রোক্ত সখীভাব-সাধনকালে স্ত্রীলোকদিগের

শ্রায় বেষণভূষা করিবেন এরূপ ইচ্ছা হইল—মথুরানাথ তৎক্ষণাৎ

গুরুভাব ও মথুরানাথ

এক 'হুট' ডায়মনকাটা অলঙ্কার, বেনারসী শাড়ী, ওড়না প্রভৃতি আনাইয়া দিলেন; পানিহাটির উৎসব দেখিবার ঠাকুরের সাধ জানিয়া মথুর তৎক্ষণাৎ তাহার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াই যে কাস্ত থাকিলেন তাহা নহে, পাছে সেখানে ভিড়-ভাড়ে তাঁহার কষ্ট হয় ভাবিয়া নিজে গুপ্তভাবে দারোগ্যান সঙ্গে লইয়া ঠাকুরের শরীররক্ষা করিতে যাইলেন। এইরূপে প্রতি ব্যাপারে মথুরের অদ্ভুত সেবার কথা যেমন আমরা একদিকে শুনিয়াছি, তেমনি আবার অপরদিকে নষ্টস্বভাবা স্ত্রীলোকদিগকে লাগাইয়া ঠাকুরের মনে অসৎ ভাবের উদয় হয় কি না পরীক্ষা করার কথা, ঠাকুরবাড়ীর দেবোত্তর সম্পত্তি ঠাকুরের নামে সমস্ত লিখিয়া পড়িয়া দিবার প্রস্তাবে ঠাকুর ভাবাবস্থায় "কি ! আমাকে বিষয়ী করিতে চাস্ ?"— বলিয়া মথুরের উপর বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া প্রহার করিতে যাইবার কথা জমিদারী-সংক্রান্ত দাঙ্গা-হাঙ্গামায় লিপ্ত হইয়া নরহত্যার অপরাধে রাজদ্বারে বিশেষভাবে দণ্ডিত হইবার ভয়ে ঐ বিপদ হইতে উদ্ধার-কামনায় ঠাকুরের নিকট সকল দোষ স্বীকার করিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইয়া মথুরের ঐ বিপদ হইতে নিস্তার পাইবার কথা প্রভৃতি অনেক কথাও ঠাকুরের শ্রীমুখ হইতে শুনিয়াছি। ঐ সকল ঘটনা হইতেই আমরা মথুর বাবুর মনে যে ঠাকুরের প্রতি ক্রমে ক্রমে ভক্তি দৃঢ়া অচলা হইয়া আসিতেছিল ইহার পরিচয় পাইয়া থাকি। আর ঐরূপ না হইয়া অন্তরূপই বা হয় কিরূপে? ঠাকুরের অদ্ভুত অলৌকিক দেবচূর্ণ স্বভাব যেমন একদিকে মথুরের সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া দিনের পর দিন অধিকতর সমৃদ্ধল ভাব ধারণ করিল,

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

অপরদিকে তেমনি ঠাকুরের অপার অহেতুক ভালবাসা মথুরের হৃদয় অধিকার করিয়া বসিল। মথুর দেখিলেন, লক্ষ লক্ষ টাকা সম্পত্তি দিয়াও ইহাকে ত্যাগীর ভাব হইতে হটাইতে পারিলাম না, সুন্দরী নারীগণের দ্বারা ইহার মনের বিকার উপস্থিত করিতে পারিলাম না, পার্থিব মান-যশেও—কারণ মানুষকে মানুষ ভগবান বলিয়া পূজা করা অপেক্ষা অধিক মান আর কি দিতে পারে—ইহাকে কিছুমাত্র টলাইতে বা অহঙ্কৃত করিতে পারিলাম না, পার্থিব কোন বিষয়েরই ইনি প্রার্থী নন—অথচ তাঁহার চরিত্রের সমস্ত দুর্বলতার কথা জানিয়াও তাঁহাকে ঘৃণা করিতেছেন না, আপনার হইতেও আপনার করিয়া ভালবাসিতেছেন, বিপদ হইতে বার বার উদ্ধার করিতেছেন, আর কিসে তাঁহার সর্বোচ্চ কল্যাণ হয় তাহাই চিন্তা করিতেছেন!—ইহার কারণ কি? বুঝিলেন, ইনি মনুষ্যশরীরধারী হইলেও ‘যে দেশে রজনী নাই’ সেই দেশের লোক! ইহার ত্যাগ অদ্ভুত, সংযম অদ্ভুত, জ্ঞান অদ্ভুত, ভক্তি অদ্ভুত, সকল প্রকার কর্ম অদ্ভুত এবং সর্বোপরি তাঁহার গায় দুর্বল অথচ অহঙ্কৃত জীবের উপর ইহার করুণা ও ভালবাসা অদ্ভুত!

আর একটি কথাও মথুরানাথ সঙ্গে সঙ্গে প্রাণে প্রাণে অনুভব করিলেন—এ অদ্ভুত চরিত্রের মাধুর্য! এমন অলৌকিক ঐশী শক্তির বিকাশ ইহার ভিতর দিয়া হইলেও ইনি নিজে যে বালক, সেই বালক! এতটুকু অহঙ্কার নাই—এ কি চমৎকার ব্যাপার! নিজের ভিতর যে কোন ভাব উঠুক না কেন, পঞ্চম-বর্ষীয় শিশুর গায় তাঁহার এতটুকু লুকানো নাই। ভিতরে-

গুরুভাব ও মথুরানাথ

বাহিরে নিরন্তর এক ভাব। যাহা মনে, তাহাই অকপটে মুখে ও কার্যে প্রকাশ—অথচ অগ্নের যাহাতে কোনরূপ হানি হইতে পারে তাহা কখনও বলা নাই—নিজের শারীরিক কষ্ট হইলেও তাহা বলা নাই! ইহা কি মানবে সম্ভব?

মথুরানাথের কালীঘাটের হালদার পুরোহিত ঠাকুরের প্রতি মথুর বাবুর অবিচলা ভক্তি দেখিয়া হিংসায় জ্বরজ্বর; ভাবে—

মথুরের ভক্তি-
বুদ্ধি দেখিয়া
হালদার
পুরোহিত

‘লোকটা বাবুকে কোনরূপ গুণ টুন্ করিয়া ঐরূপ বশীভূত করিয়াছে’; ভাবে—‘তাই তো, বাবুটাকে হাত করবার আমার এতকালের চেষ্টাটা এই লোকটার জন্ত সব পণ্ড? আবার সরল বালকের

ভান দেখায়। যদি এতই সরল তো বলে দিক ‘বশীকরণের’ ক্রিয়াটা। আমার যত বিদ্যা সব ঝেড়ে ঝেড়ে বাবুটা একটু বাগে আসছিল, এমন সময় এ আপদ কোথা হতে এল?’

এদিকে মথুরের ভক্তিবিশ্বাস যতই বাড়িতে থাকিল, ততই ঠাকুরের সঙ্গে সদাসর্বক্ষণ কি করিয়া থাকিতে পাইব, কি করিয়া তাঁহার আরও অধিক সেবা করিতে পাইব—এই সকল চিন্তাই বলবতী হয়। সেজন্ত মাঝে মাঝে ঠাকুরকে অনুরোধ-নির্বন্ধ করিয়া কলিকাতায় জানবাজারের বাটীতে নিজের কাছে আনিয়া রাখেন; অপরাহ্নে ‘বাবা, চল বেড়াইয়া আসি’ বলিয়া সঙ্গে করিয়া গড়ের মাঠ প্রভৃতি কলিকাতার নানাস্থানে বেড়াইয়া লইয়া আসেন। ‘বাবাকে কি যাহাতে তাহাতে খাইতে দেওয়া চলে?’—ভাবিয়া স্বর্ণ ও রৌপ্যের এক ‘স্ট’ বাসন নূতন গড়াইয়া তাহাতে ঠাকুরকে অন্ন-পানীয় দেন; উত্তম উত্তম বস্ত্র পরিচ্ছদ

শ্রী শ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

প্রভৃতি পরাইয়া দেন, আর বলেন—‘বাবা, তুমিই তো এই সকলের (বিষয়ের) মালিক, আমি তোমার দেওয়ান বই তো নয় ; এই দেখ না তুমি সোনার খালে, রূপার বাটি-গেলাসে খাইবার পর ঐ সকলের দিকে আর না দেখিয়া ফেলিয়া রাখিয়া চলিয়া গেলে, আর আমি আবার তুমি খাইবে বলিয়া সে সমস্ত মাজাইয়া ঘসাইয়া তুলিয়া রাখি, চুরি গেল কি না দেখি, ভাঙ্গা ফুটা হইল কি না খবর রাখি, আর এই সব লইয়াই ব্যস্ত থাকি ।’

এই সময় এক জোড়া বেনারসী শালের দুর্দশার কথা আমরা ঠাকুরের শ্রীমুখে শুনিয়াছিলাম। মথুর উহা সহস্র মুদ্রা মূল্যে

ক্রয় করেন এবং অমন ভাল জিনিস আর কাহাকে
বেনারসী
শালের দুর্দশা
দিব ভাবিয়া, নিজের হাতে ঠাকুরের শ্রীঅঙ্গে উহা

জড়াইয়া দিয়া মহানন্দ লাভ করেন। শাল জোড়াটি বাস্তবিকই মূল্যবান—কারণ উহার তখনকার (৫০ বৎসর পূর্বের) দামই যখন অত ছিল, তখন বোধ হয় সে প্রকার জিনিস এখন আর দেখিতেই পাওয়া যায় না। শালখানি পরিয়া ঠাকুর প্রথম বালকের মত মহা আনন্দিত হইয়া এদিক ওদিক করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, বার বার উহা নিজে দেখিতে লাগিলেন এবং অপরকে ডাকিয়া দেখাইতে ও মথুর বাবু উহা এত দরে কিনিয়া দিয়াছেন ইত্যাদি বলিতে লাগিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই বালকের ন্যায় ঠাকুরের মনে অন্য ভাবের উদয় হইল ! ভাবিলেন—“এতে আর আছে কি ? কতকগুলো ছাগলের লোম বই তো নয় ? যে পঞ্চভূতের বিকারে সকল জিনিস, সেই পঞ্চভূতেই তো এটাও তৈরী হয়েছে ; আর শীত-নিবারণ—তা লেপক্বেলেও যেমন হয়,

গুরুভাব ও মথুরানাথ

এতেও তেমনি ; অণ্ড সকল জিনিসের গায় এতেও সচ্চিদানন্দ লাভ হয় না ; বরং গায়ে দিলে মনে হয় আমি অপর সকলের চেয়ে বড়, আর অভিমান অহঙ্কার বেড়ে মাহুষের মন ঈশ্বর থেকে দূরে গিয়ে পড়ে ! এতে এত দোষ !” এই সকল কথা ভাবিয়া শালখানি ভূমিতে ফেলিয়া—ইহাতে সচ্চিদানন্দ লাভ হয় না, ‘থু থু’ বলিয়া থুতু দিতে ও ধূলিতে ঘসিতে লাগিলেন এবং পরিশেষে অগ্নি জালিয়া পুড়াইবার উপক্রম করিলেন ! এমন সময় কে সেখানে আসিয়া পড়িয়া উহা তাঁহার হস্ত হইতে উদ্ধার করে ! মথুর বাবু শালখানির ঐরূপ দুর্দশা হইয়াছে জানিয়াও কিছুমাত্র দুঃখিত হন নাই । বলিয়াছিলেন—‘বাবা বেশ করেছেন ।’

উপরে লিখিত ঘটনাদি হইতেই বেশ বুঝা যায়—মথুর বাবুর ঠাকুরকে নানা ভোগ-সুখ ও আরামের ভিতর রাখিবার চেষ্টা করিলেও ঠাকুরের মন কত উচ্ছে, কোথায় ঠাকুরের নিরন্তর থাকিত ! যেখানেই থাকুক না কেন, এ নিলিপ্ততা মন সর্বদা আপন ভাবে বিভোর । অপর সকল যেখানে কেবল অন্ধকারের উপর অন্ধকাররাশিই পুঞ্জীকৃত দেখে, সেখানে এ মন দেখে—আলোয় আলো—ছায়াবিহীন হ্রাসবৃদ্ধি-রহিত আলো—যে আলোর সম্মুখে চন্দ্র-সূর্য-তারকার উজ্জ্বলতা, বিদ্যুতের চক্ৰকানি, অগ্নির তো ‘কা কথা’—সব মিটমিটে, প্রায় অন্ধকারতুল্য ! সেই আলোকময় রাজ্যেই এ মনের নিরন্তর থাকা ! আর এই হিংসাদ্বেষকপটতাপূর্ণ কামক্রোধের চির-আবাসভূমি এই রাজ্যে, যেন এ মনের দু’দিনের জন্ম করুণায় বেড়াইতে আসা, এইমাত্র ! অতএব মথুর বাবুর ভোগসুখ-

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

বিলাসিতাপূর্ণ জানবাজারের বাড়ীতে থাকিলেও যে ঠাকুর সেই ঠাকুর—নির্লিপ্ত, নিরহঙ্কার, আপন ভাবে আপনি নিশি-দিন মাতোয়ারা !

জানবাজারের বাড়ীতে সন্ধ্যার প্রাক্কালে ঠাকুর একদিন অর্ধবাহু দশায় পড়িয়া আছেন, নিকটে কেহ নাই। ঠাকুরের সমাধি ভাঙিতেছে; বাহুজগতের অল্পে অল্পে হালদার ছঁশ আসিতেছে। এমন সময় পূর্বোক্ত হালদার পুরোহিত আসিয়া উপস্থিত। ঠাকুরকে একাকৌ তদবস্থ দেখিয়াই ভাবিল, ইহাই সময়। নিকটে যাইয়া এদিক্ ওদিক্ চাহিয়া ঠাকুরের শ্রীঅঙ্গ ঠেলিতে ঠেলিতে বার বার বলিতে লাগিল—‘অ বামুন, বল্ না—বাবুটাকে কি করে হাত করুলি ? কি করে বাগালি, বল্ না ? ঢঙ্ করে চূপ করে রইলি যে ? বল্ না ?’ বার বার ঐরূপ বলিলেও ঠাকুর যখন কিছুই বলিলেন না বা বলিতে পারিলেন না—কারণ ঠাকুরের তখন কথা কহিবার মত অবস্থাই ছিল না—তখন কুপিত হইয়া ‘ঘা শালা বল্লি না’ বলিয়া সজোরে পদাঘাত করিয়া অগ্ৰত্ৰ গমন করিল। নিরভিমান ঠাকুর মথুর বাবু এ কথা জানিতে পারিলে ক্রোধে ব্রাহ্মণের উপর একটা বিশেষ অত্যাচার করিয়া বসিবে বুঝিয়া চূপ করিয়া রহিলেন। পরে—কিছুকাল পরে—অগ্ৰ অপরাধে মথুর বাবুর কোপে পড়িয়া ব্রাহ্মণ তাড়িত হইলে একদিন কথায় কথায় মথুরানাথকে ঐ কথা বলেন। শুনিয়া মথুর ক্রোধে বলিয়াছিলেন, “বাবা, এ কথা আমি আগে জানলে বাস্তবিকই ব্রাহ্মণের মাথা থাকত না।”

গুরুভাব ও মথুরানাথ

ঠাকুরের গুরুভাবে অপার করণার কথা সঙ্গীক মথুর বাবু
প্রাণে প্রাণে যে কতদূর অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন
এবং তাঁহাকে সাক্ষাৎ দেবতাজ্ঞানে যে কতদূর
আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন, তাহার বিশিষ্ট পরিচয়
আমরা পাইয়া থাকি—ঠাকুরের নিকট তাঁহাদের
উভয়ের কোন কথা গোপন না রাখায়। উভয়েই
জানিতেন ও বলিতেন, “বাবা মানুষ নন; গুর
কাছে কথা লুকিয়ে কি করবো? উনি সকল
জানতে পারেন, পেটের কথা সব টের পান!”

ঠাহারা উভয়ে যে ঐ প্রকারে কথার কথা মাত্র বলিতেন
তাহা নহে—কার্য্যতঃও সকল বিষয়ে ঠিক ঠিক ঐরূপ অনুষ্ঠান
করিতেন। বাবাকে লইয়া একত্রে আহার-বিহার এবং এক
শয্যায় কতদিন শয়ন পর্য্যন্ত উভয়ে করিয়াছেন! বাবা
সকল সময়ে সর্বাবস্থায় অন্তরে অবাধ গমনাগমন করিবেন,
তাহাতে কি? উনি অন্তরে না যাইলেই বা কি?—বাড়ীর
স্ত্রী-পুরুষ সকলের সকল প্রকার মনোভাব যে জানেন
ইহার পরিচয় ঠাহারা অনেক সময় পাইয়াছেন। আর
পুরুষের, স্ত্রীলোকদের সহিত মিশিবার যে প্রধান অনর্থ—
মানসিক বিকার, সে সম্বন্ধে বাবাকে ঘরের দেয়াল বা অশ্রু
কোন অচেতন পদার্থবিশেষ বলিলেও চলে! অন্তরের কোন
স্ত্রীলোকেরই মনে তো বাবাকে দেখিয়া, অপর কোন পুরুষকে
দেখিয়া যেরূপ সঙ্কোচ-লজ্জার ভাব আসে, সেরূপ আসে না।
মনে হয় যেন তাঁহাদেরই একজন, অথবা একটি পাঁচ বছরের

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

ছেলে ! কাজেই সখীভাবে ভাবিত ঠাকুর স্ত্রীজনোচিত বেশভূষা পরিয়া ৮দুর্গাপূজার সময়ে অন্তরের স্ত্রীলোকদিগের সহিত বাহিরে আসিয়া প্রতিমাকে চামর-বীজন করিতেছেন, কখন বা কোন যুবতীর স্বামীর আগমনে তাহাকে সাজাইয়া-গুজাইয়া বেশভূষা পরাইয়া স্বামীর সাহত কি ভাবে কথাবার্তা করিতে হয়, তাহা কানে কানে শিখাইতে শিখাইতে শয়নমন্দিরে স্বামীর পার্শ্বে বসাইয়া দিয়া আসিতেছেন—এরূপ অনেক কথা ঠাকুরের শ্রীমুখ হইতে জানিয়া আমরা ইহাদের ঠাকুরের উপর কি এক অপূর্ব ভাব ছিল, ভাবিয়া অবাক হইয়া থাকি ! ঠাকুরের গুরুভাবে এই সকল স্ত্রীলোকদিগের মনে তাঁহার প্রতি দেবতাজ্ঞান যেমন সূদৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তেমনি আবার তাঁহার অহেতুক ভালবাসার বিশেষ পরিচয় পাইয়া ইহারা তাঁহাকে কতদূর আপনার হইতেও আপনার করিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন, কতদূর নিঃসঙ্কোচে তাঁহার নিকটে উঠা-বসা ও অন্য সকল চেষ্টা ব্যবহারাদি করিতেন, তাহা আমরা কল্পনাতেও ঠিক ঠিক আনিতে পারি না।

একদিকে ঠাকুরের মথুর বাবুর বাটীর স্ত্রীলোকদিগের সহিত যেমন অমানুষী কামগন্ধহীন স্বার্থমাত্রশূন্য সখীর ন্যায় ভালবাসার প্রকাশ, অপর দিকে আবার বাহিরে পুরুষদিগের ঠাকুরে বিপরীত নিকট পণ্ডিতমণ্ডলীর মাঝে দিব্যজ্ঞান ও অল্পমম ভাবের একত্র বুদ্ধির সহিত ব্যবহারাদি দেখিলে মনে হয়, সমাবেশ

এ বহু-বিপরীত ভাবের একত্র সম্মিলন তাঁহার ভিতরে কিরূপে হইয়াছিল ? এ বহুরূপী ঠাকুর কে ?

গুরুভাব ও মথুরানাথ

দক্ষিণেশ্বর ঠাকুরবাটীতে ৩রাধাগোবিন্দের বিগ্রহমূর্তিষয়
তখন প্রতিদিন প্রাতে পার্শ্বের শয়নঘর হইতে মন্দিরমধ্যে

দক্ষিণেশ্বরে
বিগ্রহমূর্তি
ভগ্ন হওয়ার
বিধান লইতে
পণ্ডিত-সভার
আহ্বান

সিংহাসনে আনিয়া বসান হইত এবং পূজা ভোগ-
রাগাদির অস্ত্রে দুই প্রহরে পুনরায় শয়নমন্দিরে
বিশ্রামের জন্তু রাখিয়া আসা হইত। আবার
অপরাহ্নে বেলা চারিটার পর সেখান হইতে সিংহা-
সনে আনিয়া পুনরায় সাক্ষ্য আরাত্রিক ও ভোগ-
রাগাদির অস্ত্রে রাত্রে রাখিয়া আসা হইত।

মন্দিরের মর্শ্বর পাথরের মেজে একদিন জল পড়িয়া পিছল
হওয়ায় ঠাকুর লইয়া যাইবার সময় পড়িয়া গিয়া পূজক ব্রাহ্মণ
৩গোবিন্দজীর মূর্তিটির পা ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন! একেবারে ছলস্থূল
পড়িয়া গেল। পূজারী তো নিজে আঘাত পাইলেন, আবার ভয়ে
কম্পমান! বাবুদের নিকট সংবাদ পৌঁছিল। কি হইবে? ভাঙ্গা
বিগ্রহে তো পূজা চলে না—এখন উপায়? রাণী রাসমণি ও
মথুর বাবু উপায়-নির্দ্ধারণের জন্তু শহরের সকল খ্যাতিনামা
পণ্ডিতদের সম্মুখে আহ্বান করিয়া সভা করিলেন। যে সকল
পণ্ডিতেরা কার্য্যবশতঃ উপস্থিত হইতে পারিলেন না, তাঁহাদেরও
মতামত সংগৃহীত হইতে লাগিল। একেবারে হৈ-চৈ ব্যাপার
এবং পণ্ডিতবর্গের সম্মানরক্ষার জন্তু বিদায়-আদায়ে টাকারও
প্রাধিক! পণ্ডিতেরা পাঁজি-পুঁথি খুলিয়া বারবার বুদ্ধির গোড়ায়
নশ্ত দিয়া বিধান দিলেন—‘ভগ্ন মূর্তিটি গঙ্গার জলে ফেলিয়া
দেওয়া হউক এবং তৎস্থলে অগ্ন্য নূতন মূর্তি স্থাপিত হউক।’
কারিকরকে নূতন মূর্তিগঠনের আদেশ দেওয়া হইল।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

সভাভঙ্গকালে মথুর বাবু রাণীমাতাকে বলিলেন”, ছোট ভট্টাচার্য মহাশয়কে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা তো হয় নাই? তিনি কি বলেন

জানিতে হইবে”—বলিয়া ঠাকুরকে ঐ বিষয়ে মতামত
ঠাকুরের
সীমাংসা ও ঐ
বিষয়ের শেষ
কথা

জিজ্ঞাসা করিলেন। ঠাকুর ভাবমুখে বলিতে
লাগলেন, “রাণীর জামাইদের কেউ যদি পড়ে পা
ভেঙ্গে ফেলত, তবে কি তাকে ত্যাগ করে আর

একজনকে তার জায়গায় এনে বসান হত—না তার চিকিৎসার
ব্যবস্থা করা হত? এখানেও সেই রকম করা হোক—মূর্তিটি
জুড়ে যেমন পূজা হচ্ছে তেমনি পূজা করা হোক। ত্যাগ
করতে হবে কিসের জন্ত?” সকলে ব্যবস্থা শুনিয়া অবাক!
তাই তো, কাহারও মাথায় তো এ সহজ যুক্তিটি আসে নাই?
মূর্তিটি যদি ৩গোবিন্দজীর দিব্য আবির্ভাবে জীবন্ত বলিয়া
স্বীকার করিতে হয়, তবে সে আবির্ভাব তো ভক্তের হৃদয়ের
গভীর ভক্তি-ভালবাসা-সাপেক্ষ, ভক্তের প্রতি কৃপা বা করুণায়
হৃদয়ে শ্রদ্ধা-ভক্তি-ভালবাসা থাকিলে সে আবির্ভাব ভগ্ন মূর্তিতেই
বা না হইতে পারে কেন? মূর্তিভঙ্গের দোষাদোষ তো আর
সে আবির্ভাবকে স্পর্শ করিতে পারে না! তারপর, যে
মূর্তিটিতে শ্রীভগবানের এতকাল পূজা করিয়া হৃদয়ের ভালবাসা
দিয়া আসিয়াছি, আজ তাহার অঙ্গবিশেষের হানি হওয়াতে
যথার্থ ভক্তের হৃদয় হইতে কি ভালবাসার সঙ্গে সঙ্গে হানি হইতে
পারে? আবার বৈষ্ণবাচার্য্যগণ ভক্তকে ঠাকুরের আত্মবৎ সেবা
করিতেই উপদেশ দিয়া থাকেন। আপনি যখন যে অবস্থায়
ঘাহা করিতে ভালবাসি, ঠাকুরও তাহাই ভালবাসেন ভাবিয়া

গুরুভাব ও মথুরানাথ

সেইরূপ করিতেই বলেন। সে পক্ষ হইতেও মূর্তিটির ত্যাগের ব্যবস্থা হইতে পারে না। অতএব স্থতিতে যে ভগ্ন মূর্তিতে পূজাদি করিবে না বলিয়া বিধান আছে তাহা প্রেমহীন, ভক্তিপথে সবেমাত্র অগ্রসর ভক্তের জন্মই নিশ্চয়। যাহা হউক, অভিমানী পণ্ডিতবর্গের কাহারও কাহারও ঠাকুরের মীমাংসার সহিত মতভেদ হইল, কেহ বা আবার মতভেদ-প্রকাশে বিদায়-আদায়ের ক্রটি হইবার সম্ভাবনা ভাবিয়া স্বীয় মত পরিষ্কার প্রকাশ করিলেন না! আর ঠাহারা পাণ্ডিত্যের সহায়ে একটু যথার্থ জ্ঞান-ভক্তি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, ঠাহারা ঠাকুরের ঐ মীমাংসা শুনিয়া ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন। পরে ঠাকুর স্বহস্তে মূর্তিটি জুড়িয়া দিলেন ও ঠাহার পূজাদি পূর্ববৎ চলিতে লাগিল। কারিকর নূতন মূর্তি একটি গড়িয়া আনিলে, উহা ৬গোবিন্দজীর মন্দিরমধ্যে একপার্শ্বে রাখিয়া দেওয়া হইল মাত্র — উহার প্রতিষ্ঠা আর করা হইল না। রাণী রাসমনি ও মথুর বাবু পরলোকগমন করিলে, ঠাহাদের বংশধরগণের কেহ কেহ কখন কখন ঐ নূতন মূর্তিটির প্রতিষ্ঠার আয়োজন করিয়াছিলেন, কিন্তু কোন না কোন সাংসারিক বিঘ্ন সেই সেই কালে উপস্থিত হওয়ায় ঐ কার্য স্থগিত রাখিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কাজেই ৬গোবিন্দজীর নূতন মূর্তিটি এখনও সেইভাবেই রাখা আছে।



সপ্তম অধ্যায়

গুরুভাবে মথুরের প্রতি কৃপা

অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্বভূতাশয়স্থিতঃ

অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামস্তু এব চ ॥ —গীতা, ১০।২০

এ বৎসর মথুরানাথের জানবাজারের বাটীতে ৬দুর্গোৎসবে বিশেষ আনন্দ। কারণ শ্রীশ্রীজগদম্বার পূজায় বৎসরে বৎসরে আবালবৃদ্ধবনিতার যে একটা অনির্বাচনীয় আনন্দ জানবাজারে মথুরের বাটীতে ঠাকুরকে লইয়া ৬দুর্গোৎসবের কথা তাহা তো আছেই, তাহার উপর 'বাবা' আবার কয়েকদিন হইতে মথুরের বাটী পবিত্র করিয়া ঐ আনন্দ সহস্রগুণে বর্দ্ধিত করিয়াছেন। কাজেই আনন্দের আর পরিসীমা নাই। মা-র নিকটে বালক যেমন আনন্দে আটখানা হইয়া নির্ভয়ে আব্দার, অনুরোধ ও হেতুরহিত হাস্য-নৃত্যাদির চেষ্টা করিয়া থাকে, নিরন্তর ভাবাবেশে প্রতিমাতে জগন্নাথার সাক্ষাৎ আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করিয়া 'বাবার' সেইরূপ অপূর্ব আচরণে প্রতিমা বাস্তবিকই জীবন্ত জ্যোতির্ঝয়ী হইয়া যেন হাসিতেছেন! আর ঐ প্রতিমাতে মা-র আবেশ ও ঠাকুরের দেবদুর্লভ শরীর-মনে মা-র আবেশ একত্র সম্মিলিত হওয়ার পূজার দালানের বায়ুমণ্ডল কি একটা অনির্বাচনীয়, অনির্দেশ্য সাত্ত্বিক ভাবপ্রকাশে পূর্ণ বলিয়া অতি জড়মনেরও

গুরুভাবে মথুরের প্রতি কৃপা

অনুভূতি হইতেছে। দালান জন্ম জন্ম করিতেছে—উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। আর বাটার সর্বত্র যেন সেই অদ্ভুত প্রকাশে অপূর্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে!

হইবারই কথা। ধনী মথুরের রাজসিক ভক্তি, ঘর দ্বার ও মা-র প্রতিমা বিচিত্র সাজে সাজাইতে, পত্র পুষ্প ফল মূল মিষ্টান্নাদি পূজার দ্রব্যসম্ভারের অপৰ্যাপ্ত আয়োজনে এবং নহবতাদি বাণ্য-ভাণ্ডের বাহুল্যে মনোনিবেশ করিয়া বাহিরের কিছুই যেমন ক্রটি রাখে নাই, তেমনি আবার এ অদ্ভুত ঠাকুরের অলৌকিক দেবভাব বাহিরের ঐ জড় জিনিসসকলকে স্পর্শ করিয়া উহাদের ভিতর সত্যসত্যই একটা প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া দিয়াছে! কাজেই তুষারমণ্ডিত হিমালয়বক্ষে চিরশ্যামল দেবদারুকুঞ্জের গম্ভীর সৌন্দর্য্যে সাধু-তপস্বীর গৈরিক বসন যে শাস্তিময় শোভা আনয়ন করে, সুন্দরী রমণীর কোলে স্তম্ভপায়ী সুন্দর শিশু যে করুণামাথা সৌন্দর্য্যের বিস্তার করে, সুন্দর মুখে পবিত্র মনোভাব যে অপূর্ব প্রকাশ আনিয়া দেয়, মথুর বাবুর মহাভাগ্যোদয়ে তাঁহার ভবনে আজ সেই সৌন্দর্য্যের বিচিত্র সমাবেশ! পূজাসংক্রান্ত নানা কার্য্যের সুবন্দোবস্তে নিরন্তর ব্যস্ত থাকিলেও বাবু ও তাঁহার গৃহিণী যে ঐ ভাবসৌন্দর্য্য প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়া এক অব্যক্ত আনন্দে পূর্ণ হইতেছিলেন, একথা আর বলিতে হইবে না।

দিবসের পূজা শেষ হইল। তাঁহারাও কোনরূপে একটু সময় করিয়া 'বাবার' ও জগন্নাতার শ্রীচরণে মহানন্দে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিলেন।

সন্ধ্যা সমাগতা। এইবার শ্রীশ্রীজগন্নাতার আরাত্রিক হইবে।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

‘বাবা’ এখন অন্তরে বিচিত্রভাবে আকিষ্ট হইয়া তাঁহার
পুরুষ-শরীরের কথা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছেন !
ঠাকুরের ভাব-
সমাধি ও রূপ
কথায়, চেষ্টায় কেবলই প্রকাশ—যেন তিনি জন্মে-
জন্মে যুগে যুগে শ্রীশ্রীজগন্নাথার দাসী বা সখী ;
জগদম্বাই তাঁহার প্রাণ-মন, সর্বস্বের সর্বস্ব ; মা-র সেবার জগুই
তাঁহার দেহ ও জীবনধারণ । ঠাকুরের মুখমণ্ডল ভাবে প্রেমে
সমুজ্জ্বল, অধরে মৃদু মৃদু হাসি ; চক্ষুর চাহনি, হাত-পা-নাড়া,
অঙ্গভঙ্গী প্রভৃতি সমস্তই স্ত্রীলোকদিগের গ্রায় ! ঠাকুরের পরিধানে
মথুরবাবু-প্রদত্ত সুন্দর গরদের চেলি—স্ত্রীলোকদিগের গ্রায় করিয়া
পরিয়াছেন—কে বলিবে যে, তিনি পুরুষ ! ঠাকুরের রূপ তখন
বাস্তবিকই যেন ফাটিয়া পড়িত—এমন সুন্দর রং ছিল ;
ভাবাবেশে সেই রং আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিত, শরীর দিয়া যেন
একটা জ্যোতিঃ বাহির হইত ! সে রূপ দেখিয়া লোকে চক্ষু
ফিরাইয়া লইতে পারিত না, অবাক হইয়া চাহিয়া থাকিত !
শ্রীশ্রীমা-র মুখে শুনিয়াছি, ঠাকুর শ্রীঅঙ্গে যে স্বর্ণ-ইষ্ট-কবচখানি
তখন সর্বদা ধারণ করিতেন, তাহার মোনার রঙে ও গায়ের
রঙে যেন মেশামেশি হইয়া এক হইয়া যাইত ! ঠাকুরের নিজ
মুখেও শুনিয়াছি—“তখন তখন এমন রূপ হয়েছিল রে, যে
লোকে চেয়ে থাকত ; বুক মুখ সব সময় লাল হয়ে থাকত, আর
গা দিয়ে যেন একটা জ্যোতিঃ বেরুত ! লোকে চেয়ে থাকত
বলে একখানা মোটা চাদর সর্বক্ষণ মুড়ি দিয়ে থাকতুম, আর
মাকে বলতুম, ‘মা, তোর বাহিরের রূপ তুই নে, আমাকে
ভিতরের রূপ দে’, গায়ে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে চাপ্ড়ে চাপ্ড়ে

গুরুভাবে মথুরের প্রতি কৃপা

বলতুম, 'ভিতরে ঢুকে যা, ভিতরে ঢুকে যা'; তবে কতদিন পরে ওপরটা এই রকম মলিন হয়ে গেল।"

রূপের কথায় ঠাকুরের জীবনের আর একটি ঘটনা এখানে মনে আসিতেছে। এই সময় প্রতি বৎসর বর্ষার সময় ঠাকুর

কামারপুকুরে তিন-চারি মাস কাল জন্মভূমি কামারপুকুরে
ঠাকুরের কাটাইয়া আসিতেন। কামারপুকুরে থাকিবার
রূপ-গুণে সময় মাঝে মাঝে শিওর গ্রামে ভাগিনেয় হৃদয়ের
জনতার কথা বাড়ীতেও যাইতেন। ঠাকুরের শশুরালয় জয়রাম-

বাটী গ্রামের ভিতর দিয়া শিওড়ে যাইবার পথ। সেখানকার লোকেরাও উপরোধ-অনুরোধ করিয়া ঠাকুরকে সেখানে কয়েক দিন এ অবসরে বাস করাইয়া লইতেন। ঠাকুরের পরম অনুগত ভক্ত ভাগিনেয় হৃদয় তখন সর্বদা ঠাকুরের সঙ্গে থাকিয়া তাঁহার সর্বপ্রকার সেবা করিতেন।

কামারপুকুরে থাকিবার কালে ঠাকুরকে দেখিবার ও তাঁহার মুখের ছটো কথা শুনিবার জন্য সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত গ্রামের স্ত্রী-পুরুষের ভিড় লাগিয়াই থাকিত। প্রত্যুষেই প্রতিবাসী স্ত্রীলোকেরা বাড়ীর পাট-কাঁট সারিয়া স্নান করিয়া জল আনিবার জন্য কলসী কক্ষে লইয়া আসিতেন ও কলসীগুলি ঠাকুরের বাটীর নিকট হালদারপুকুরের পাড়ে রাখিয়া চাটুযোদের বাড়ীতে আসিয়া বসিতেন এবং ঠাকুরের বাটীর মেয়েদের ও ঠাকুরের সহিত কথাবার্তায় এক-আধ ঘণ্টা কাল কাটাইয়া পরে স্নানে যাইতেন। এইরূপ নিত্য হইত। এই অবকাশে আবার কেহ কেহ রাত্রে বাটীতে কোন ভালমন্দ মিষ্টান্নাদি তৈয়ার করা হইলে, তাহার

শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

অগ্রভাগ তুলিয়া রাখিয়া তাহা লইয়া আসিয়া ঠাকুরকে দিয়া যাইতেন। রঙ্গরসপ্রিয় ঠাকুর ইহারা রাত্রি প্রভাত হইতে না হইতে আসিয়া উপস্থিত হন দেখিয়া, কখন কখন রঙ্গ করিয়া বলিতেন—“শ্রীবৃন্দাবনে নানাভাবে নানা সময়ে শ্রীকৃষ্ণের সহিত গোপীদের মিলন হত—পুলিনে জল আনতে গিয়ে গোষ্ঠ-মিলন, সন্ধ্যাবেলা ঠাকুর যখন গরু চরিয়ে ফিরতেন তখন গোধূলি-মিলন, তারপর রাত্রে রাসে মিলন—এই রকম, এই রকম সব আছে। তা, ইংগা, এটা কি তোদের স্নানের সময়ের মিলন নাকি?” তাহারা ঠাকুরের কথা শুনিয়া হাসিয়া গড়াগড়ি দিতেন। মেয়েরা দিবসের রক্ষনাদি করিতে চলিয়া যাইবার পর পাড়ার পুরুষেরা ঠাকুরের নিকট আসিয়া যাহার যতক্ষণ ইচ্ছা বলিয়া কথাবার্তা কহিত। অপরাহ্নে আবার স্ত্রীলোকেরা আসিত এবং সন্ধ্যার পর রাত্রে আবার পুরুষদের কেহ কেহ আসিয়া উপস্থিত হইত। আর দূর-দূরান্তর হইতে যে সকল স্ত্রী-পুরুষেরা আসিত, তাহারা প্রায় অপরাহ্নে আসিয়া সন্ধ্যার পূর্বেই চলিয়া যাইত। এইরূপে সমস্ত দিন রথ দোলের ভিড় লাগিয়া থাকিত।

একবার কামারপুকুর হইতে ঐরূপে জয়রামবাটা ও শিওড় যাইবার বন্দোবস্ত হইয়াছে। অনুক্ষণ ভাবসমাধিতে থাকায় ঠাকুরের অঙ্গ বালক বা স্ত্রীলোকের গায় সুকোমল হইয়া গিয়াছিল। অল্প দূর হইলেও পাকি, গাড়ী ভিন্ন যাইতে পারিতেন না। সেজন্য জয়রামবাটা হইয়া শিওড় যাইবার জন্য পাকি আনা হইয়াছে। হৃদয় সঙ্গে যাইবার জন্য প্রস্তুত। ঠাকুর আহারাঙ্তে

গুরুভাবে মথুরের প্রতি কৃপা

পান খাইতে খাইতে লাল চেলি পরিয়া, হস্তে স্বর্ণ ইষ্ট-কবচ ধারণ করিয়া পাঙ্কিতে উঠিতে আসিলেন ; দেখেন রাস্তায় পাঙ্কির নিকটে ভিড় লাগিয়া গিয়াছে ; চারিদিকে স্ত্রী-পুরুষ দাঁড়াইয়া আছে । দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া হৃদয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন—
“হু, এত ভিড় কিসের রে ?”

হৃদয়—কিসের আর ? এই তুমি আজ ওখানে যাবে, (লোকদিগকে দেখাইয়া) এরা এখন আর তোমাকে কিছুদিন দেখতে পাবে না, তাই সব তোমায় দেখতে এসেছে ।

ঠাকুর—আমাকে ত রোজ দেখে ; আজ আবার কি নূতন দেখবে ?

হৃদয়—এই চেলি পরে মাজলে গুজলে, পান খেয়ে তোমার ঠোঁট দু'খানি লাল টুকটুকে হলে খুব সুন্দর দেখায় ; তাই সব দেখবে আর কি ?

ঠাহার সুন্দর রূপে ইহারা আকৃষ্ট, শুনিয়াই ঠাকুরের মন এক অপূর্বভাবে পূর্ণ হইল । ভাবিলেন—হায় হায় ! এরা সব এই দুই দিনের বাহিরের রূপটা লইয়াই ব্যস্ত, ভিতরে যিনি রহিয়াছেন তাঁহাকে কেহ দেখিতে চায় না ।

রূপে বিতৃষ্ণা ত ঠাহার পূর্ব হইতেই ছিল ; এই ঘটনায় তাহা আরও সহস্রগুণে বর্দ্ধিত হইল । বলিলেন—

“কি ? একটা মানুষকে মানুষ দেখবার জন্ত এত ভিড় করবে ? যা, আমি কোথাও যাব না । যেখানে যাব সেই-খানেই ত লোকে এই রকম ভিড় করবে ।”—বলিয়াই ঠাকুর বাটীর ভিতরে নিজ কক্ষে যাইয়া কাপড়-চোপড় সব খুলিয়া কোণে

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

দুঃখে চূপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। দীনভাবে পূর্ণ ঠাকুর সে দিন বাস্তবিকই জয়রামবাটী ও শিওড়ে যাইলেন না; হৃদয় ও বাটীর সকলে কত মতে বুঝাইল, সকলি ভাসিয়া গেল। আপনার শরীরটার উপর এ অলৌকিক পুরুষের যে কি তুচ্ছ, হেয় বুদ্ধি ছিল, তাহা একবার হে পাঠক, ভাবিয়া দেখ। আর ভাব আমাদের কথা, কি রূপ রূপ করিয়া পাগল! —কি মাজা, ঘসা, আশি, চিরুণী, ক্ষুর, ভাঁড়, বেসন, সাবান, এসেন্স, পোমেডের ছড়াছড়ি; আর পাশ্চাত্যের অনুকরণে 'হাড় মাসের খাঁচাটার' উপর নিত্য ভ্রমের বাড়াবাড়ি করিয়া একেবারে উৎসন্ন যাইবার ছড়াছড়ি। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকিয়া শুদ্ধ পবিত্রভাবে পূর্ণ থাকা, আর এটা—তুই কি এক কথা হে বাপু? যাক্ আমরা জানবাজারের পূর্ব কথাই বলি।

জগদম্বার আরাত্রিক আরম্ভ হয় হয়, ঠাকুরের কিন্তু সে ভাব আর ভাঙ্গে না। মথুর বাবুর পত্নী শ্রীমতী জগদম্বা দাসী ঠাকুরকে

ঠাকুরের সমাধি
ভাঙ্গাইতে
জগদম্বা
দাসীর
কৌশল

কোনরূপে প্রকৃতিস্থ করিয়া বাটীর স্ত্রীলোকদিগের সহিত আরতি দেখিতে যাইবেন মনে করিয়াছিলেন, কিন্তু ঠাকুরের ঐরূপ ভাবাবেশের বিরাম নাই দেখিয়া এবং তাঁহাকে একাকী ফেলিয়া যাওয়াটা যুক্তিসঙ্গত নয় ভাবিয়া কিংকর্তব্যবিমূঢ়া হইলেন।

ভাবিলেন—করি কি? আমি যাহাকেই রাখিয়া চলিয়া যাইব, একবার আরতির বাজনা বাজিয়া উঠিলেই সে নিশ্চয়ই তথায় উর্দ্ধ্বাসে ছুটিবে। আর 'বাবা'ও ত ভাবে বিহ্বল হইলে নিজেকে নিজে সামলাইতে পারেন না। একবার ত ঐরূপে বাহুজ্ঞানশূন্য অবস্থায় গুলের আগুনের উপর পড়িয়া যাইয়াও হাঁশ

গুরুভাবে মথুরের প্রতি কৃপা

হয় নাই, পরে সে ঘা কতদিনে কত চিকিৎসায় সারিয়াছে। একাকী রাখিয়া যাইলে এ আনন্দের দিনে পাছে ঐরূপ একটা বিব্রাট হয়, তখন উপায়? কর্তাই বা কি বলিবেন? এইরূপ নানা চিন্তা করিতে করিতে হঠাৎ তাঁহার মনে একটা উপায় আসিয়া জুটিল। তাড়াতাড়ি নিজের বহুমূল্য গহনাসকল বাহির করিয়া বাবাকে পরাইতে পরাইতে তাঁহার কানের গোড়ায় বার বার বলিতে লাগিলেন, “বাবা, চল; মার যে আরতি হইবে, মাঝে চামর করিবে না?”

ভাবাবেশে ঠাকুর যতই কেন বাহুজ্ঞানশূন্য হউন না, যে মূর্তি

ঠাকুরের

সমাধি হইতে

সাধারণ

অবস্থার

নামিবার

প্রকার

শাস্ত্রসম্মত

ও ভাবে তাঁহার মন সমাধিস্থ হইয়াছে, তাহা ছাড়া

অপর সকল বস্তু, ব্যক্তি ও ভাব-সম্বন্ধ হইতে তাঁহার

মন যতই কেন দূরে যাইয়া পড়ুক না, এটা কিন্তু

সকল সময়েই দেখা গিয়াছে যে, ঐ মূর্তির নাম বা

ঐ মূর্তির ভাবের অমুকুল কথা কয়েকবার ঠাকুরের

কানের কাছে বলিলেই, তখনই তাঁহার মন উহাতে

আকৃষ্ট হইত এবং উহা ধরিতে বুঝিতে সক্ষম হইত। একাগ্রচিত্তের

নিয়ম ও আচরণ যে ঐরূপ হইয়া থাকে, তাহা মহামুনি পতঞ্জলি

প্রভৃতির যোগশাস্ত্রে সবিস্তার না হউক সাধারণভাবে লিপিবদ্ধ

আছে। অতএব শাস্ত্রজ্ঞ পাঠকের ঠাকুরের মনের ঐরূপ আচরণের

কথা বুঝিতে বিলম্ব হইবে না। আর বহু পুণ্যফলে যাহারা

কিছুমাত্রও চিত্তের একাগ্রতা জীবনে লাভ বা অমুভব করিয়াছেন,

তাঁহারা আরও সহজে এ কথা বুঝিতে পারিবেন। অতএব আমরা

প্রকৃত ঘটনারই অনুসরণ করি।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

মথুর বাবুর পত্নীর কথা ঠাকুরের কর্ণে প্রবেশ করিল।
 অমনি তিনি অনেকটা প্রকৃতিস্থ হইয়া অর্দ্ধ-বাহুদশায় আনন্দে
 উৎফুল্ল হইয়া তাঁহার সঙ্গে চলিলেন। তাঁহারা
 সখীভাবে ঠাকুর-দালানে পৌঁছিবামাত্র আরতি আরম্ভ হইল।
 ঠাকুরের ৮দুর্গাদেবীকে ঠাকুরও স্ত্রীগণপরিবৃত হইয়া চামরহস্তে প্রতিমাকে
 চামর করা বীজন করিতে লাগিলেন। দালানের এক দিকে
 স্ত্রীলোকেরা এবং অপর দিকে মথুরবাবু-প্রমুখ পুরুষেরা দাঁড়াইয়া
 শ্রীশ্রীজগদম্বার আরতি দেখিতে লাগিলেন। সহসা মথুর বাবুর
 নয়ন স্ত্রীলোকদিগের দিকে পড়িবামাত্র দেখিলেন তাঁহার পত্নীর
 পার্শ্বে বিচিত্রবস্ত্রভূষণে অদৃষ্টপূর্ব সৌন্দর্য্য বিস্তার করিতে করিতে
 কে দাঁড়াইয়া চামর করিতেছেন! বার বার দেখিয়াও যখন
 বুঝিতে পারিলেন না তিনি কে, তখন ভাবিলেন হয়ত তাঁহার
 পত্নীর পরিচিতা কোন সঙ্গতিপন্ন লোকের গৃহিণী নিমন্ত্রিতা
 হইয়া আসিয়াছেন।

আরতি সাক্ষ হইল। অন্তঃপুরবাসিনীরা শ্রীশ্রীজগদম্বাকে
 প্রণাম করিয়া তাঁহাদের নিদিষ্টস্থানে চলিয়া গেলেন ও নিজ নিজ
 কার্য্যে ব্যাপ্ত হইলেন। ঠাকুরও ঐরূপ অর্দ্ধবাহু অবস্থায় মথুর
 বাবুর পত্নীর সহিত ভিতরে যাইলেন এবং ক্রমে সম্পূর্ণ সাধারণ
 ভাবে প্রকৃতিস্থ হইয়া অলঙ্কারাদি খুলিয়া রাখিয়া বাহিরে পুরুষ-
 দিগের নিকট আসিয়া বসিলেন এবং নানা ধর্ম্মপ্রসঙ্গ তুলিয়া দৃষ্টান্ত
 দ্বারা সকলকে সরলভাবে বুঝাইয়া সকলের চিত্তহরণ করিতে
 লাগিলেন।

কিছুক্ষণ পরে মথুর বাবু কার্য্যান্তরে অন্তরে গিয়া কথায়-

গুরুভাবে মথুরের প্রতি কৃপা

কথায় তাঁহার পত্নীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “আরতির সময় তোমার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া কে চামর করিতেছিলেন?”

মথুরের
তাঁহাকে ঐ
অবস্থায়
চিনিতে না
পারিয়া
জিজ্ঞাসা

মথুর বাবুর পত্নী তাহাতে হাসিয়া বলিলেন, “তুমি চিনিতে পার নাই? বাবা ভাবাবস্থায় ঐরূপে চামর করিতেছিলেন। তা হইতেই পারে, মেয়ে-দের মত কাপড়-চোপড় পরিলে বাবাকে পুরুষ বলিয়া মনে হয় না।” এই বলিয়া মথুর বাবুকে আত্মোপাস্ত সমস্ত ঘটনা খুলিয়া বলিলেন। মথুর বাবু একেবারে অবাক হইয়া বলিলেন, “তাইত বলি—সামান্য বিষয়েও না ধরা দিলে বাবাকে চেনে কার সাধ্য! দেখ না, চব্বিশ ঘণ্টা দেখে ও একত্র থেকেও তাঁকে আজ চিনতে পারলুম না!”

সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী পরমানন্দে কাটিয়া গিয়াছে। আজ বিজয়া দশমীর প্রাতঃকাল। পুরোহিত তাড়াতাড়ি শ্রীশ্রীজগদম্বার সংক্ষেপ পূজা সারিয়া লইতেছে, কারণ নির্দিষ্ট বিজয়া দশমী সময়ের মধ্যে দর্পণ-বিসর্জন করিতে হইবে। পরে সন্ধ্যার পর প্রতিমাবিসর্জন। মথুর বাবুর বাটার সকলেরই মনে যেন একটা বিষাদের ছায়া—কিসের যেন একটা অব্যক্ত অপরিষ্কৃত অভাব, যেন একটা হৃদয়ের অতি প্রিয় বস্তু বা ব্যক্তির সহিত অপরিহার্য আশু বিচ্ছেদাশঙ্কা! পৃথিবীর অতি বিস্তৃত আনন্দের পশ্চাতেও এইরূপ একটা বিষাদছায়া সর্বদা সংলগ্ন আছে। এই নিয়মের বশেই বোধ হয় অতি বড় ঈশ্বর-প্রেমিকের জীবনেও সময়ে সময়ে অসহ ঈশ্বরবিরহের সস্তাপ আসিয়া উপস্থিত হয়। আর কঠিন মানব আমাদের হৃদয়ও বিজয়ার

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

দিনে প্রতিমাবিসর্জন দিতে যাইয়া উষ্ণ অশ্রু বর্ষণ করে—
মথুর-পত্নীর তো কথাই নাই—আজ প্রাতঃকাল হইতে হস্তে
কর্ম করিতে করিতে অঞ্চলে অনেকবার নয়নাশ্রু মুছিয়া চক্ষু
পরিষ্কার করিয়া লইতে হইতেছে।

বাহিরে মথুর বাবুর কিন্তু অণুকার কথা এখনও ধারণা হয়
নাই। তিনি পূর্ববৎই আনন্দে উৎফুল্ল! শ্রীশ্রীজগদম্বাকে গৃহে
আনিয়া এবং ‘বাবা’র অলোকসামান্য সঙ্গ ও অচিন্ত্য
মথুরের
আনন্দে ঐ
বিষয়ে হুঁশ
না থাকা
কৃপাবলে তিনি আনন্দে আত্মহারা হইয়া আপনাতে
আপনি ভরপুর হইয়া রহিয়াছেন। বাহিরে কি
হইবে না হইবে, তাহা এখন খোঁজে কে? খুঁজিবার
আবশ্যকই বা কি? মাকে ও বাবাকে লইয়া এইরূপেই দিন
কাটিবে। এমন সময় পুরোহিতের নিকট হইতে সংবাদ আসিল—
এইবার মা-র বিসর্জন হইবে, বাবুকে নীচে আসিয়া মাকে প্রণাম-
বন্দনাদি করিয়া যাইতে বল।

কথাটা মথুর বাবু প্রথম বুঝিতেই পারিলেন না। পুনরায়
জিজ্ঞাসা করিয়া যখন বুঝিতে পারিলেন, তখন
দেবীমूर्তি-
বিসর্জন দিবে
না বলিয়া
মথুরের
সংকল্প
তাঁহার হুঁশ হইল—আজ বিজয়া দশমী! আর
সেই জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ে এক বিষম আঘাত
পাইলেন। শোকে দুঃখে পূর্ণ হইয়া ভাবিতে
লাগিলেন, “আজ মাকে বিসর্জন দিতে হইবে—

কেন? বাবা ও মা-র কৃপায় আমার তো কিছুই অভাব নাই।
মনের আনন্দের ষেটুকু অভাব ছিল, তাহা তো বাড়ীতে মা-র
শুভাগমনে পূর্ণ হইয়াছে। তবে আবার কেন মাকে বিসর্জন দিয়া

গুরুভাবে মথুরের প্রতি কৃপা

বিষাদ ডাকিয়া আনি? না, এ আনন্দের হাট আমি ভাবিতে পারিব না। মা-র বিসর্জন! মনে হইলেও যেন প্রাণ কেমন করিয়া উঠে!” এরূপ নানা কথা ভাবিতে ও অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন।

এদিকে সময় উত্তীর্ণ হয়। পুরোহিত লোকের উপর লোক পাঠাইতেছেন—বাবু একবার আসিয়া দাঁড়ান, মা-র বিসর্জন হইবে। মথুর বিষম বিরক্ত হইয়া বলিয়া পাঠাইলেন, “আমি মাকে বিসর্জন দিতে দিব না। যেমন পূজা হইতেছে, তেমনি পূজা হইবে। আমার অনভিমতে যদি কেহ বিসর্জন দেয় তো বিষম বিভ্রাট হইবে—খুনোখুনি পর্য্যন্ত হইতে পারে।” এই বলিয়া মথুর বাবু গম্ভীরভাবে বসিয়া রহিলেন। ভৃত্য বাবুর ঐরূপ ভাবান্তর দেখিয়া সভয়ে সরিয়া দাঁড়াইল এবং পূজার দালানে যাইয়া সকল কথা পুরোহিত মহাশয়কে জানাইল। সকলে অবাক!

তখন সকলে পরামর্শ করিয়া বাবু বাটীর ভিতরে ঠাঁহাদের সম্মান করিতেন ঠাঁহাদের বুঝাইতে পাঠাইলেন। ঠাঁহারাও

যাইলেন, বুঝাইলেন কিন্তু বাবুর সে ভাবান্তর দূর
সকলে
বুঝাইলেও
মথুরের উত্তর
করিতে পারিলেন না। বাবু ঠাঁহাদের কথায়
কর্ণপাত না করিয়া বলিলেন, “কেন?” আমি মা-র
নিত্যপূজা করিব। মা-র কৃপায় আমার যখন সে

ক্ষমতা আছে তখন কেন বিসর্জন দিব?” কাজেই ঠাঁহারা আর কি করেন, বিমর্ষভাবে ফিরিয়া আসিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন—মাথা খারাপ হইয়াছে! কিন্তু ঐরূপ সিদ্ধান্ত করিলেই বা উপায় কি? হঠকারী মথুরকে বাটীর সকলেরই ভালরকম জানা ছিল। সকলেই

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

জানিত, ক্রুদ্ধ হইলে বাবুর দিক্-বিদিক্-জ্ঞান থাকে না। কাজেই তাঁহার অনভিমতে দেবীর বিসর্জনের হুকুম দিয়া কে তাঁহার কোপে পড়িবে, বল? সে বিষয়ে কেহই অগ্রসর হইলেন না। গিন্নির নিকট অতিরঞ্জিত হইয়া সংবাদ পৌছিল; তিনি ভয়ে ক্ষরে অভিভূতা হইয়া ঠাকুরকে বুঝাইয়া বলিতে অস্বরোধ করিলেন; কারণ 'বাবা' ভিন্ন তাঁহাদের বিপদ হইতে উদ্ধার করিবার আর কে আছে?—বাবুর যদি বাস্তবিকই মাথা খারাপ হইয়া থাকে?

ঠাকুর যাইয়াই দেখিলেন মথুরের মুখ গম্ভীর, রক্তবর্ণ, দুই চক্ষু লাল এবং কেমন যেন উন্মনা হইয়া ঘরের ভিতর বেড়াইয়া বেড়াইতেছেন। তাঁহাকে দেখিয়াই মথুর কাছে আসিলেন এবং বলিলেন, "বাবা, যে যাহাই বলুক, আমি মাকে প্রাণ থাকিতে বিসর্জন দিতে পারিব না। বলিয়া দিয়াছি নিত্যপূজা করিব। মাকে ছাড়িয়া কেমন করিয়া থাকিব?"

ঠাকুর তাঁহার বুকে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, "ও:—এই তোমার ভয়? তা মাকে ছেড়ে তোমায় থাকতে হবে কে বলে? আর বিসর্জন দিলেই বা তিনি যাবেন কোথায়? ছেলেকে ছেড়ে মা কি কখন থাকতে পারে? এ তিন দিন বাইরে দালানে বসে তোমার পূজা নিয়েছেন, আজ থেকে তোমার আরও নিকটে থেকে—সর্বদা তোমার হৃদয়ে বসে তোমার পূজা নেবেন।"

কি এক অদ্ভুত মোহিনী শক্তিই যে ঠাকুরের স্পর্শে ও কথায়

গুরুভাবে মথুরের প্রতি কৃপা

ছিল, তাহা বলিয়া বুঝান কঠিন! দেখা গিয়াছে, অনেক সময় লোকে আসিয়া তাঁহার সহিত কোন বিষয়ে ঠাকুরের কথা ও স্পর্শের অদ্ভুত শক্তি বিরুদ্ধ মত অবলম্বন করিয়া খুব তর্ক করিতেছে— তাঁহার সিদ্ধান্ত কিছুতেই লইতেছে না, ঠাকুর তখন কৌশলে কোনরূপে তাহার অঙ্গস্পর্শ করিয়া দিতেন; আর অমনি তখন হইতে তাহার মনের স্রোত যেন ফিরিয়া যাইত এবং ঐ ব্যক্তি কথাটা গুটাইত—ঠাকুরের কথা বা সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ মানিয়া লইয়া! ঐ বিষয়ে তিনি আমাদের কাহারও কাহারও নিকট বলিয়াছেনও—“কথা কইতে কইতে অমন করে ছুঁয়ে দি কেন জানিস? যে শক্তিতে ওদের অমন গোঁ-টা থাকে, সেইটের জোর কমে গিয়ে ঠিক ঠিক সত্য বুঝতে পারবে বলে।” এইরূপে স্পর্শমাত্রেই অপরের যথার্থ সত্য উপলব্ধি করিবার পথের অন্তরায়স্বরূপে দণ্ডায়মান শক্তিসমূহকে নিজের ভিতর টানিয়া লইয়া তাহাদের প্রভাব কমাইয়া দেওয়া বা ঐ সকলকে চিরকালের মত একেবারে হরণ করার সম্বন্ধে অনেক দৃষ্টান্ত ঠাকুরের জীবনে দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি। দেখিয়াছি, যে সকল কথা অপরের মুখ হইতে বাহির হইয়া কাহারও মনে কোনরূপ ভাবোদয় করিল না, সেই সকলই আবার তাঁহার মুখ-নিঃসৃত হইয়া মানবহৃদয়ে এমন অদম্য আঘাত করিয়াছে যে, সেইক্ষণ হইতে শ্রোতার জীবনের গতি পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে! সে সকল পাঠককে সবিস্তারে বলিবার অল্প কোন সময় চেষ্টা করিব। এখন মথুর বাবুর কথাই বলিয়া যাই।

ঠাকুরের কথায় ও স্পর্শে মথুর ক্রমে প্রকৃতিস্থ হইলেন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

তাঁহার ঐরূপে প্রকৃতিস্থ হওয়া ঠাকুরের ইচ্ছা এবং স্পর্শে
কোনরূপ দর্শনাদি হইয়াছিল কি না, তাহা আমাদের জানা
নাই। তবে মনে হয়, উহাই সম্ভব। মনে হয়
মথুর প্রকৃতিস্থ শ্রীশ্রীজগদম্বার মূর্তি তাঁহার হৃদয়কন্দর অপূর্ব
কিরূপে আলোকে উজ্জ্বল করিয়া বিজ্ঞমান—দেখিতে পাইয়াই
হইয়াছিল তাঁহার আনন্দ আরও শতগুণে উচ্ছলিত হইয়া,
উঠিয়া বাহিরের প্রতিমা রক্ষা করিবার মনে যে ঝাঁক উঠিয়াছিল,
তাহা কমিয়া গিয়াছিল। যথার্থ গুরু এইরূপে উচ্চতর লক্ষ্যের উজ্জ্বল
ছটায় শিশুর দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়া দেন। কাজেই তখন নিম্নাঙ্গের
ভাব দর্শনাদি তাহার মন হইতে আপনা আপনি খসিয়া যায়।

মথুরের ভক্তি বিশ্বাস আমাদের চক্ষে অদ্ভুত বলিয়া প্রতীত
হইলেও উহা যে নানারূপে ঠাকুরকে যাচাইবার ফলেই উপস্থিত
হইয়াছিল, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। মথুর
মথুরের ধন দিয়া, সুন্দরী রমণী দিয়া, নিজের ও বাটার
ভক্তি-বিশ্বাসের সকলের উপর অকুণ্ঠ প্রভুতা দিয়া, ঠাকুরের
অবিচলতা—সকলের উপর অকুণ্ঠ প্রভুতা দিয়া, ঠাকুরের
ঠাকুরকে আত্মীয়বর্গ—যথা, হৃদয় প্রভৃতির জগৎ অকাতরে
পরীক্ষার অর্থবায়ু করিয়া, সকল ভাবে ঠাকুরকে যাচাইয়া
ফলে দেখিয়াছিলেন—ইনি অপর সাধারণের গ্ৰায় বাহ্যিক

কিছুতেই ভুলেন না। বাহ্যিক ভাব-ভক্তির কপটাবরণ ইহার
সূক্ষ্ম দৃষ্টির কাছে অধিকক্ষণ আত্মগোপন করিয়া রাখিতে পারে না।
আর নরহত্যাदि দুষ্কর্ম করিয়াও মন-মুখ এক করিয়া যথার্থ সরল-
ভাবে যদি কেহ ইহার শরণ গ্রহণ করে, তবে তাহার সাত খুন
মাপ করিয়া তাহাকে সাদরে গ্রহণ করেন, দিন দিন উচ্চ লক্ষ্য

গুরুভাবে মথুরের প্রতি কৃপা

চিনিবার ও ধরিবার সামর্থ্য দেন এবং কি এক বিচিত্র শক্তিবলে তাহার জগৎ অসম্ভবও সম্ভব হইয়া দাঁড়ায় !

ঠাকুরের সঙ্গে থাকিয়া এবং ভাবসমাধিতে তাঁহার অসীম আনন্দানুভব দেখিয়া বিষয়ী মথুরেরও এক সময়ে ইচ্ছা হইয়াছিল, ব্যাপারটা কি একবার দেখিবে ও বুঝিবে। মথুরের তখন হৃদয়ে দৃঢ়

ধারণা হইয়াছে, বাবা ইচ্ছামাত্রেরেই ওসকল করিয়া

মথুরের ভাব-
সমাধি-লাভের
ইচ্ছা

দিতে পারেন। কারণ শিব বল, কালী বল,

ভগবান্ বল, কৃষ্ণ বল, রাম বল—সবই তো উনি

নিজে !—তবে আর কি ! কৃপা করিয়া কাহাকেও

নিজের কোন মূর্তি যে দেখাইতে পারিবেন, ইহার আর বিচিত্রতা

কি ! বাস্তবিক ইহা এক কম অদ্ভুত ব্যাপার নহে। ঠাকুরের

দর্শনলাভের পর যাহারাই তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়াছে,

তাহাদেরই ক্রমে ক্রমে এইরূপ ধারণার উদয় হইত। সকলেরই

মনে হইত, উহার ইচ্ছায় অসম্ভবও সম্ভব হয়—উনি ইচ্ছামাত্রেরেই

ধর্মজগতের সমস্ত সত্যই কাহাকেও উপলব্ধি করাইয়া দিতে

পারেন। আধ্যাত্মিক শক্তি ও নিজ পুত্র চরিত্রবলে একজনের

প্রাণেও ঐরূপ ভাবের উদয় করিতে পারা কঠিন—তো অনেকের

প্রাণে ! উহা কেবল এক অবতার-পুরুষেই সম্ভবে। তাঁহাদের

অবতারত্বের বিশিষ্ট প্রমাণসমূহের মধ্যে ইহা একটি কম প্রমাণ

নহে। আর এ মিথ্যা, শঠতা ও প্রতারণার রাজ্যে তাঁহাদের

নামে অনেক ভেল জুয়াচুরি চলিবে দেখিতে পাইয়াই, তাঁহারা

সকলের সমক্ষে ডঙ্কা মারিয়া বলিয়া যান, “আমার অদর্শনের পর

অনেক ভণ্ড ‘আমি অবতার, আমি দুর্বল জীবের শরণ ও মুক্তি-

শ্রী শ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

কাতা' বলিয়া তোমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইবে ; সাবধান, তাহাদের কথায় ভুলিও না।”১

মথুরের মনে ঐরূপ ভাবের উদয় হইবামাত্র ঠাকুরকে যাইয়া ধরিলেন। বলিলেন, “বাবা, আমার যাহাতে ভাবসমাধি হয়

তাহা তোমায় করিয়া দিতেই হইবে।” ঠাকুর ঐরূপ স্থলে সকল সময়েই যেমন বলিতেন সেই-রূপই বলিয়াছিলেন, ইহা আমরা বেশ বুঝিতে পারি। বলিলেন, “ওরে কালে হবে, কালে

হবে। একটা বিচি পুঁতবামাত্রই কি গাছ হয়ে তার ফল খেতে পাওয়া যায়? কেন, তুই ত বেশ আছি—এদিক-ওদিক ছুদিক চলছে। ও সব হলে এদিক (সংসার) থেকে মন উঠে যাবে, তখন তোমার বিষয়-আশয় সব রক্ষা করবে কে? বার ভূতে সব যে লুটে খাবে! তখন কি করবি?”

ও সব কথা সেদিন শুনে কে? মথুর একেবারে ‘না-ছোড়া-বান্দা’—‘বাবা’কে ভাবসমাধি করিয়া দিতেই হইবে। ঐরূপ

বুঝানয় ফল হইল না দেখিয়া ঠাকুর আর এক গ্রাম চড়াইয়া ধরিলেন। বলিলেন, “ওরে, ভক্তেরা কি দেখতে চায়? তারা সাক্ষাৎ সেবাই চায়। দেখলে শুন্দে (ঈশ্বরের) ঐশ্বর্যজ্ঞানে ভয় আসে, ভালবাসা চাপা পড়ে। শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় গেলে

গোপীরা বিরহে আকুল! শ্রীকৃষ্ণ তাদের অবস্থা জেনে উদ্ধবকে বুঝাতে পাঠালেন। উদ্ধব জ্ঞানী কি না! বৃন্দাবনের

১ ইশা—(Matthew XXIV—11, 23, 24, 25, 26)

গুরুভাবে মথুরের প্রতি কৃপা

ভাব, খাওয়ান, পরান ইত্যাদি উদ্ধব বুঝতে পারত না। গোপীদের গুরু ভালবাসাটাকে মায়িক ও ছোট বলে দেখত; তারও দেখে শুনে শিক্ষা হবে, সেও এক কথা। উদ্ধব গিয়ে গোপীদের বুঝতে লাগল—‘তোমরা সব কৃষ্ণ, কৃষ্ণ বলে অমন কেন করছ? জান ত, তিনি ভগবান—সর্বত্র আছেন; তিনি মথুরায় আছেন আর বৃন্দাবনে নেই, এটা ত হতে পারে না! অমন করে হা-ছতাশ না করে একবার চক্ষু মুদে দেখ দেখি—দেখবে, তোমাদের হৃদয়মাঝে সেই নবঘনশ্যাম মুরলীবদন বনমালী সর্বদা রয়েছেন’ ইত্যাদি। তাই শুনে গোপীরা বলেছিল, ‘উদ্ধব, তুমি কৃষ্ণসখা, জ্ঞানী, তুমি এ সব কি কথা বোল্‌চো! আমরা কি ধ্যানী, না জ্ঞানী, না ঋষি-মুনির মত জপ-তপ করে তাঁকে পেয়েছি? আমরা যাকে সাক্ষাৎ সাজিয়েছি-গুজিয়েছি, খাইয়েছি, পরিয়েছি, ধ্যান করে তাঁকে আবার ঐ সব করতে যাব? আমরা তা কি আর করতে পারি? যে মন দিয়ে ধ্যান-জপ করব, সে মন আমাদের থাকলে তো তা দিয়ে ঐ সব করব! সে মন যে অনেক দিন হল, কৃষ্ণপাদপদ্মে অর্পণ করেছি! আমাদের বলতে আমাদের কি আর কিছু আছে যে, তাইতে অহং-বুদ্ধি করে জপ কোরবো?’ উদ্ধব তো শুনে অবাক! তখন সে গোপীদের কৃষ্ণের প্রতি ভালবাসা যে কত গভীর ও কি বস্তু, তা বুঝতে পেরে তাদের গুরু বলে প্রণাম করে চলে এল। এতেই দেখ না, ঠিক ঠিক ভক্ত কি তাঁকে দেখতে চায়? তাঁর সেবাতেই তার পরমানন্দ। তার অধিক—দেখা, শুনা, সে চায় না; তাতে তার ভাবের হানি হয়।”

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

ইহাতেও যখন মথুর বুলিলেন না, তখন ঠাকুর বলিলেন, “তা কি জানি বাবু? মাকে বলব, তিনি যা হয় করবেন।”

তাহার কয়েক দিন পরেই মথুরের একদিন ভাবসমাধি! ঠাকুর বলিতেন, আমাকে ডেকে পাঠিয়েছে। গিয়ে দেখি,

মথুরের
ভাবসমাধি
হওয়া ও
প্রার্থনা

যেন সে মানুষ নয়! চক্ষু লাল, জল পড়ছে;
ঈশ্বরীয় কথা কইতে কইতে কেঁদে ভাসিয়ে দিচ্ছে!
আর বুক থবু থবু করে কাঁপচে। আমাকে দেখে

একেবারে পা-ছুটো জড়িয়ে ধরে বলে, ‘বাবা, ঘাট হয়েছে! আজ তিন দিন ধরে এই রকম, বিষয়কর্মের দিকে চেপ্টা করলেও কিছুতেই মন যায় না। সব খানে খারাপ হয়ে গেল। তোমার ভাব তুমি ফিরিয়ে নাও, আমার চাই নে।’ বল্লুম—‘কেন? তুই যে ভাব হোক বলেছিলি?’ তখন সে বলে, ‘বলেছিলুম, আনন্দও আছে; কিন্তু হলে কি হয়, এদিকে যে সব যায়! বাবা, ও তোমার ভাব তোমাকেই মাজে। আমাদের ওসবে কাজ নেই! ফিরিয়ে নাও।’ তখন আমি হাসি আর বলি, ‘তোকে তো এ কথা আগেই বলেছি।’ সে বলে, ‘হাঁ বাবা, কিন্তু তখন কি অত-শত জানি যে, ভূতের মত এসে ঘাড়ে চাপবে? আর তার গোঁয়ে আমায় চব্বিশ ঘণ্টা ফিরতে হবে?—ইচ্ছা করলেও কিছু করতে পারবো না!’ তখন তার বুক আবার হাত বুলিয়ে দি!”

বাস্তবিক ভাব বা সমাধি হইলেই হয় না। উহার বেগ সহ্য করিতে—উহাকে রক্ষা করিতে পারে কয়টা লোক? এতটুকু বাসনার পশ্চাৎ-টান থাকিতে উহা পাওয়া অসম্ভব। ঈশ্বরীয় পথের

গুরুভাবে মথুরের প্রতি কৃপা

পথিককে শাস্ত্র মেজমুই পূর্ব হইতে নির্বাসনা হইতে বলিয়াছেন ।

ত্যাগী না
হইলে
ভাবসমাধি
স্থায়ী হয় না

বলিয়াছেন, 'ত্যাগেনৈকেনামৃতত্বমানুঃ'— এক-
মাত্র ত্যাগ বৈরাগ্যই অমৃতত্ব দিতে সমর্থ ।
ক্ষণিক ভাবোচ্ছ্বাসে নিম্নাঙ্কের সমাধি হইল,
কিন্তু ভিতরে ধন হোক, মান হোক, ইত্যাদি
বাসনার রাশি গজ্ গজ্ করিতেছে, এরূপ লোকের ঐ ভাব
কখনই স্থায়ী হয় না । আচার্য্য শঙ্কর যেমন বলিয়াছেন—

আপাতবৈরাগ্যবতো মুমুক্শু ভবাক্ৰিপারং প্রতিযাতুমুক্ততান্ ।

আশাগ্রাহো মজ্জয়তেহস্তরালে, নিগৃহ কঠে বিনিবর্ত্য বেগাৎ ॥

—বিবেকচূড়ামণি, ৭৯

অর্থাৎ, যথার্থ বৈরাগ্যরূপ সম্বল অগ্রে সংগ্রহ না করিয়া ভবসমুদ্রের
পারে যাইবার জন্য যাহারা অগ্রসর হয়, বাসনা-কুস্তীর তাহাদের

ঐ বিষয়ের
দৃষ্টান্ত—
কাশীপুরের
বাগানে
আনীত
অনেক ভক্ত-
যুবকের কথা

ঘাড়ে ধরিয়া ফিরাইয়া বলপূর্বক অতলজলে
ডুবাইয়া দেয় । বাস্তবিক, কতই না ঐরূপ
দৃষ্টান্ত আমরা ঠাকুরের নিকট দেখিয়াছি ! কাশী-
পুরের বাগানে ঠাকুর তখন অবস্থান করিতেছেন ;
একদিন কয়েকজন বৈষ্ণব ভক্ত একটি উন্নয়না
যুবককে সঙ্গে লইয়া উপস্থিত । ইহাদের পূর্বে

কখন আসিতে আমরা দেখি নাই । আসিবার কারণ, সঙ্গী
যুবকটিকে একবার ঠাকুরকে দেখাইবেন এবং তাঁহার আধ্যাত্মিক
কি অবস্থা সহসা উপস্থিত হইয়াছে, তাহা বিষয়ে ঠাকুরের মতামত
শ্রবণ করিবেন । ঠাকুরের নিকট সংবাদ দেওয়া গেল ।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

যুবকটিকে দেখিলাম—বুক ও মুখ লাল, দীনভাবে সকলের পদধূলি গ্রহণ করিতেছে; ভগবানের নামে ঘন ঘন কম্পন ও পুলক এবং ছনয়নে অবিশ্রান্ত জলধারা বহায় চক্ষুদ্বয় রক্তিম ও কিঞ্চিং স্ফীতও হইয়াছে। দেখিতে শ্যামবর্ণ, না স্থূল, না কুশ, মুখমণ্ডল ও অবয়বাদি সূত্রী ও সূগঠিত, মস্তকে শিখা। পরিধানে একখানি মলিন সাদাধুতি, গায়ে উত্তরীয় ছিল না বলিয়াই মনে হয়; পায়ে জুতা নাই এবং শরীর-সংস্কার বা রক্ষার বিষয়ে একেবারে উদাসীন! শুনিলাম—হরিসংকীর্ণন করিতে করিতে একদিন সহসা এইরূপ উদ্ভেজিত অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে। তদবধি আহার এক প্রকার নাই বলিলেই হয়, নিদ্রা নাই এবং ভগবানলাভ হইল না বলিয়া দিবারাত্র কান্নাকাটি ও ভূমিতে গড়াগড়ি! আজ কয়েকদিন হইল, ঐরূপ হইয়াছে।

আধ্যাত্মিক ভাবসমূহের আতিশয্যে মানবশরীরে যে সকল বিকার আসিয়া উপস্থিত হয়, তদ্বিষয় ধরিবার ও চিনিবার শক্তি ঠাকুরের যেমন দেখিয়াছি, এমন আর কুত্রাপি দেখি নাই। গুরুগীতাদিতে শ্রীগুরুকে 'ভবরোগ-বৈজ্ঞ' ইত্যাদি শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে; তাহার ভিতর যে এত গূঢ় অর্থ আছে, তাহা ঠাকুরের পুণ্যদর্শনলাভের পূর্বে একটুও বুঝি নাই। শ্রীগুরু যে বাস্তবিকই মানসিক রোগের বৈজ্ঞ এবং ভিন্ন ভিন্ন আধ্যাত্মিক ভাবে মানবমনে যে যে বিকার আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা দেখিবামাত্র চিনিয়া,

লক্ষণ দেখিয়া ধরিয়া অমুকুল হইলে উহা যাহাতে সাধকের মনে

গুরুভাবে মথুরের প্রতি কৃপা

সহজ হইয়া দাঁড়ায় ও তাহাকে উচ্চতর ভাবসোপানে আরোহণ করিবার ক্ষমতা দেয়, তাহার এরূপে ব্যবস্থা করিয়া দেন এবং প্রতিকূল বুদ্ধিতে তাহা যাহাতে সাধকের অনিষ্টসাধন না করিয়া ধীরে ধীরে অপনীত হইয়া যায় তদ্বিষয়েরও ব্যবস্থা করেন, একথা পূর্বে কিছুই জানা ছিল না। ঠাকুরকে প্রতিদিন ঐরূপ করিতে দেখিয়াই মনে সে কথার দৃঢ় ধারণা হইয়াছে। দেখিয়াছি— পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দের প্রথম নির্বিকল্প সমাধিলাভ হইলে অমনি ঠাকুর ব্যবস্থা করিতেছেন, ‘তুই এখন কয়েক দিন কাহারও হাতে খাস্ নি, নিজে রেঁধে খাস্। এ অবস্থায় বড় জোর নিজের মার হাতে খাওয়া চলে, অপর কারও হাতে খেলেই ঐ ভাব নষ্ট হয়ে যায়। পরে ঐটে সহজ হয়ে দাঁড়ালে, তখন আর ভয় নেই।’ গোপালের মার বায়ুবৃদ্ধিতে শারীরিক যন্ত্রণা দেখিয়া বলিতেছেন, “ও যে তোমার হরি-বাই, ও গেলে কি নিয়ে থাকবে? ও থাকা চাই; তবে যখন বিশেষ কষ্ট হবে, তখন যা হোক কিছু খেও।” জর্নৈক ভক্তের বাহ্যিক শোঁচে অত্যন্ত অভ্যাস ও অমুরাগের জন্ত শরীর ভুলিয়া মন একেবারে ঈশ্বরে তন্ময় হয় না দেখিয়া গোপনে ব্যবস্থা করিতেছেন, “লোকে যেখানে মল-মূত্র ত্যাগ করে, সেইখানকার মাটিতে তুমি একদিন ফোঁটা পরে ঈশ্বরকে ডেকো।” একজনের সংকীর্ণনে উদ্ধাম শারীরিক বিকার তাহার উন্নতির প্রতিকূল দেখিয়া তিরস্কার করিয়া বলিতেছেন, “শালা, আমায় ভাব দেখাতে এসেছেন। ঠিক ঠিক ভাব হলে কখন এমন হয়?—ডুবে যায়; স্থির হয়ে যায়। ও কি? স্থির হ, শান্ত হয়ে যা। (অপর সকলকে লক্ষ্য

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

করিয়া) এ সব কেমন ভাব জান ? যেমন এক ছটাক দুধ কড়ায় করে আঙুনে বসিয়ে ফোটাচ্ছে ; মনে হচ্ছে যেন কতই দুধ, এক কড়া ; তারপর নামিয়ে দেখ, একটুও নেই ; যেটুকু দুধ ছিল, সব কড়ায় গায়েই লেগে গেছে ।” একজনের মনোভাব বুঝিয়া বলিতেছেন, “যাঃ শালা, খেয়ে লে, পরে লে, সব করে লে, কিন্তু কোনটাই ধর্ম কচ্চিস্ বলে করিস্ নি” ইত্যাদি কত লোকের কত কথাই বা বলিব !

সেই যুবককে দেখিয়াই এক্ষেত্রে ঠাকুর বলিলেন, “এ যে দেখছি মধুর ভাবের^১ পূর্বাভাস ! কিন্তু এ অবস্থা এর থাকবে না, রাখতে পারবে না। এ অবস্থা রক্ষা করা বড় ঐ যুবকের
অবস্থা সম্বন্ধে
ঠাকুরের
মীমাংসা
কঠিন। স্ত্রীলোককে ছুঁলেই (কামভাবে) এ ভাব আর থাকবে না। একেবারে নষ্ট হয়ে যাবে।” যাহা হউক, আগন্তুক ভক্তগণ ঠাকুরের কথায় যুবকটির যে মাথা খারাপ হয় নাই, এ বিষয়টি জানিয়া কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া ফিরিলেন। তাহার পর কিছু কাল গত হইলে সংবাদ পাওয়া গেল—ঠাকুর যাহা বলিয়াছিলেন তাহাই হইয়াছে—যুবকটির রূপাল ভাঙ্গিয়াছে ! সংকীৰ্তনের ক্ষণিক উদ্ভেজনা য় সে ভাগ্যক্রমে যত উচ্ছে উঠিয়াছিল, হায় হায়—

১ বৃন্দাবনে শ্রীমতী রাধারাগীর যে সর্বাত্মসম্পূর্ণ উনবিংশ প্রকার অষ্টসাধ্বিক শারীরিক বিকার শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে প্রকাশ পাইত, যথা—হাস্ত, ক্রন্দন, অশ্রু, কম্প, পুলক, স্বেদ, মুচ্ছা ইত্যাদি—বৈষ্ণব-শাস্ত্রে উহাই মধুরভাব বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। মধুর ভাবের পরাকাষ্ঠাকেই মহাভাব বলে। ঐ মহাভাবেই নবিংশ প্রকার শারীরিক বিকার ঈশ্বর-প্রেমে আসিয়া উপস্থিত হয়। উহা জীবের সর্বাত্মগৌণ হওরা অসম্ভব বলিয়া কথিত আছে।

গুরুভাবে মথুরের প্রতি কৃপা

ভাবসমাদে দুর্ভাগ্যক্রমে আবার ততই নিম্নে নামিয়াছে ! পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দ ঐরূপ হইবার ভয়েই সর্বদা জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিরই পক্ষপাতী ছিলেন এবং ঐরূপ ভক্তির অনুষ্ঠান করিতে শিক্ষা দিতেন ।

মথুরের যেমন 'বাবা'র নিকট কোন বিষয় গোপন ছিল না, 'বাবা'রও আবার মথুরের উপর ভাবসমাধির কাল ভিন্ন অপর

ঠাকুরের	সকল সময়ে, মাতার নিকট বালক যেমন, সখার
মথুরকে সকল	নিকট সখা যেমন অকপটে সকল কথা খুলিয়া
বিষয় বালকের	বলে, পরামর্শ করে, মতামত সাদরে গ্রহণ করে ও
মত খুলিয়া	ভালবাসার উপর নির্ভর করে, তেমনি ভাব ছিল ।
বলা ও	পরাবিচার সর্বোচ্চ সোপানে আরোহণ করিলে
মতামত লওয়া	

মানবের অবস্থা যে উন্মাদ, পিশাচ বা বালকবৎ সাধারণ-নয়নে প্রতীত হইয়া থাকে, শাস্ত্রের একথা আমরা পাঠককে পূর্বেই বলিয়াছি । শুধু তাহাই নহে, জগৎপূজ্য আচার্য্য শঙ্কর এ কথাও স্পষ্ট লিখিয়া গিয়াছেন যে, ঐরূপ মানব অতুল রাজ-বৈভব উপভোগ করিয়া বা কোপীনমাত্রিক সম্বল ও ভিক্ষায় উদরপোষণ করিয়া ইতর-সাধারণে যাহাকে বড় সুখের অবস্থা বা বড় দুঃখের অবস্থা বলিয়া গণ্য করে, তাহার ভিতর থাকিয়াও কিছুতেই বিচলিত হন না ; সর্বদা আত্মানন্দে আপনাতে আপনি বিভোর হইয়া থাকেন ।

কচিন্মূঢ়ো বিদ্বান্ কচিদপি মহারাজবিভবঃ
কচিদ্ভ্রান্তঃ সৌম্যঃ কচিদজগরাচারকলিতঃ ।
কচিৎ পাত্ৰীভূতঃ কচিদবমতঃ কাপ্যবিদিত
স্বরত্যেবং প্রাজ্ঞঃ সততপরমানন্দস্থিতিঃ ॥

—বিবেকচূড়ামণি, ৫৪২

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

অর্থাৎ, 'মুক্ত ব্যক্তি কখন মূঢ়ের গ্ৰাম, আবার কখন পণ্ডিতের গ্ৰাম, আবার কখন বা রাজবৎ বিভবশালী হইয়া বিচরণ করেন। তাঁহাকে কখন পাগলের গ্ৰাম, আবার কখন ধীর, স্থির, বুদ্ধিমানের গ্ৰাম বলিয়া বোধ হয়। আবার কখনও বা তাঁহাকে নিত্যাবশ্যকীয় আহাৰ্য্য প্রভৃতির জগুও যাজ্ঞারহিত হইয়া অজগরের গ্ৰাম অবস্থান করিতে দেখা যায়। তিনি কোথাও বা বহুমান প্রাপ্ত হন, আবার কোথাও বা অপমানিত হন, আবার কোথাও বা একেবারে অপরিচিত ভাবে থাকেন; এইরূপে সকল অবস্থায় তিনি পরমানন্দে বিভোর ও অবিচলিত থাকেন।' জীবনমুক্ত পুরুষদিগের সম্বন্ধেই যখন ঐ কথা, তখন মহামহিম অবতার-পুরুষদিগের সৰ্ববস্থায় অবিচলিত থাকা ও বালকবৎ ব্যবহার করাটা আর অধিক কথা কি? অতএব মথুরের সহিত ঠাকুরের ঐরূপ আচরণ কিছু বিচিত্র নহে। কিন্তু মথুরের তাঁহার সহিত ঐরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ থাকিয়া এত কাল কাটাইতে পারাটা বড় কম ভাগ্যের কথা নহে।

কি একটা মধুর সম্বন্ধই না ঠাকুরের মথুরের সহিত ছিল! সাধনকালে এবং পরেও কখন কোন জিনিসের আবশ্যক হইলে,

মথুরের
কল্যাণের দিকে
ঠাকুরের কতদূর
দৃষ্টি ছিল

অমনি তাহা মথুরকে বলা ছিল। সমাধিকালে বা অন্য সময়ে যাহা কিছু দর্শনাদি ও ভাব উপস্থিত হইত, তাহা মথুরকে বলিয়া "এটা কেন হল, বল দেখি?" "ওটা তোমার মনে কি হয়—বল দেখি?"

ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করাই ছিল। তাহার পয়সার যাহাতে সন্ধ্যায় হয়, দেবসেবার পয়সাতে যাহাতে যথার্থ দেবসেবা হইয়া অতিথি,

গুরুভাবে মথুরের প্রতি কৃপা

কাল, সাধু-সন্ত প্রভৃতি পালিত হয় ও তাহার পুণ্যসঞ্চয় হইয়া কল্যাণ হয়, সে বিষয়ে ঠাকুরের লক্ষ্য থাকিত। এইরূপ সকল বিষয়ে কত কথাই না আমরা শুনিয়াছি। পুণ্যবতী রাণী রাসমণি ও মথুরের শরীর যাইবার অনেক পরে যখন আমরা সকলে ঠাকুরের নিকট গিয়াছি, তখনও ঠাকুরের মধ্যে মধ্যে ঐ ভাবেই পরিচয় আমরা পাইয়াছি। একটি দৃষ্টান্ত দিলে এখানে মন্দ হইবে না।

মথুরের আমল হইতে বন্দোবস্ত ছিল, ৮মা কালী ও ৮রাধা-গোবিন্দের ভোগ-রাগাদির পর বড় খালে করিয়া এক খাল

ঐ বিষয়ক প্রসাদী অন্নব্যঞ্জন ও এক খাল ফল-মূল-মিষ্টান্নাদি
দৃষ্টান্ত— ঠাকুরের ঘরে নিত্য আসিবে; ঠাকুর নিজে ও
ফলহারিণী তাঁহার নিকট যাহারা উপস্থিত থাকিবেন তাঁহারা
পূজার প্রসাদ প্রসাদ পাইবেন। তন্মিন্ন বিশেষ বিশেষ পৰ্বদিনে
ঠাকুরের ঠাকুরের চাহিয়া লওয়া মা কালী ও রাধাগোবিন্দজীকে যে বিশেষ ভোগ-
রাগাদি দেওয়া হইত, তাহারও কিয়দংশ ঐরূপে ঠাকুরের নিকট
পৌছাইয়া দেওয়া হইত।

বর্ষাকাল। আজ ফলহারিণী পূজার দিন। এ দিনে ঠাকুর-বাড়ীতে বেশ একটি ছোট-খাট আনন্দোৎসব হইত। শ্রীশ্রীজগন্নাথ কালিকার বিশেষ পূজা করিয়া নানাপ্রকারের ফল-মূল ভোগ-নিবেদন করা হইত। আজও তদ্রূপ হইতেছে। নহবৎ বাজিতেছে। ঠাকুরের নিকট অল্প যোগানন্দ স্বামীজি প্রভৃতি কয়েটি ভক্ত উপস্থিত আছেন।

বিশেষ বিশেষ পৰ্বদিনে ঠাকুরের শরীর-মনে বিশেষ বিশেষ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

দেবভাব প্রকাশিত হইত। বৈষ্ণবদিগের পর্বদিনে বৈষ্ণবভাব
 বিশেষ বিশেষ এবং শাক্তদিগের পর্বদিনে শক্তিসম্বন্ধীয় ভাব-
 পর্বদিনে সমূহ প্রকাশিত হইত। যথা—শ্রীশ্রীদুর্গাপূজার
 ঠাকুরের ভিন্ন সময়, বিশেষতঃ ঐ পূজার সন্ধিক্ষণে, অথবা ৬কালী-
 ভিন্ন প্রকারের পূজাদিকালে ঠাকুর শ্রীশ্রীজগদম্বার ভাবে আবিষ্ট,
 ভাবসমাধির নিম্পন্দ ও কখন কখন বরাভয়কর পর্য্যন্ত হইয়া
 স্বভাবতঃ যাইতেন; জন্মাষ্টমী প্রভৃতি পর্বদিনে শ্রীকৃষ্ণ ও
 উদয় শ্রীমতীর ভাবে আকৃষ্ট হওয়ায় কম্প-পুলকাদি অষ্টসাত্ত্বিক লক্ষণ
 তাঁহার শরীরে দেখা যাইত—এইরূপ। আবার ঐ ঐ ভাবাবেশ
 এত সহজে স্বাভাবিক ভাবে আসিয়া উপস্থিত হইত যে, উহা যে
 কোনরূপ বিশেষ চেষ্টার ফলে হইতেছে, একথা আদৌ মনে
 হইত না; বরং এমন দেখা গিয়াছে, ঐরূপ পর্বদিনে ঠাকুর
 আমাদের সহিত অন্য নানা প্রসঙ্গে কথায় খুব মাতিয়াছেন,
 ঐ দিনে ঈশ্বরের যে বিশেষ লীলাপ্রকাশ হইয়াছিল, সে কথা
 ভুলিয়াই গিয়াছেন, এমন সময় হঠাৎ তাঁহার মন ঐ সকল
 বাহিরের ব্যাপার হইতে গুটাইয়া একেবারে ঈশ্বরের ঐ ভাবে
 যাইয়া তন্ময় হইয়া পড়িল! কে যেন জোর করিয়া ঐরূপ
 করাইয়া দিল! কলিকাতায় শ্রামপুকুরে অবস্থানকালে আমরা
 ঐরূপ দৃষ্টান্ত অনেক দেখিয়াছি। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার
 প্রমুখ একঘর লোকের সহিত কথা কহিতে কহিতে শ্রীশ্রীদুর্গাপূজার
 সন্ধিক্ষণে হঠাৎ ঠাকুরের ঐরূপ ভাবাবেশ হইল! তখনকার
 সেই হাস্যচ্ছটায় বিকশিত জ্যোতিঃপূর্ণ তাঁহার মুখমণ্ডল ও
 তাহার পূর্বক্ষণের অসুস্থতা-নিবন্ধন কালিমাপ্রাপ্ত বদন দেখিয়া

গুরুভাবে মথুরের প্রতি কৃপা

কে বলিবে যে, ইনি সেই লোক—কে বলিবে ইহার কোন অসুস্থতা আছে !

অত্‍কাল ফলহারিণী পূজার দিনেও ঠাকুরের শরীর-মনে মধ্যে মধ্যে ঐরূপ ভাবাবেশ হইতেছে ; কখন বা তিনি আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া পঞ্চমবর্ষীয় শিশুর ন্যায় মা-র নাম গাহিয়া আনন্দে নৃত্য করিতেছেন । সকলে মুগ্ধ হইয়া সে অপূর্ব বদনশ্রীর প্রতি চাহিয়া রহিয়াছেন এবং সে অদৃষ্টপূর্ব দেবমানবের সঙ্গুণে মনে কতপ্রকার অপূর্ব দিব্যভাব অনুভব করিতেছেন । মা-র পূজা সাদ হইতে প্রায় রাত্রি শেষ হইল । একটু বিশ্রাম করিতে না করিতেই প্রভাত ।

বেলা প্রায় চাওটার সময় ঠাকুর দেখিলেন যে, ঠাহার ঘরে যে প্রসাদী ফল-মূলাদি পাঠাইবার বন্দোবস্ত আছে, তাহা তখনও পৌঁছায় নাই । কালীঘরের পূজারী ভ্রাতৃপুত্র রামলালকে ডাকিয়া উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি কিছুই বলিতে পারিলেন না ; বলিলেন—“সমস্ত প্রসাদী দ্রব্য দপ্তরখানায় খাজ্ঞাধী মহাশয়ের নিকট যথারীতি প্রেরিত হইয়াছে ; সেখান হইতে সকলকে, যাহার যেমন পাওনা বরাদ্দ আছে, বিতরিত হইতেছে ; কিন্তু এখানকার (ঠাকুরের) জগ্ন এখনও কেন আসে নাই, বলিতে পারি না ।” রামলাল দাদার কথা শুনিয়াই ঠাকুর ব্যস্ত ও চিন্তিত হইলেন । “কেন এখনও দপ্তরখানা হইতে প্রসাদ আসিল না ?”—ইহাকে জিজ্ঞাসা করেন, উহাকে জিজ্ঞাসা করেন, আর ঐ কথাই আলোচনা করেন ! এইরূপে অল্পক্ষণ অপেক্ষা করিয়া যখন দেখিলেন—তখনও আসিল না,

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

দেবভাব প্রকাশিত হইত। বৈষ্ণবদিগের পৰ্বদিনে বৈষ্ণবভাব

বিশেষ বিশেষ
পৰ্বদিনে
ঠাকুরের ভিন্ন
ভিন্ন প্রকারের
ভাবসমাধির
স্বভাবতঃ
উদয়

এবং শাক্তদিগের পৰ্বদিনে শক্তিসম্বন্ধীয় ভাব-
সমূহ প্রকাশিত হইত। যথা—শ্রীশ্রীদুর্গাপূজার
সময়, বিশেষতঃ ঐ পূজার সন্ধিক্ষণে, অথবা ৮কালী-
পূজাদিকালে ঠাকুর শ্রীশ্রীজগদম্বার ভাবে আবিষ্ট,
নিম্পন্দ ও কখন কখন বরাভয়কর পর্য্যন্ত হইয়া
যাইতেন; জন্মাষ্টমী প্রভৃতি পৰ্বদিনে শ্রীকৃষ্ণ ও

শ্রীমতীর ভাবে আকৃষ্ট হওয়ায় কম্প-পুলকাদি অষ্টসাত্ত্বিক লক্ষণ
তাঁহার শরীরে দেখা যাইত—এইরূপ। আবার ঐ ঐ ভাবাবেশ
এত সহজে স্বাভাবিক ভাবে আসিয়া উপস্থিত হইত যে, উহা যে
কোনরূপ বিশেষ চেষ্টার ফলে হইতেছে, একথা আদৌ মনে
হইত না; বরং এমন দেখা গিয়াছে, ঐরূপ পৰ্বদিনে ঠাকুর
আমাদের সহিত অণু নানা প্রসঙ্গে কথায় খুব মাতিয়াছেন,
ঐ দিনে ঈশ্বরের যে বিশেষ লীলাপ্রকাশ হইয়াছিল, সে কথা
ভুলিয়াই গিয়াছেন, এমন সময় হঠাৎ তাঁহার মন ঐ সকল
বাহিরের ব্যাপার হইতে গুটাইয়া একেবারে ঈশ্বরের ঐ ভাবে
যাইয়া তন্ময় হইয়া পড়িল! কে যেন জোর করিয়া ঐরূপ
করাইয়া দিল! কলিকাতায় শ্যামপুকুরে অবস্থানকালে আমরা
ঐরূপ দৃষ্টান্ত অনেক দেখিয়াছি। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার
প্রমুখ একঘর লোকের সহিত কথা কহিতে কহিতে শ্রীশ্রীদুর্গাপূজার
সন্ধিক্ষণে হঠাৎ ঠাকুরের ঐরূপ ভাবাবেশ হইল! তখনকার
সেই হান্তচ্ছটায় বিকশিত জ্যোতিঃপূর্ণ তাঁহার মুখমণ্ডল ও
তাঁহার পূৰ্বক্ষণের অসুস্থতা-নিবন্ধন কালিমাপ্রাপ্ত বদন দেখিয়া

গুরুভাবে মধুরের প্রতি কৃপা

কে বলিবে যে, ইনি সেই লোক—কে বলিবে ইহার কোন অসুস্থতা আছে !

অঙ্ককার ফলহারিণী পূজার দিনেও ঠাকুরের শরীর-মনে মধ্যে মধ্যে ঐরূপ ভাবাবেশ হইতেছে ; কখন বা তিনি আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া পঞ্চমবর্ষীয় শিশুর গায় মা-র নাম গাহিয়া আনন্দে নৃত্য করিতেছেন। সকলে মুগ্ধ হইয়া সে অপূর্ব বদনশ্রীর প্রতি চাহিয়া রহিয়াছেন এবং সে অদৃষ্টপূর্ব দেবমানবের সঙ্গুণে মনে কতপ্রকার অপূর্ব দিব্যভাব অনুভব করিতেছেন। মা-র পূজা সাদ হইতে প্রায় রাত্রি শেষ হইল। একটু বিশ্রাম করিতে না করিতেই প্রভাত।

বেলা প্রায় চাওটার সময় ঠাকুর দেখিলেন যে, তাঁহার ঘরে যে প্রসাদী ফল-মূলাদি পাঠাইবার বন্দোবস্ত আছে, তাহা তখনও পৌঁছায় নাই। কালীঘরের পূজারী ভ্রাতৃপুত্র রামলালকে ডাকিয়া উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি কিছুই বলিতে পারিলেন না ; বলিলেন—“সমস্ত প্রসাদী দ্রব্য দপ্তরখানায় খাজাঞ্চী মহাশয়ের নিকট যথারীতি প্রেরিত হইয়াছে ; সেখান হইতে সকলকে, যাহার যেমন পাওনা বরাদ্দ আছে, বিতরিত হইতেছে ; কিন্তু এখানকার (ঠাকুরের) জন্ত এখনও কেন আসে নাই, বলিতে পারি না।” রামলাল দাদার কথা শুনিয়াই ঠাকুর ব্যস্ত ও চিন্তিত হইলেন। “কেন এখনও দপ্তরখানা হইতে প্রসাদ আসিল না ?”—ইহাকে জিজ্ঞাসা করেন, উহাকে জিজ্ঞাসা করেন, আর ঐ কথাই আলোচনা করেন ! এইরূপে অল্পক্ষণ অপেক্ষা করিয়া যখন দেখিলেন—তখনও আসিল না,

শ্রী শ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

তখন চটিজুতাটি পরিয়া নিজেই খাজাঞ্চীর নিকট আসিয়া উপস্থিত ! বলিলেন, “ই্যাগা, ও ঘরের (নিজের কক্ষ দেখাইয়া) বরাদ্দ পাওনা এখনও দেওয়া হয় নি কেন ? ভুল হল নাকি ? চিরকালে মামুলি বন্দোবস্ত, এখন ভুল হয়ে বন্ধ হবে—বড় অশ্রায় কথা !” খাজাঞ্চী মহাশয় কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন— “এখনও আপনার ওখানে পৌঁছায় নি ? বড় অশ্রায় কথা ! আমি এখনি পাঠাইয়া দিতেছি ।”

স্বামী যোগানন্দ তখন বালক । সংকুলে বনেদী সার্বণ চৌধুরীদের ঘরে জন্ম, কাজেই মনে বেশ একটু অভিমানও ছিল ।

ঠাকুরবাড়ীর খাজাঞ্চী, কর্মচারী, পূজারী প্রভৃতিদের বড়-একটা মানুষ বলিয়াই বোধ হইত না । তবে ঠাকুরের ঐরূপে প্রসাদ চাহিয়া লওয়ার ঠাকুরের ভালবাসায় ও অহেতুক কৃপায় তাঁহার শ্রীপদে মাথা বিক্রয় করিয়া ফেলিয়াছেন ; এবং স্বামীর চিন্তা

রাসমণির বাগানের একপ্রকার পার্শ্বেই তাঁহাদের বাড়ী বলিলেও চলে ; কাজেই ঠাকুরের নিকট নিত্য যাওয়া-আসার বেশ সুবিধা । আর না যাইয়াই বা করেন কি ? ঠাকুরের অদ্ভুত আকর্ষণ যে জোর করিয়া নিয়মিত সময়ে টানিয়া লইয়া যায় । কিন্তু ঠাকুরকে মানেন বলিয়া কি আর ঠাকুরবাড়ীর লোকদের সঙ্গে প্রীতির সহিত আলাপ করা চলে ? অতএব ‘প্রসাদী ফল-মুলাদি কেন আসিল না’ বলিয়া ঠাকুর ব্যস্ত হইলে তিনি বলিয়াই ফেলিলেন—“তা নাই বা এল মশায়, ভারি তো জ্বিনিস ! আপনার তো ও সকল পেটে নয় না, ওর কিছুই ত খান না—তখন নাই বা দিলে ?” আবার ঠাকুর যখন তাঁহার

গুরুভাবে মথুরের প্রতি কৃপা

ঐরূপ কথায় কিছুমাত্র কর্ণপাত না করিয়া অল্পক্ষণ পরে নিজে খাজাঞ্চীকে ঐ বিষয়ের কারণ জিজ্ঞাসা করিতে যাইলেন, তখন যোগীন ভাবিতে লাগিলেন—‘কি আশ্চর্য্য! ইনি আজ সামান্য ফল-মূল-মিষ্টানের জন্ত এত ব্যস্ত হয়ে উঠলেন কেন? যাকে কিছুতে বিচলিত হতে দেখে নি, তাঁর আজ এ ভাব কেন?’ ভাবিয়া চিন্তিয়া বিশেষ কোনই কারণ না খুঁজিয়া পাইয়া শেষে সিদ্ধান্ত করিলেন—‘বুঝিয়াছি! ঠাকুরই হন, আর যত বড় লোকই হন, আকরে টানে আর কি! বংশানুক্রমে চাল-কলা-বাঁধা পূজারী ব্রাহ্মণের ঘরে জন্ম নিয়েছেন, সে বংশের গুণ একটু না একটু থাকবে ত? তাই আর কি! বড় বড় বিষয়ে ব্যস্ত হন না, কিন্তু এ সামান্য বিষয়ের জন্ত ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন! তা নহিলে, নিজে ওসব খাবেন না, নিজের কোন দরকারেই লাগবে না, তবু তার জন্ত এত ভাবনা কেন? বংশানুগত অভ্যাস!’

যোগীন বা যোগানন্দ স্বামীজি এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া বসিয়া আছেন, এমন সময় ঠাকুর ফিরিয়া আসিলেন এবং তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন, “কি জানিস, ঠাকুরের ঐরূপ করিবার কারণ-নির্দেশ লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন, “কি জানিস, রাসমণি দেবতার ভোগ হয়ে সাধু-সন্ত ভক্ত লোকে প্রসাদ পাবে বলে এতটা বিষয় দিয়ে গেছে। এখানে যা প্রসাদী জিনিস আসে, সে সব ভক্তেরাই খায়, ঈশ্বরকে জানবে বলে যারা সব এখানে আসে, তারাই খায়। এতে রাসমণির যে জন্ত দেওয়া, তা সার্থক হয়। কিন্তু তার পর ওরা (ঠাকুরবাড়ীর বামুনেরা) যা সব নিয়ে যায়, তার কি

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

ওরূপ ব্যবহার হয়? চাল বেচে পয়সা করে! কারু কারু আবার বেছা আছে; ঐ সব নিয়ে গিয়ে তাদের খাওয়ায়; এই সব করে। রাসমণির যে জগৎ দান, তার কিছুও অন্ততঃ সার্থক হবে বলে এত করে ঝগড়া করি।” যোগীন স্বামীজি শুনিয়া অবাক! ঠাকুরের এ কাজেরও এত গূঢ় অর্থ!

এইরূপে কি একটা মধুর সম্বন্ধই না ঠাকুর মধুরের সহিত পাতাইয়াছিলেন! মধুরের ভালবাসা ঘনীভূত হইয়া শেষে যে

মধুরের সহিত
ঠাকুরের
অন্ত
সম্বন্ধ
‘বাবা’-অন্ত প্রাণ হইয়াছিল, তাহা যে ঠাকুরের এইরূপ অহেতুক রূপার ফলে, একথা বেশ বুঝিতে পারা যায়। তাহার পর ঠাকুরের বালক-

বৎ অবস্থা মধুরকে কম আকর্ষণ করে নাই। সাংসারিক সকল বিষয়ে অনভিজ্ঞ বালকের প্রতি কাহার মন না আকৃষ্ট হয়? নিকটে থাকিলে—ক্রীড়া-মত্ততায় পাছে তাঁহার কোনও অনিষ্ট হয় বলিয়া ভয়চকিত নয়নে তাঁহার অকারণ-মধুর চেষ্ঠাদি দেখিতে ও তাঁহাকে রক্ষা করিতে কে না ত্রস্ত-ভাবে অগ্রসর হয়? আর ঠাকুরের বালকভাবটাতে তো আর কৃত্রিমতা বা ভানের লেশমাত্র ছিল না। যখন তিনি ঐ ভাবে থাকিতেন, তখন তাঁহাকে ঠিক ঠিক আত্মরক্ষণাসমর্থ বালক বলিয়াই বোধ হইত। কাজেই তেজীমান, বুদ্ধিমান মধুরের তাঁহাকে সকল বিষয়ে রক্ষা করিবার স্বতঃই যে একটা চেষ্ঠার উদয় হইবে, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি? অতএব একদিকে মধুর যেমন ঠাকুরের দৈবশক্তির উপর নির্ভর করিতেন, অপরদিকে তেমনি আবার তিনি ‘বাবা’কে অনভিজ্ঞ বালক জানিয়া সর্বদা রক্ষা করিতে

গুরুভাবে মথুরের প্রতি কৃপা

প্রস্তুত থাকিতেন। সর্বজ্ঞ গুরুভাব ও অল্পজ্ঞ বালকভাবেঃ
‘বাবা’তে এইরূপ বিচিত্র সমাবেশ দেখিয়া মথুর বোধ হয়
মনে মনে স্থির করিয়াছিলেন যে, সাংসারিক সকল ব্যাপারে,
এমন কি দেহরক্ষাদি-বিষয়েও তাঁহাকে, ‘বাবা’কে রক্ষা করিতে
হইবে; আর মানব-চক্ষু ও শক্তির অস্তুরালে অবস্থিত সূক্ষ্ম
পারমাণ্বিক ব্যাপারে ‘বাবা’ই তাঁহাকে রক্ষা করিবেন। অতএব
একই কালে দেব ও মানব, সর্বজ্ঞ ও অল্পজ্ঞ মহাজ্ঞটিল বিপরীত
ভাবসমষ্টির অপরূপ সম্মিলনভূমি এ অদ্ভুত ‘বাবা’র প্রতি মথুরের
ভালবাসাটাও যে একটা জটিল ভাব ধারণ করিয়াছিল, একথা
আমরা বেশ বুঝিতে পারি। ভাবমুখে অবস্থিত বরাভয়কর ‘বাবা’
মথুরের উপাস্ত হইলেও, বালকভাবাবিষ্ট সরলতা ও নির্ভরতার
ঘনমূর্তি সেই ‘বাবা’কেই আবার সময়ে সময়ে মথুরকে নানা কথায়
ভুলাইতে ও বুঝাইতে হইত। ‘বাবা’র জিজ্ঞাসিত বিষয়সকল
বুঝাইবার উদ্ভাবনী শক্তিও মথুরের ভালবাসায় বেশ যোগাইত।
মথুরের সহিত কথা কহিতে কহিতে হঠাৎ বহির্দেশে গমন করিয়া
মথুরের ‘বাবা’ একদিন চিন্তায় মুখখানি শুষ্ক করিয়া
কামকীটের ফিরিয়া আসিয়া মথুরকে বলিলেন, “একি ব্যারাম
কথা বলিয়া হল, বল দেখি? দেখলুম, প্রস্রাবের দ্বার দিয়ে
বালকভাবাপন্ন শরীর থেকে যেন একটা পোকা বেরিয়ে গেল।
ঠাকুরকে শরীরের ভিতরে এমন তো কারুর পোকা থাকে
বুঝান না। আমার একি হল?” ইতিপূর্বেই যে ‘বাবা’ হয়ত গৃঢ়
আধ্যাত্মিক তত্ত্বসকল অপূর্ব সরলভাবে বুঝাইয়া মোহিত ও
মুগ্ধ করিতেছিলেন, সেই ‘বাবা’ই এখন বালকের গায় নিষ্কারণ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

ভাবিয়া অস্থির!—মথুরের আশ্বাসবাক্য এবং বুদ্ধির উপর নির্ভর করিতেছেন! মথুর শুনিয়াই বলিলেন, “ও তো ভালই হয়েছে, বাবা! সকলের অঙ্গেই কামকীট আছে। উহাই তাদের মনে নানা কুভাবের উদয় করে, কুকাঙ্গ করায়। মা-র কৃপায় তোমার অঙ্গ থেকে সেই কামকীট বেরিয়ে গেল! এতে এত ভাবনা কেন?” ‘বাবা’ শুনিয়াই বালকের গায় আশ্বস্ত হইয়া বলিলেন, “ঠিক বলেছ; ভাগ্‌গিস্ তোমায় একথা বল্লুম, জিজ্ঞাসা করলুম!” বলিয়া বালকের গায় ঐ কথায় আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

কথায় কথায় একদিন ‘বাবা’ বলিলেন, “দেখ, মা সব আমায় দেখিয়ে দেখিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন, এখানকার (ঠাকুরের নিজের) সব ঢের অস্তরঙ্গ আছে, তারা সব আসবে, মথুরের সহিত এখান থেকে ঈশ্বরীয় বিষয় জানবে, শুনবে, ঠাকুরের প্রত্যক্ষ করবে; প্রেমভক্তি লাভ করবে; (নিজের ভক্তদিগের শরীর দেখাইয়া) এ খোলটা দিয়ে মা অনেক খেলা আগমনের কথায় খেলবে, অনেকের উপকার করবে, তাই এ খোলটা এখনও ভেঙ্গে দেয় নি—রেখেছে। তুমি কি বল?”

এ সব কি মাথার ভুল, না ঠিক দেখেছি, বল দেখি?”

মথুর বলিলেন, “মাথার ভুল কেন হবে, বাবা? মা যখন তোমায় এ পর্য্যন্ত কোনটাই ভুল দেখান নাই, তখন এটাই বা কেন ভুল হবে? এটাও ঠিক হবে; এখনও তারা সব দেবী করুচে কেন? (অস্তরঙ্গ ভক্তেরা) শীগ্‌গির শীগ্‌গির আসুক না, তাদের নিয়ে আনন্দ করি।”

গুরুভাবে মথুরের প্রতি কৃপা

‘বাবা’ও বুঝিয়া গেলেন, মা ওসব ঠিক দেখাইয়াছেন। বলিলেন, “কি জানি বাবু, কবে তারা সব আসবে; মা বলেছেন, দেখিয়েছেন; মার ইচ্ছায় যা হয় হবে।”

রাণী রাসমণির পুত্র ছিল না, চার কন্যা ছিল। মথুর বাবু তাঁহাদের মধ্যে তৃতীয়া ও কনিষ্ঠাকে পর পর বিবাহ করিয়া-
ছিলেন। অবশ্য একজনের মৃত্যু হইলে অপরকে
ঠাকুরের
বালকভাবে
দৃষ্টান্ত—স্বনি
শাক তোলা
কথা
বিবাহ করিয়াছিলেন। জামাতাদিগের ভিতর বিষয়
লইয়া পরে পাছে কোন গণ্ডগোল বাধে, এজন্য
বুদ্ধিমতী রাণী স্বয়ং বর্তমান থাকিতে থাকিতে

প্রত্যেকের ভাগ নির্দিষ্ট করিয়া চিহ্নিত করিয়া
দিয়া যান। ঐরূপে বিষয়ভাগ হওয়ার পরে একদিন মথুর
বাবুর পত্নী বা সেজগিন্নী অপরের ভাগের এক পুষ্করিণীতে স্নান
করিতে যাইয়া সুন্দর স্বনি শাক হইয়াছে দেখিয়া তুলিয়া
লইয়া আসেন। কেবল ঠাকুর তাঁহার ঐ কার্য দেখিতে
পাইয়াছিলেন। তাঁহার ঐরূপ কার্য দেখিয়াই ঠাকুরের মনে
নানা তোলাপাড়া উপস্থিত। না বলিয়া ওরূপে অপরের বিষয়
সেজগিন্নী লইয়া গেল—বড় অশ্রায়! না বলিয়া ওরূপে লইলে
যে চুরি করা হয় তাহা ভাবিল না। আর অপরের জিনিসে
লোভ করা কেন বাবু?—ইত্যাদি ইত্যাদি। ঐরূপ নানা কথা
ভাবিতেছেন, এমন সময় রাণীর যে কন্যার ভাগে ঐ পুষ্করিণী
পড়িয়াছে, তাঁহার সহিত দেখা। অমনি ঠাকুর তাঁহার নিকট এ
বিষয়ের আছোপাস্ত বলিলেন। তিনি শুনিয়া এবং সেজগিন্নী
যেন কতই অশ্রায় করিয়াছে বলিয়া ঠাকুরের ঐরূপ গম্ভীর ভাব

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

দেখিয়া হাস্তসম্বরণ করিতে পারিলেন না। ব্যঙ্গ করিয়া বলিলেন, 'তাই তো বাবা, সেজ বড় অন্যায় করেছে।' এমন সময় সেজগিন্নীও তথায় আসিয়া উপস্থিত। তিনিও ভগ্নীর হাস্তের কারণ শুনিয়া পরিহাস করিয়া বলিলেন, "বাবা, এ কথাটিও কি তোমার ওকে বলে দিতে হয়? আমি পাছে ও দেখতে পায় বলে লুকিয়ে শাকগুলি চুরি করে নিয়ে এলুম, আর তুমি কিনা তাই বলে দিয়ে আমাকে অপদস্থ করলে!" এই বলিয়া দুই ভগ্নীতে হাস্তের রোল তুলিলেন; তখন ঠাকুর বলিলেন, "তা, কি জানি বাবু, যখন বিষয় সব ভাগ-যোগ হয়ে গেল, তখন ওরূপে না বলে নেওয়াটা ভাল নয়; তাই বলে দিলুম যে, উনি শুনে যা হয় বোঝা-পড়া করুন।" রাণীর কন্ঠারা 'বাবা'র কথায় আরও হাসিতে লাগিলেন এবং ভাবিলেন, বাবার কি সরল উদার স্বভাব!

এক পক্ষে 'বাবা'র এইরূপ বালকভাব—অপর দিকে আবার অন্য জমীদারের সহিত বিবাদে মথুরের হুকুমে লাঠালাঠি ও খুন হইয়া যাওয়ায় বিপদে পতিত মথুর আসিয়া 'বাবা'কে সাংসারিক বিপদে মথুরের ঠাকুরের পরণাপন্ন হওয়া

ধরিলেন, 'বাবা, রক্ষা কর।' 'বাবা' প্রথম চটিয়া মথুরকে নানা ভৎসনা করিলেন। বলিলেন, "তুই শালা যোজ একটা হাঙ্গামা বাধিয়ে এসে বলবি।

'রক্ষা কর'—আমি কি করতে পারি রে শালা? যা, নিজে বুঝে যা—আমি কি জানি?" তারপর মথুরের নির্বন্ধে বলিলেন, "যা, মা-র ইচ্ছায় যা হয় হবে।" বাস্তবিকই সে বিপদ কাটিয়া গেল।

গুরুভাবে মথুরের প্রতি কৃপা

ঠাকুরের উভয় ভাবের পরিচায়ক এইরূপ কত দৃষ্টান্তই না
বলা যাইতে পারে। এই সকল দেখিয়া শুনিয়াই মথুরের দৃঢ়
ধারণা হইয়াছিল, বহুরূপী 'বাবা'র কৃপাতেই তাঁহার
কৃপণ মথুরের
ঠাকুরের জন্ত
অজস্র
অর্থব্যয়ের
দৃষ্টান্ত
যাহা কিছু—ধন বল, মান বল, প্রতাপ বল, আর যা
কিছুই বল। স্মরণ্য বাবাকে সাক্ষাৎ ঈশ্বরবতার
বলিয়া রাজসম্মান দেওয়া ও অচল ভক্তি-বিশ্বাস
করাটা মথুরের পক্ষে একটা বিচিত্র ব্যাপার হয়
নাই। বিষয়ী লোকের ভক্তির দৌড় ভক্তিভাজনের প্রতি অর্থ-
ব্যয়েই বুঝিতে পারা যায়। তাহাতে আবার মথুর—সূচতুর হিসাবী
বুদ্ধিমান বিষয়ী ব্যক্তি সচরাচর যেমন হইয়া থাকে—একটু
কৃপণও ছিলেন। কিন্তু 'বাবা'র বিষয়ে মথুরের অকাতরে ধনব্যয়
দেখিয়া তাঁহার ভক্তিবিশ্বাস যে বাস্তবিকই আন্তরিক ছিল,
একথা স্পষ্ট বুঝা যায়। 'বাবা'কে যাত্রা শুনাইতে সাজ-গোজ
পরাইয়া বসাইয়া, গায়কদের প্যালা বা পুরস্কার দিবার জন্ত মথুর
তাঁহার সামনে দশ দশ টাকার থাকু করিয়া একেবারে একশত
বা ততোধিক টাকা সাজাইয়া দিলেন। 'বাবা' যাত্রা শুনিয়া যাইতে
যাইতে যেমনি কোন হৃদয়স্পর্শী গান বা কথায় মুগ্ধ ও ভাবাবিষ্ট
হইলেন, অমনি হয় তো সে সমস্ত টাকাগুলিই একেবারে হাত দিয়া
গায়কের দিকে ঠেলিয়া তাহাকে পুরস্কার দিয়া ফেলিলেন!
মথুরের তাহাতে বিরক্তি নাই। 'বাবার যেমন উঁচু মেজাজ,
তেমনি তাহার মতই প্যালা দেওয়া হইয়াছে' বলিয়া আনন্দ
প্রকাশ করিতে লাগিলেন। আবার ঐরূপ টাকা সাজাইয়া
দিলেন। ভাবমুখে অবস্থিত 'বাবা'—যিনি "টাকা মাটি, মাটি টাকা"

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

করিয়া একেবারে লোভশূন্য হইয়াছেন—তাহার সম্মুখে উহা আর কতক্ষণ থাকিতে পারে? আবার হয় তো ভাবতরঙ্গের উন্মাদ-বিহ্বলতায় আত্মহারা হইয়া সমস্ত টাকা এককালে দিয়া ফেলিলেন। পরে কাছে টাকা নাই দেখিয়া হয় তো গ্নায়ের শাল ও পরনের বহুমূল্য কাপড় পর্য্যন্ত খুলিয়া দিয়া কেবল মাত্র ভাবাঘর ধারণ করিয়া নিষ্পন্দ সমাধিস্থ হইয়া রহিলেন। মথুর তাহার টাকার সার্থকতা হইল ভাবিয়া আনন্দে বিভোর হইয়া ‘বাবা’কে বীজন করিতে লাগিলেন।

রূপণ মথুরের ‘বাবা’র সম্বন্ধে এইরূপ উদারতার কতই না দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। মথুর ‘বাবা’কে সঙ্গে লইয়া ৬কাশী, বৃন্দাবনাদি তীর্থপর্যটনে যাইয়া ‘বাবা’র কথায় ৬কাশীতে ‘কল্পতরু’ হইয়া দান করিলেন; আবশ্যকীয় পদার্থ যে যাহা চাহিল, তাহাকে তাহাই দিলেন। ‘বাবা’কে সে সময়ে কিছু চাহিতে অনুরোধ করায় ‘বাবা’ কিছুই অভাব খুঁজিয়া পাইলেন না। বলিলেন, “একটি কমণ্ডলু দাও।” ‘বাবা’র ত্যাগ দেখিয়া মথুরের চক্ষে জল আসিল।

মথুরের সহিত কাশী, বৃন্দাবনাদি তীর্থদর্শনে যাইবার কালে ৬বৈষ্ণবনাথের নিকটবর্তী কোন গ্রামের ভিতর দিয়া ৬ঠাকুরের ইচ্ছায় মথুরের বৈষ্ণবনাথে পরিভ্রমণে যাইবার সময় গ্রামবাসীর দুঃখ-দারিদ্র্য দেখিয়া ‘বাবা’র হৃদয় একেবারে ককণায় পূর্ণ হইল। মথুরকে বলিলেন, “তুমি তো মা-র দেওয়ান।

এদের এক মাথা করে তেল ও একখানা করে কাপড় দাও, আর পেটটা ভরে একদিন খাইয়ে দাও।” মথুর প্রথম একটু পেছপাও

গুরুভাবে মথুরের প্রতি কৃপা

হইলেন। বলিলেন, “বাবা, তীর্থে অনেক খরচ হবে, এও দেখছি অনেকগুলি লোক—এদের খাওয়াতে-দাওয়াতে গেলে টাকার অনটন হয়ে পড়তে পারে। এ অবস্থায় কি বলেন?” সে কথা শুনে কে? বাবার তখন গ্রামবাসীদের দুঃখ দেখিয়া চক্ষে অনবরত জল পড়িতেছে, হৃদয়ে অপূর্ব করুণার আবেশ হইয়াছে। বলিলেন, “দূর শালা, তোরা কাশী আমি যাব না। আমি এদের কাছেই থাকব; এদের কেউ নেই, এদের ছেড়ে যাব না।” এই বলিয়া বালকের গায় গৌ ধরিয়া দরিদ্রদের মধ্যে ঘাইয়া উপবেশন করিলেন। তাঁহার ঐরূপ করুণা দেখিয়া মথুর তখন কলিকাতা হইতে কাপড় আনাইয়া ‘বাবা’র কথামত সকল কার্য করিলেন। ‘বাবা’ও গ্রামবাসীদের আনন্দ দেখিয়া আনন্দে আটখানা হইয়া তাহাদের নিকট বিদায় লইয়া হাসিতে হাসিতে মথুরের সহিত ৮কাশী গমন করিলেন। শুনিয়াছি মথুরের সহিত রাণাঘাটের সম্মিলিত তাঁহার জমিদারীভুক্ত কোন গ্রামে অণু এক সময়ে বেড়াইতে ঘাইয়া গ্রামবাসীদের দুর্দশা দেখিয়া ঠাকুরের হৃদয়ে ঐরূপ করুণার আর একবার উদয় হইয়াছিল এবং মথুরের দ্বারা আর একবার ঐরূপ অনুষ্ঠান করাইয়াছিলেন।

গুরুভাবমুখে অবস্থিত ঠাকুর এইরূপ মধুর সম্বন্ধে মথুরকে চিরকালের মত আবদ্ধ করিয়াছিলেন। সাধনকালে এক সময়ে ঠাকুরের মনে যে অদ্ভুত ভাবের সহসা উদয় হইয়া তাঁহাকে শ্রীশ্রীজগদম্বার নিকট প্রার্থনা করাইয়াছিল, “মা, আমাকে শুকনো সাধু করিস্ নি, রসে বসে রাখিস্”—মথুরানাথের সহিত এই প্রকার অদৃষ্টপূর্ব সম্বন্ধ তাহারই পরিণত ফলবিশেষ। কারণ

সেই প্রার্থনার ফলেই ৮জগন্নাথ ঠাকুরকে দেখাইয়া দেন, তাঁহার দেহরক্ষাদি প্রয়োজনসিদ্ধির জন্তু চারিজন রসদার তাঁহার সঙ্গে

ঠাকুরের সহিত
মধুরের সম্বন্ধ
দৈবনির্দিষ্ট;
ভোগবাসনা
ছিল বলিয়া
মধুরের
পুনর্জন্ম সম্বন্ধে
ঠাকুর

প্রেরিত হইয়াছে এবং মথুরানাথই তাঁহাদের ভিতর প্রথম ও অগ্রণী। দৈবনির্দিষ্ট সম্বন্ধ না হইলে কি এতকাল এ সম্বন্ধ একরূপ অক্ষুণ্ণভাবে কখন থাকিতে পারিত? হায় পৃথিবী, একরূপ বিশুদ্ধ মধুর সম্বন্ধ এতকাল কয়টাই বা তুমি নয়নগোচর করিয়াছ! আর বলি, হায় ভোগবাসনা, তুমি কি বজ্রবন্ধনেই না মানবমনকে বাঁধিয়াছ! এই

শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব অহেতুক ভালবাসার ঘনীভূত প্রতিমা এমন অদ্ভুত ঠাকুরকে দেখিয়া ও তাঁহার সঙ্গে সম্বন্ধ পাতাইয়া এখনও আমাদের মন তোমাকে ছাড়িয়াও ছাড়িতে চাহে না। জর্নৈক বন্ধু ঠাকুরের নিজমুখ হইতে একদিন মথুরানাথের অপূর্ব কথা শুনিতে শুনিতে তাঁহার মহাভাগ্যের কথা ভাবিয়া স্তম্ভিত ও বিভোর হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “(মৃত্যুর পর) মধুরের কি হল মশায়? তাকে নিশ্চয়ই বোধ হয় আর জন্মগ্রহণ করতে হবে না!” ঠাকুর শুনিয়া উত্তর করিলেন, “কোথাও একটা রাজ্য হয়ে জন্মেছে আর কি! ভোগবাসনা ছিল।” এই বলিয়াই ঠাকুর অণু কথা পাড়িলেন।

অষ্টম অধ্যায়

গুরুভাবে নিজ গুরুগণের সহিত সম্বন্ধ

সর্বশ্ৰু চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো

মন্তঃ স্মৃতিজ্ঞানিমপোহনং চ ।

বেদৈশ্চ সৰ্বৈরহমেব বেত্তো

বেদাস্তকৃৎসেদবিদেব চাহম্ ॥ —গীতা, ১৫।১৫

পূর্বেই বলিয়াছি, যিনি গুরু হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন,
বাল্যাবধিই তাঁহার ভিতর ঐ ভাবের পরিচয় বেশ পাওয়া গিয়া

থাকে। মহাপুরুষ অবতারকূলের ত কথাই নাই।

গুরুভাব

অবতারপুরুষ-

দিগের নিজস্ব

সম্পত্তি

তাঁহাদের মধ্যে যিনি জনসমাজে যে ভাবপ্রতিষ্ঠার

জন্য জন্মগ্রহণ করেন, বাল্যাবধিই তাঁহাতে যেন ঐ

ভাব প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাওয়া যায়। শরীরেন্দ্রিয়া-

দির পূর্ণতা, দেশকালাদি অবস্থাসকলের অনুকূলতা প্রভৃতি

কারণসমূহ ক্রমে ক্রমে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের জীবনে ঐ ভাব

পূর্ণ পরিষ্ফুট হইবার সহায়তা করিতে পারে; কিন্তু ঐ সকল

কারণই যে তাঁহাদের ভিতর ঐ ভাবের জন্ম দিয়া এ জীবনে

তাঁহাদের গুরু করিয়া তুলে, তাহা নহে। দেখা যায়, উহা যেন

তাঁহাদের নিজস্ব সম্পত্তি, উহা লইয়াই তাঁহারা যেন জীবন আরম্ভ

করিয়াছেন এবং বর্তমান জীবনে ঐ ভাবোৎপত্তির কারণানু-

সন্ধান করিলে সহস্র চেষ্টাতেও তাহা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

ঠাকুরের জীবনে গুরুভাবোৎপত্তি অনুসন্ধান করিতে যাইলেও ঠিক এরূপ দেখা যায়। বাল্যে দেখ, যৌবনে দেখ, সাধনকালে দেখ, সকল সময়েই ঐ ভাবের অস্বাভিক বিকাশ তাঁহার জীবনে দেখিতে পাইয়া অবাক হইতে হয়; আর কিরূপে ঐ ভাবের প্রথম আরম্ভ তাঁহার জীবনে উপস্থিত হইল, এ কথা ভাবিয়া-চিন্তিয়া কিছুই স্থির করিতে পারা যায় না। বাল্যজীবনের উল্লেখ এখানে করিয়া আমাদের পুঁথি বাড়াইতে ইচ্ছা নাই। তবে ঠাকুরের যৌবন এবং সাধনকাল, যে কালের আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত মথুর বাবুকে লইয়া কত প্রকার গুরুভাবের লীলার বিকাশ হইয়াছিল, সেই কালেরই অনেক কথা এখনও বলিতে বাকি আছে এবং তাহাই এখন পাঠককে উপহার দিলে মন্দ হইবে না।

মন্ত্রদাতা গুরু এক হইলেও উপগুরু বা শিক্ষাগুরু অনেক করা যাইতে পারে—এ বিষয়টি ঠাকুর অনেক সময়ে আমাদের কাছে

ঠাকুরের বহু
গুরুর নিকট
হইতে
দীক্ষা-গ্রহণ

শ্রীমদ্ভাগবতের অবধূতোপাখ্যানের কথা তুলিয়া বুঝাইতে প্রয়াস পাইতেন। ভাগবতে লেখা আছে, ঐ অবধূত ক্রমে ক্রমে চব্বিশ জন উপগুরুর নিকট হইতে বিশেষ বিশেষ শিক্ষা পর পর লাভ করিয়া সিদ্ধ হইয়াছিলেন। ঠাকুরের জীবনেও আমরা ঐরূপে বিশেষ বিশেষ সাধনোপায় ও সত্যোপলব্ধির জন্য বহু গুরুগ্রহণের অভাব দেখি না। তন্মধ্যে ভৈরবী ব্রাহ্মণী, 'ল্যাংটা' তোতাপুরী ও মুসলমান গোবিন্দের নামই আমরা অনেক সময় তাঁহাকে বলিতে শুনিয়াছি। অপরাপর হিন্দুসম্প্রদায়ের সাধনোপায়সমূহ অগ্ৰাণ্য গুরুগণের নিকট

গুরুভাবে নিজ গুরুগণের সহিত সম্বন্ধ

হইতে শিক্ষা করিলেও ঠাকুর তাঁহাদের নাম বড় একটা উল্লেখ করিতেন না। কেবলমাত্র বলিতেন যে, তিনি অন্যান্য গুরুগণের নিকট হইতে অন্যান্য মতের সাধন-প্রণালী জানিয়া লইয়া তিন তিন দিন মাত্র সাধন করিয়াই ঐ সকল মতে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। ঐ সকল গুরুগণের নাম ঠাকুরের মনে ছিল না অথবা বিশেষ উল্লেখযোগ্য নহে বলিয়াই ঠাকুর উল্লেখ করিতেন না, তাহা এখন বলা কঠিন। তবে এটা বুঝা যায় যে, তাঁহাদের সহিত সম্বন্ধও ঠাকুরের অতি অল্প কালের নিমিত্ত হইয়াছিল। সেজন্য তাঁহাদের কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য নহে।

ঠাকুরের শিক্ষাগুরুগণের ভিতর আবার ভৈরবী ব্রাহ্মণী তাঁহার নিকটে বহুকাল বাস করিয়াছিলেন। কত কাল, তাহা ঠিক নির্দেশ করা বলা স্কঠিন; কারণ, ঠাকুরের শ্রীচরণপ্রাপ্তে ভৈরবী ব্রাহ্মণী আমাদের আশ্রয়গ্রহণ করিবার কিছুকাল পূর্বে বা 'বাম্নী' তিনি দক্ষিণেশ্বর পরিত্যাগ করিয়া অন্ত্র গমন করেন এবং পুনরায় আর ফিরিয়া আসেন নাই। ইহার পরে ঠাকুর তাঁহার আর একবার মাত্র সন্ধান পাইয়াছিলেন; তখন ঐ ব্রাহ্মণী ভৈরবী ৮কাশীধামে তপস্চায় কাল কাটাইতেছিলেন।^১

ব্রাহ্মণী ভৈরবী যে বহুকাল দক্ষিণেশ্বর-কালীবাটীতে এবং তন্নিকটবর্তী গঙ্গাতটে—যথা, দেবমণ্ডলের ঘাট প্রভৃতি স্থলে বাস করিয়াছিলেন, ইহা আমরা ঠাকুরের শ্রীমুখ হইতে শুনিয়াছি। শুনিয়াছি, ব্রাহ্মণী ঠাকুরকে চৌষট্ঠিখানা প্রধান প্রধান তন্ত্রোক্ত যত কিছু সাধন-প্রণালী সকলই একে একে অন্বেষণ

^১ সাধকভাব (১০ম সংস্করণ), ৩৫৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য।—প্রঃ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

করাইয়াছিলেন। শুনিয়াছি, ব্রাহ্মণী বৈষ্ণবমতসম্বন্ধীয় তত্ত্বাদিতেও
 'বামনীর
 ঠাকুরকে
 সহায়তা
 সুপণ্ডিত ছিলেন; তবে ঠাকুরকে সখীভাব প্রভৃতি
 সাধনকালেও কোন কোন স্থলে সহায়তা করিয়া-
 ছিলেন কিনা, ঐ বিষয়ে কোন কথা স্পষ্ট শ্রবণ করি
 নাই।^১ শুনিয়াছি যে ঠাকুরকে ঐরূপে সাধনকালে সহায়তা
 করিবার সময় উত্তীর্ণ হইয়া যাইবার পরেও তিনি কয়েক বৎসর,
 সর্বশুদ্ধ কিছুদধিক ছয় বৎসর কাল, বহু সম্মানে দক্ষিণেশ্বরে বাস
 করিয়াছিলেন এবং ঐ কালের মধ্যে কখন কখন ঠাকুর এবং তাঁহার
 ভাগিনেয় হৃদয়ের সহিত ঠাকুরের জন্মভূমি কামারপুকুরে পর্য্যন্ত
 যাইয়া তাঁহার আত্মীয়দিগের মধ্যেও বাস করিয়া আসিয়াছিলেন।
 শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী এই সময় হইতে ব্রাহ্মণীকে আপন স্বাক্ষর গায়
 সম্মান এবং মাতৃসম্বোধন করিতেন।

ব্রাহ্মণী বৈষ্ণবদিগের সাধন-প্রণালী অনুসরণ করিয়া সখ্য-
 বাৎসল্যাদি ভাবসমূহের রসও কিছু কিছু নিজ জীবনে অনুভব
 করিয়াছিলেন। দক্ষিণেশ্বরে দেবমণ্ডলের ঘাটে
 'বামনীর
 বৈষ্ণব-তত্ত্বোক্ত
 ভাবে অভিজ্ঞতা
 অবস্থানকালে তিনি ঠাকুরের প্রতি বাৎসল্যরসে
 মুগ্ধ হইয়া ননী হস্তে লইয়া নয়নাশ্রুতে বসন
 সিক্ত করিতে করিতে 'গোপাল' 'গোপাল' বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে
 আহ্বান করিতেন, আর এ দিকে দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে
 সহসা ঠাকুরের মন ব্রাহ্মণীকে দেখিবার নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়া
 উঠিত। শুনিয়াছি, তখন তিনি, বালক যেমন জননীর নিকট
 উপস্থিত হয়, তেমনি একছুটে ঐ এক মাইল পথ অতিক্রম

^১ সাধকভাব (১০ম সং), দ্বাদশ অধ্যায়, ২৫৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য।—প্রঃ

গুরুভাবে নিজ গুরুগণের সহিত সম্বন্ধ

করিয়া তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইতেন এবং নিকটে বসিয়া ননী ভোজন করিতেন ! এতদ্বিধ ব্রাহ্মণীও কখন কখন কোথা হইতে যোগাড় করিয়া লাল বারণনী চেলী ও অলঙ্কারাদি ধারণ করিয়া পাড়ার স্ত্রীলোকদিগের সঙ্গে নানাপ্রকার ভক্ষ্যভোজ্যাদি হস্তে লইয়া গান গাহিতে গাহিতে ঠাকুরের নিকট দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া উপস্থিত হইতেন এবং ঠাকুরকে খাওয়াইয়া যাইতেন । ঠাকুর বলিতেন, তাঁহার আলুলায়িত কেশ এবং ভাববিহ্বল অবস্থা দেখিয়া তখন তাঁহাকে গোপালবিরহে কাতরা নন্দরাণী যশোদা বলিয়াই লোকের মনে হইত ।

ব্রাহ্মণী গুণে যেমন, রূপেও তেমনি অসামান্য ছিলেন । ঠাকুরের শ্রীমুখ হইতে শুনিয়াছি, মথুর বাবু প্রথম প্রথম ব্রাহ্মণীর রূপলাবণ্য-দর্শনে এবং তাঁহার একাকিনী অসহায় অবস্থায় 'বামনীর রূপ-গুণ দেখিয়া মথুরের সন্দেহ যথা তথা ভ্রমণাদি শুনিয়া তাঁহার চরিত্রের প্রতি সন্দিহান হইয়াছিলেন । একদিন নাকি বিদ্রুপচ্ছলে বলিয়াও ফেলিয়াছিলেন, “ভৈরবী, তোমার ভৈরব কোথায় ?” ব্রাহ্মণী তখন মা কালীর মন্দির হইতে দর্শনাদি করিয়া বাহিরে আসিতেছিলেন । হঠাৎ ঐরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়াও কিছুমাত্র অপ্রতিভ বা রাগান্বিতা না হইয়া স্থিরভাবে মথুরের প্রতি প্রথম নিরীক্ষণ করিলেন, পরে শ্রীশ্রীজগদম্বার পদতলে শবরূপে পতিত মহাদেবকে অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়া মথুরকে দেখাইয়া দিলেন । সন্দিক্ধমনা বিষয়ী মথুরও অল্পে ছাড়িবার পাত্র ছিলেন না । বলিলেন, “ও ভৈরব তো অচল ।” ব্রাহ্মণী তখন ধীর গভীর স্বরে উত্তর করিলেন, “যদি অচলকে সচল করিতেই না

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

পারিব তবে আর ভৈরবী হইয়াছি কেন ?” ব্রাহ্মণীর এইরূপ ধীর গম্ভীর ভাব ও উত্তরে মথুর লজ্জিত ও অপ্রতিভ হইয়া নির্বাক হইয়া রহিলেন। পরে দিন দিন তাঁহার উচ্চ প্রকৃতি ও অশেষ গুণের পরিচয় যতই পাইতে থাকিলেন, ততই মথুরের মনে আর ঐরূপ দুষ্ট সন্দেহ রহিল না।

ঠাকুরের শ্রীমুখে শুনিয়াছি, ব্রাহ্মণী পূর্ববঙ্গের কোন স্থলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে দেখিলেই ‘বড় ঘরের মেয়ে’

বলিয়া সকলের নিঃসংশয় ধারণা হইত। বাস্তবিকও
‘বামনী’র
পূর্বপরিচয়
তিনি তাহাই ছিলেন। কিন্তু কোন্ গ্রামে কাহার

ঘর পুত্রীরূপে আলো করিয়াছিলেন, ঘরণীরূপে কাহারও ঘর কখনও উজ্জল করিয়াছিলেন কি না এবং প্রৌঢ় বয়সে এইরূপে সন্ন্যাসিনী হইয়া দেশ-বিদেশে ভ্রমণ করিবার ও সংসারে বীতরাগ হইবার কারণই বা কি হইয়াছিল, তাহা আমরা ঠাকুরের নিকট হইতে কখনও শুনি নাই। আবার এত লেখাপড়াই বা শিখিলেন কোথায় এবং সাধনেই বা এত উন্নতিলাভ কোথায়, কবে করিলেন—তাহাও আমাদের কাহারও কিছুমাত্র জানা নাই।

সাধনে যে ব্রাহ্মণী বিশেষ উন্নতা হইয়াছিলেন, একথা আর বলিতে হইবে না। দৈবকর্তৃক ঠাকুরের গুরুরূপে মনোনীত

হওয়াতেই তাহার পরিচয় বিশেষরূপে পাওয়া
ব্রাহ্মণী
উচ্চদের
সাধিকা
যায়। আবার যখন ঠাকুরের শ্রীমুখ হইতে আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, ব্রাহ্মণী তাঁহার নিকটে

আসিবার পূর্বেই যোগবলে জানিতে পারিয়াছিলেন যে, জীবৎকালে তাঁহাকে ঠাকুরপ্রমুখ তিন ব্যক্তিকে সাধনায়

গুরুভাবে নিজ গুরুগণের সহিত সম্বন্ধ

সহায়তা করিতে হইবে এবং ঐ তিন ব্যক্তির সহিত ভিন্ন ভিন্ন দেশে ও কালে সাক্ষাৎ হইবামাত্র ব্রাহ্মণী তাঁহাদের চিনিয়া ঐরূপ করিয়াছিলেন, তখন আর এ বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ থাকে না।

ব্রাহ্মণী ঠাকুরের সহিত প্রথম সাক্ষাতেই চন্দ্র ও গিরিজার কথা তাঁহাকে বলিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন, “বাবা, তাদের দুজনকে ইহার পূর্বেই পেয়েছি; আর তোমাকে ‘বামনীর যোগলক্ষণ’র এত দিন খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছিলেম, আজ পেলাম। তাদের সঙ্গে পরে তোমায় দেখা করিয়ে দেব।”

বাস্তবিকও পরে ঐ দুই ব্যক্তিকে দক্ষিণেশ্বরে আনিয়া ব্রাহ্মণী ঠাকুরের সহিত দেখা করাইয়া দেন। ঠাকুরের শ্রীমুখে শুনিয়াছি, ইহারা দুই জনেই উচ্চদের সাধক ছিলেন। কিন্তু সাধনার পথে অনেকদূর অগ্রসর হইলেও ঈশ্বরের দর্শনলাভে সিদ্ধকাম হইতে পারেন নাই। বিশেষ বিশেষ শক্তি বা সিদ্ধাই লাভ করিয়া পথভ্রষ্ট হইতে বসিয়াছিলেন।

ঠাকুর বলিতেন, চন্দ্র ভাবুক ঈশ্বরপ্রেমিক ছিলেন। তাঁহার ‘গুটিকা-সিদ্ধি’-লাভ হইয়াছিল। মন্ত্রপূত গুটিকাটি অঙ্গে ধারণ করিয়া তিনি সাধারণ নয়নের দৃষ্টিবহির্ভূত বা অদৃশ্য হইতে পারিতেন এবং ঐরূপে অদৃশ্য হইয়া সযত্নে রক্ষিত, দুর্গম স্থানেও গমনাগমন করিতে পারিতেন। কিন্তু ঈশ্বরলাভের পূর্বে ক্ষুদ্র মানব-মন ঐ প্রকার সিদ্ধাইসকল লাভ করিলেই যে অহঙ্কৃত হইয়া উঠে এবং অহঙ্কারবৃদ্ধিই যে মানবকে বাসনাঙ্গলে জড়িত করিয়া উচ্চ লক্ষ্যে

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

অগ্রসর হইতে দেয় না এবং পরিশেষে তাহার পতনের কারণ হয়, একথা আর বলিতে হইবে না। অহঙ্কারবুদ্ধিতেই পাপের বুদ্ধি এবং উহার হ্রাসেই পুণ্যলাভ, অহঙ্কারবুদ্ধিতেই ধর্মহানি এবং অহঙ্কারনাশেই ধর্মলাভ, স্বার্থপরতাই পাপ এবং স্বার্থনাশই পুণ্য, “‘আমি’ মলে ফুরায় জঞ্জাল”—এসব কথা ঠাকুর আমাদের বার বার কত প্রকারেই না বুঝাইতেন। বলিতেন, “ওরে, অহঙ্কারকেই শাস্ত্রে চিঙ্কড়গ্রন্থি বলেছে; চিৎ অর্থাৎ জ্ঞানস্বরূপ আত্মা এবং জড় অর্থাৎ দেহেন্দ্রিয়াদি; ঐ অহঙ্কার এতদুভয়কে একত্রে বাধিয়া রাখিয়া মানব-মনে ‘আমি দেহেন্দ্রিয়বুদ্ধাদিবিশিষ্ট জীব’—এই ভ্রম স্থির করিয়া রাখিয়াছে। ঐ বিষম গাঁটটা না কাটতে পারলে এগুনো যায় না। ঐটেকে ত্যাগ করতে হবে। আর মা আমাকে দেখিয়ে দিয়েছে, সিদ্ধাইগুলো বিষ্ঠাতুল্য হয়। ওসকলে মন দিতে নেই। সাধনায় লাগলে ওগুলো কখন কখন আপনা আপনি এসে উপস্থিত হয়, কিন্তু ওগুলোয় যে মন দেয়, সে ঐখানেই থেকে যায়, ভগবানের দিকে আর সিদ্ধাই এগুতে পারে না।” স্বামী বিবেকানন্দের ধ্যানই যোগব্রষ্টকারী জীবনস্বরূপ ছিল; খাইতে শুইতে বসিতে সকল সময়েই তিনি ঈশ্বরধ্যানে মন রাখিতেন, কতকটা মন সর্বদা ভিতরে ঈশ্বরের চিন্তায় রাখিতেন। ঠাকুর বলিতেন তিনি ‘ধ্যানসিদ্ধ।’ ধ্যান করিতে করিতে সহসা একদিন তাঁহার দূরদর্শন ও শ্রবণের (বহু দূরে অবস্থিত ব্যক্তিসকল কি করিতেছে, বলিতেছে, ইহা দেখিবার ও শ্রবণ করিবার) ক্ষমতা আসিয়া উপস্থিত। ধ্যান করিতে বসিয়া একটু ধ্যান জমিলেই মন এমন এক ভূমিতে

গুরুভাবে নিজ গুরুগণের সহিত সম্বন্ধ

উঠিত যে, তিনি দেখিতেন অমুক ব্যক্তি অমুক বাটীতে বসিয়া অমুক প্রসঙ্গে কথাবার্তা কাহতেছেন। ঐরূপ দেখিয়াই আবার প্রাণে ইচ্ছার উদয় হইত, যাহা দেখিলাম তাহা সত্য কি মিথ্যা, জানিয়া আসি। আর অমনি ধ্যান ছাড়িয়া তিনি সেই সেই স্থলে আসিয়া দেখিতেন, যাহা ধ্যানে দেখিয়াছেন তাহার সকলই সত্য, এতটুকু মিথ্যা নহে। কয়েক দিবস ঐরূপ হইবার পর ঠাকুরকে ঐ কথা বলিবামাত্র ঠাকুর বলিলেন, “ও সকল ঈশ্বরলাভ-পথের অন্তরায়। এখন কিছুদিন আর ধ্যান করিস্ নি।”

শ্রুতিকাসিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া চন্দ্রেরও অহঙ্কার বাড়িয়া উঠিয়াছিল। ঠাকুরের নিকট গুনিয়াছি, চন্দ্রের মনে ক্রমে কাম-কাঙ্ক্ষাসক্তি বাড়িয়া যায় এবং এক অবস্থাপন্ন সিদ্ধাই-লাভে চন্দ্রের পতন সম্ভ্রাস্ত ধনী ব্যক্তির কন্যার প্রতি আসক্ত হইয়া ঐ সিদ্ধাইপ্রভাবে তাহার বাটীতে যাতায়াত করিতে থাকেন এবং ঐরূপে অহঙ্কার ও স্বার্থপরতার বৃদ্ধিতে ক্রমে ঐ সিদ্ধাইও হারাইয়া বসিয়া নানারূপে লাঞ্চিত হন।

গিরিজারও অদ্ভুত ক্ষমতার কথা ঠাকুর আমাদের বলিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন যে, একদিন ঠাকুর তাঁহার সঙ্গে দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীর নিকটবর্তী শ্রীযুক্ত শঙ্কু মল্লিকের বাগানে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। শঙ্কু মল্লিক ঠাকুরকে বড়ই ভালবাসিতেন এবং ঠাকুরের কোনরূপ সেবা করিতে পারিলে আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিতেন। শঙ্কু বাবু ২৫০৮ দিয়া কালীবাড়ীর নিকট কিছু জমি খাজনা করিয়া লইয়া তাহার উপর শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর থাকিবার জন্ম ঘর

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

করিয়া দিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী তখন তখন গঙ্গান্নান করিতে এবং ঠাকুরকে দেখিতে আসিলে ঐ ঘরেই বাস করিতেন। ঐ স্থানে থাকিবার কালে এক সময়ে তিনি কঠিন রক্তামাশয় পীড়ায় আক্রান্ত হন; তখন শঙ্কু বাবুই চিকিৎসা, পথ্যাদি সকল বিষয়ের বন্দোবস্ত করিয়া দেন। শঙ্কু বাবুর ভক্তিমতী পত্নীও ঠাকুর এবং শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করিতেন, প্রতি জয়মঙ্গলবারে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী এখানে থাকিলে তাঁহাকে লইয়া গিয়া দেবীজ্ঞানে পূজা করিতেন। এতদ্ভিন্ন শঙ্কু বাবু ঠাকুরের কলিকাতায় গমনাগমনের গাড়ীভাড়া এবং খাটাদির যখন যাহা প্রয়োজন হইত, তাহাই যোগাইতেন। অবশ্য মথুর বাবুর শরীরত্যাগের পরই শঙ্কু বাবু ঠাকুরের ঐরূপ সেবাধিকার প্রাপ্ত হন। শঙ্কুকে ঠাকুর তাঁহার ‘দ্বিতীয় রসদার’ বলিয়া নির্দেশ করিতেন এবং তখন তখন প্রায়ই তাঁহার উদ্যানে বেড়াইতে যাইয়া তাঁহার সহিত ধর্ম্মালাপে কয়েক ঘণ্টাকাল কাটাইয়া আসিতেন।

গিরিজার সহিত সেদিন শঙ্কুবাবুর বাগানে বেড়াইতে যাইয়া কথায়-বার্তায় অনেক কাল কাটিয়া গেল। ঠাকুর বলিতেন,
গিরিজার
সিদ্ধাই
“ভক্তদের গাঁজাখোরের মত স্বভাব হয়। গাঁজা-
খোর যেমন গাঁজার কল্কেতে ভরপুর এক দম
লাগিয়ে কল্কেটা অপরের হাতে দিয়ে ধোঁয়া
ছাড়তে থাকে—অপর গাঁজাখোরের হাতে ঐরূপে কল্কেটা না
দিতে পারলে যেমন তার একলা নেশা করে সুখ হয় না, ভক্তে-
রাও সেইরূপ একসঙ্গে জুটলে একজন ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ, ভাবে



ভাষ্কর চন্দ্র গল্পিক

গুরুভাবে নিজ গুরুগণের সহিত সম্বন্ধ

তন্ময় হয়ে বলে ও আনন্দে চুপ করে এবং অপরকে ঐ কথা বলতে অবসর দেয় ও শুনে আনন্দ পায়।” সেদিন শঙ্কু বাবু, গিরিজা ও ঠাকুর একসঙ্গে ঐরূপে মিলিত হওয়ায় কোথা দিয়া যে কাল কাটিতে লাগিল তাহা কেহই টের পাইলেন না। ক্রমে সন্ধ্যা ও এক প্রহর রাত্রি হইল, তখন ঠাকুরের ফিরিবার হুঁশ হইল। শঙ্কুর নিকট হইতে বিদায় লইয়া গিরিজার সহিত রাস্তায় আসিলেন এবং কালীবাটীর অভিমুখে চলিতে লাগিলেন। কিন্তু বেজায় অন্ধকার। পথের কিছুই দেখিতে না পাওয়ায় প্রতি পদে পদস্থলন ও দিক্ভুল হইতে লাগিল। অন্ধকারের কথা খেয়াল না করিয়া, ঈশ্বরীয় কথার বোকে চলিয়া আসিয়াছেন, শঙ্কুর নিকট হইতে একটা লণ্ঠন চাহিয়া আনিতে ভুলিয়া গিয়াছেন— এখন উপায়? কোনরূপে গিরিজার হাত ধরিয়া হাতড়াইয়া চলিতে লাগিলেন। কিন্তু বেজায় কষ্ট হইতে লাগিল। তাঁহার ঐরূপ কষ্ট দেখিয়া গিরিজা বলিলেন, “দাদা, একবার দাঁড়াও, আমি তোমায় আলো দেখাইতেছি।”—এই বলিয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইলেন এবং তাঁহার পৃষ্ঠদেশ হইতে জ্যোতির একটা লম্বা ছটা নির্গত করিয়া পথ আলোকিত করিলেন। ঠাকুর বলিতেন, “সে ছটায় কালীবাটীর ফটক পর্যন্ত বেশ দেখা যাইতে লাগিল ও আমি আলোয় আলোয় চলিয়া আসিলাম।”

এই কথা বলিয়াই কিন্তু ঠাকুর আবার ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, “কিন্তু তাদের ঐরূপ ক্ষমতা আর বেশী দিন রইল না, এখানকার (তাঁহার নিজের) সঙ্গে কিছুদিন থাকতে থাকতে ঐ সকল সিদ্ধাই চলে গেল।” আমরা ঐরূপ হইবার কারণ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন, (নিজেই শরীর দেখাইয়া) “মা এর
গুরুভাবে
ঠাকুরের চন্দ্র
ও গিরিজার
সিদ্ধাই-নাশ
ভেতরে তাদের কল্যাণের জন্য তাদের সিদ্ধাই
বা শক্তি আকর্ষণ করে নিলেন। আর ঐরূপ
হবার পর তাদের মন আবার ঐ সব ছেড়ে
ঈশ্বরের দিকে এগিয়ে গেল।”

এই বলিয়াই ঠাকুর আবার বলিলেন, “ও-সকলে আছে কি ?
ও-সব সিদ্ধাইয়ের বন্ধনে পড়ে মন সচ্চিদানন্দ থেকে দূরে চলে
সিদ্ধাই
ভগবানলাভের
অস্তরায় ;
ঐ বিষয়ে
ঠাকুরের ‘পায়ে
হেঁটে নদী
পারের’ গল্প
যায়। একটা গল্প শোন—একজনের দুই ছেলে
ছিল। বড়র যৌবনেই বৈরাগ্য হলো ও সংসারত্যাগ
করে সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে গেল। আর ছোট
লেখা-পড়া শিখে ধাঞ্চিক বিদ্বান হয়ে বিবাহ করে
সংসারধর্ম করতে লাগলো। এখন সন্ন্যাসীদের
নিয়ম—বার বৎসর অস্তে, ইচ্ছা হলে একবার
জন্মভূমি দর্শন করতে যায়। ঐ সন্ন্যাসীও ঐরূপে বার বৎসর
বাদে জন্মভূমি দেখতে আসে এবং ছোট ভায়ের জমী, চাষ-বাস,
ধন-ঐশ্বর্য দেখতে দেখতে তার বাড়ীর দরজায় এসে দাঁড়িয়ে
তার নাম ধরে ডাকতে লাগল। নাম শুনে ছোট ভাই বাইরে
এসে দেখে—তার বড় ভাই। অনেক দিন পরে ভাইয়ের সঙ্গে
দেখা—ছোট ভায়ের আর আনন্দের সীমা রইল না। দাদাকে
প্রণাম করে বাড়ীতে এনে বসিয়ে তার সেবানি করতে লাগল।
আহারান্তে দুই ভায়ে নানা প্রসঙ্গ হতে লাগল। তখন ছোট
বড়কে জিজ্ঞাসা করলে, ‘দাদা, তুমি যে এই সংসারের ভোগ-সুখ
সব ত্যাগ করে এতদিন সন্ন্যাসী হয়ে ফিরলে, এতে কি লাভ

গুরুভাবে নিজ গুরুগণের সহিত সম্বন্ধ

করলে আমাকে বল।’ শুনেই দাদা বললে, ‘দেখ্‌বি? তবে আমার সঙ্গে আয়।’—বলেই ছোট ভাইকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ীর নিকটে নদীতীরে এসে উপস্থিত হল এবং ‘এই দেখ্‌’ বলেই নদীর জলের উপর দিয়ে হেঁটে পরপারে চলে গেল। গিয়ে বললে, ‘দেখ্‌লি?’ ছোট ভাইও পার্শ্বে খেয়া নৌকার মাঝিকে আধ পয়সা দিয়ে নদী পেরিয়ে বড় ভায়ের নিকটে গিয়ে বললে, ‘কি দেখ্‌লুম?’ বড় বললে, ‘কেন? এই হেঁটে নদী পেরিয়ে আসা?’ তখন ছোট ভাই হেসে বললে, ‘দাদা, তুমিও তো দেখলে—আমি আধ পয়সা দিয়ে এই নদী পেরিয়ে এলুম। তা তুমি এই বার বৎসর এত কষ্ট ময়ে এই পেয়েছ? আমি যা আধ পয়সায় অনায়াসে করি, তাই পেয়েছ? ও ক্ষমতার দাম তো আধ পয়সা মাত্র!’ ছোটর ঐ কথায় বড় ভায়ের তখন চৈতন্য হয় এবং ঈশ্বরলাভে মন দেয়।”

ঐরূপে কথাগুলো ঠাকুর কত প্রকারেই না আমাদের বুঝাইতেন যে, ধর্মজগতে ঐ প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষমতালভ অতি

তুচ্ছ, হেয়, অকিঞ্চিৎকর পদার্থ। ঠাকুরের আর

সিদ্ধাইয়ে

অহঙ্কার-বুদ্ধি-

বিষয়ে

ঠাকুরের ‘হাতী-

মরা-বাঁচার’

গল্প

একটি গল্পও আমরা এখানে না দিয়া থাকিতে

পারিলাম মা—“একজন যোগী যোগসাধনায়

বাকসিদ্ধি লাভ করেছিল। যাকে যা বলতো তাই

তৎক্ষণাৎ হোত; এমন কি কাকেও যদি বলত

‘মর’, তো সে অমনি মরে যেত, আবার যদি তখনি

বলত ‘বাঁচ’, তো তখনি বেঁচে উঠত। একদিন ঐ যোগী পথে

যেতে একজন ভক্ত সাধুকে দেখতে পেলে। দেখলে তিনি

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

সর্বদা ঈশ্বরের নাম জপ ও ধ্যান কচ্ছেন। শুনে, ঐ ভক্ত সাধুটি ঐ স্থানে অনেক বৎসর ধরে তপস্যা কচ্ছেন। দেখে-শুনে অহঙ্কারী যোগী ঐ সাধুটির কাছে গিয়ে বললে, ‘ওহে, এতকাল ধরে ত ভগবান ভগবান করুচ, কিছু পেলে বলতে পার?’ ভক্ত সাধু বললেন, ‘কি আর পাব বলুন। তাঁকে (ঈশ্বরকে) পাওয়া ছাড়া আমার ত আর অন্য কোন কামনা নেই। আর তাঁকে পাওয়া তাঁর কৃপা না হলে হয় না। তাই পড়ে পড়ে তাঁকে ডাক্চি, দীন হীন বলে যদি কোন দিন কৃপা করেন।’ যোগী ঐ কথা শুনেই বললে, ‘যদি নাই কিছু পেলে, তবে এ পণ্ড্রমের আবশ্যক? যাতে কিছু পাও তার চেষ্টা কর।’ ভক্ত সাধুটি শুনিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। পরে বললেন, ‘আচ্ছা মশায়, আপনি কি পেয়েছেন—শুন্তে পাই কি?’ যোগী বললে, ‘শুন্বে আর কি—এই দেখ।’ এই বলে নিকটে বৃক্ষতলে একটা হাতী বাঁধা ছিল, তাকে বললে, ‘হাতী, তুই মর। অমনি হাতীটা মরে পড়ে গেল। যোগী দস্ত করে বললে, ‘দেখলে? আবার দেখ।’ বলেই মরা হাতীটাকে বললে, ‘হাতী, তুই বাঁচ।’ অমনি হাতীটা বেঁচে পূর্বের গায় গা ঝেড়ে উঠে দাঁড়াল। যোগী বললে, ‘কি হে, দেখলে তো?’ ভক্ত সাধু এতক্ষণ চুপ করে ছিলেন; এখন বললেন, ‘কি আর দেখলুম বলুন—হাতীটা একবার মলো, আবার বাঁচলো, কিন্তু বলবেন কি, হাতীর ঐরূপ মরা-বাঁচায় আপনার কি এসে গেল? আপনি কি ঐরূপ শক্তিশাল্য করে বার বার জন্ম-মৃত্যুর হাত থেকে মুক্তি পেয়েছেন? জয়া-ব্যাধি কি আপনাকে ত্যাগ করেছে? না আপনার

গুরুভাবে নিজ গুরুগণের সহিত সম্বন্ধ

অখণ্ড-সচ্চিদানন্দস্বরূপ দর্শন হয়েছে ?' যোগী তখন নির্ঝাক হয়ে
রইল এবং তার চৈতন্য হল।”

চন্দ্র^১ ও গিরিজা এইরূপে ভৈরবী ব্রাহ্মণীর সহায়তায় ঈশ্বরীয়
পথে অনেকদূর অগ্রসর হইলেও সিদ্ধকাম হইতে পারেন নাই।

১ ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দ দ্বিতীয়বার
ইংলণ্ড ও আমেরিকা যাত্রা করেন। উহারই কিছুকাল পরে বেলুড় মঠে
একদিন এক ব্যক্তি সহসা আসিয়া আপনাকে 'চন্দ্র' বলিয়া পরিচয় দেন এবং
প্রায় মাসাবধিকাল তথায় বাস করেন। পূজনীয় স্বামী ব্রহ্মানন্দ তখন সর্বদা
মঠেই থাকিতেন। তাঁহার সহিত ঐ ব্যক্তির গোপনে অনেক কথাবার্তাও
হইতে দেখিয়াছি। শুনিয়াছি তিনি স্বামীজিকে বার বার জিজ্ঞাসা করিতেন
—“আপনি কি এখানে কিছু টের পান? অর্থাৎ, ঠাকুরের জাগ্রত সত্তা কিছু
অনুভব করেন?”—ইত্যাদি।

তিনি বলিতেন, ঠাকুর তাঁহার সম্বন্ধে যাহা কিছু বলিয়াছিলেন তাহার
সমুদয় কথাই সত্য ঘটয়াছে। কেবল মৃত্যুর পূর্বে তাঁহাকে দর্শন দিতে
প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন ঐ কথাটিই সত্য বলিয়া প্রত্যক্ষ করিতে তাঁহার তখনও
বাকি আছে। লোকটি মঠের ঠাকুরঘরে গিয়া প্রতিদিন অনেকক্ষণ অতি
ভক্তির সহিত জপ-ধ্যান করিতেন। ঐ সময় তাঁহার চক্ষু দিয়া প্রেমাশ্রু
পড়িত। ঠাকুরের সম্বন্ধে কেহ কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে ইনি তৎসম্বন্ধে
যাহা জানিতেন তাহা অতি আনন্দের সহিত বলিতেন। ইহাকে অতি শাস্ত
প্রকৃতির লোক বলিয়াই আমাদের বোধ হইয়াছিল। লোকটিকে সর্বদা একস্থানে
নিস্তব্ধভাবে বসিয়া থাকিতে এবং সময়ে সময়ে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া থাকিতে
দেখিয়া এক সময়ে একজন ইহাকে উপহাসচ্ছলে জিজ্ঞাসা করেন—“মহাশয়ের
কি আফিম খাওয়া অভ্যাস আছে?” উহাতে তিনি অতি বিনীতভাবে
বলিয়াছিলেন—“আমি আপনাদের নিকট কি অপরাধে অপরাধী হইয়াছি যে
এরূপ কথা বলিতেছেন?”

ঠাকুরঘরে যাইয়া প্রথম প্রণামকালে তিনি ঠাকুরের শ্রীমূর্তিকে 'দাদা' বলিয়া
সম্বোধন করেন এবং ভাবে-প্রেমে আবিষ্ট হইয়া অজস্র নয়নাশ্রু বর্ষণ করেন।
তাঁহাকে দেখিলে সাধারণ লোকের জায়ই বোধ হইত। গৈরিক বা তিলকাদির
আড়ম্বর ছিল না। পরিধানে সামান্ত একখানি ধুতি ও উড়ানি এবং হাতে
ছাতি ও একটি কাষিসের ব্যাগ মাত্র ছিল। ব্যাগের ভিতর আর একখানি

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

ঠাকুরের জলন্ত দর্শনলাভ করিয়া এবং তাঁহার দিব্যশক্তিবলে অহঙ্কারের মূল ঐ সকল সিদ্ধাইয়ের নাশ হওয়াতেই তাঁহাদের ঐ বিষয়ের চৈতন্য হয় এবং দ্বিগুণ উৎসাহে পুনরায় ঈশ্বরীয় পথে অগ্রসর হইতে থাকেন।

ভৈরবী ব্রাহ্মণী স্বয়ং সাধনে বহুদূর অগ্রসর হইলেও অথণ্ড সচ্চিদানন্দলাভে পূর্ণত্বপ্রাপ্ত যে হন নাই, তাহারও পরিচয়

আমরা বেশ পাইয়া থাকি। বেদান্তের শেষভূমি, 'বামনীর' নির্বিকল্প অবস্থার অধিকারী 'ল্যাংটা' তোতাপুরী যখন ভ্রমণ করিতে করিতে দক্ষিণেশ্বর-কালীবাটীতে প্রথম আগমন করেন, তখন ঠাকুরের ব্রাহ্মণীর সহায়তায় তন্মোক্ত সাধনসমূহে সিদ্ধিলাভ হইয়া

গিয়াছে। তোতাপুরী ঠাকুরকে দেখিয়াই বেদান্ত-পথের অতি উত্তম অধিকারী বলিয়া চিনিতে পারিয়া যখন তাঁহাকে সন্ন্যাস-দীক্ষা প্রদান করিয়া নির্বিকল্প সমাধিসাধনের বিষয় উপদেশ করেন, তখন ব্রাহ্মণী ঠাকুরকে ঐ বিষয় হইতে নিরস্ত করিবার অনেক প্রয়াস পাইয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন, "বাবা, (ব্রাহ্মণী ঠাকুরকে পুত্রজ্ঞানে ঐরূপ সঙ্ঘোষন করিতেন) ওর কাছে বেশী যাওয়া-আসা করো না, বেশী মেশামিশি করো

পরিধেয় ধূতি, গামছা ও বোধ হয় একটি জল খাইবার ঘটি মাত্র ছিল। তিনি বলিয়াছিলেন, তিনি ঐরূপে প্রায়ই তীর্থে তীর্থে পর্যটন করিয়া বেড়ান। স্বামী ব্রহ্মানন্দ ইঁহাকে বিশেষ আদর-সম্মান করিয়া মঠেই চিরকাল থাকিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। ইনিও সন্মত হইয়া বলিয়াছিলেন, "দেশের জমীগুলোর একটা বন্দোবস্ত করিয়া আসিয়া এখানে থাকিব।" কিন্তু তদবধি আর ঐ ব্যক্তি এ পর্য্যন্ত মঠে আসেন নাই। প্রসঙ্গোক্ত চল্ল সম্ভবতঃ তিনিই হইবেন।

গুরুভাবে নিজ গুরুগণের সহিত সম্বন্ধ

না; ওদের সব শুষ্ক পথ। ওর সঙ্গে মিশলে তোমার ঈশ্বরীয় ভাব-প্রেম সব নষ্ট হয়ে যাবে।” ইহাতেই বেশ অনুমিত হয় যে, বিদুষী ব্রাহ্মণী ভগবদ্ভক্তিতে অসামান্য হইলেও একথা জানিতেন না বা স্বপ্নেও ভাবেন নাই, বেদান্তোক্ত যে নির্বিকল্প অবস্থাকে তিনি শুষ্কমার্গ বলিয়া নির্দেশ ও ধারণা করিয়াছিলেন, তাহাই যথার্থ পরাভক্তি-লাভের প্রথম সোপান,—শুদ্ধ-বুদ্ধ আত্মারাম পুরুষেরাই কেবলমাত্র ঈশ্বরকে সকল প্রকার হেতু-শূন্য হইয়া ভক্তি-প্রেম করিতে পারেন এবং ঠাকুর যেমন বলিতেন “শুদ্ধাভক্তি ও শুদ্ধজ্ঞান—দুইই এক পদার্থ।” আমাদের অনুমান, ব্রাহ্মণী একথা বুঝিতেন না এবং বুঝিবেন না বলিয়াই ঠাকুর মস্তক মুণ্ডিত করিয়া গৈরিক-ধারণ ও পুরী স্বামীজির নিকট হইতে সন্ন্যাসধর্মের দীক্ষাগ্রহণপূর্বক নির্বিকল্প সমাধি-সাধনের সময় নিজ গর্ভধারিণী মাতার নিকট যেমন উহা গোপন করিয়াছিলেন, ভৈরবী ব্রাহ্মণীর নিকটেও তেমনি ঐ বিষয় গোপন রাখিয়াছিলেন। শুনিয়াছি, ঠাকুরের বৃদ্ধা মাতা ঐ সময়ে দক্ষিণেশ্বরের উত্তর দিকের নহবৎখানার উপরে থাকিতেন এবং ঠাকুর ঐরূপে বেদান্তসাধনকালে তিন দিন গৃহমধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া সকলের চক্ষুর অস্তুরালে অবস্থান করিয়াছিলেন। কেবল পুরী গোস্বামী মাত্র ঐ সময়ে তাঁহার নিকট মধ্যে মধ্যে গমনাগমন করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, ঠাকুর ব্রাহ্মণীর ঐ কথায় কর্ণপাতও করেন নাই।

ঠাকুরের মুখে যতদূর শুনিয়াছি, তাহাতে ভৈরবী ব্রাহ্মণী তদন্তোক্ত বীরভাবের উপাসিকা ছিলেন বলিয়াই মনে হয়। তদন্তে

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

পশু, বীর ও দিব্য এই তিন ভাবে ঈশ্বরসাধনার পথ নির্দিষ্ট আছে। পশুভাবের সাধকে কাম-ক্রোধাদি পশুভাবের আধিক্য থাকে; সেজন্য তিনি সর্বপ্রকার প্রলোভনের তন্মুক্ত পশু, বস্ত্র হইতে দূরে থাকিবেন এবং বাহ্যিক শৌচাচার বীর ও দিব্যভাব-নির্গম প্রভৃতির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া ভগবানের নামজপ, পুরশ্চরণাদিতে প্রবৃত্ত থাকিবেন। বীরভাবের সাধকে কাম-ক্রোধাদি পশুভাবের অপেক্ষা ঈশ্বরানুরাগ প্রবল থাকে। কাম-কাঞ্চন, রূপ-রসাদির আকর্ষণ তাঁহার ভিতর ঈশ্বরানুরাগকেই প্রবলতর করিয়া দেয়। সেজন্য তিনি কাম-কাঞ্চনাদির প্রলোভনের ভিতর বাস করিয়া উহাদের ঘাত-প্রতিঘাতে অবিচলিত থাকিয়া ঈশ্বরে সমগ্র মন-প্রাণ অর্পণ করিতে চেষ্টা করিবেন। দিব্যভাবের সাধক কেবলমাত্র তিনিই হইতে পারেন, যাহাতে ঈশ্বরানুরাগের প্রবল প্রবাহে কাম-ক্রোধাদি একেবারে চিরকালের মত ভাসিয়া গিয়াছে এবং নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের ন্যায় যাহাতে ক্রমার্জ্জব-দয়া-তোষ-সত্যাদি সদগুণসমূহের অনুষ্ঠান স্বাভাবিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মোটামুটি বলিতে গেলে ঐ তিন ভাব সম্বন্ধে ইহাই বলা যায়। বেদান্তোক্ত উত্তম অধিকারীই তন্মুক্ত দিব্যভাবের ভাবুক; মধ্যম অধিকারীই বীরভাবের এবং অধম অধিকারীই পশুভাবের সাধক।

বীরভাবের সাধকাগ্রণী হইলেও ভৈরবী ব্রাহ্মণী তখনও দিব্যভাবের অধিকারিণী হইতে পারেন নাই। ঠাকুরের জলস্ত দৃষ্টান্ত দর্শন করিয়া এবং তাঁহার সহায়তালাভ করিয়াই ব্রাহ্মণীর ক্রমে দিব্যভাবের অধিকারলাভের বাসনা আসিয়া উপস্থিত হয়।

গুরুভাবে নিজ গুরুগণের সহিত সম্বন্ধ

ব্রাহ্মণী দেখিলেন—গ্রহণের কথা দূরে থাকুক, সিদ্ধি বা কারণের নাম মাত্রেই ঠাকুর জগৎকারণ-ঈশ্বরভাবে বিহ্বল হইয়া পড়েন ;

বীরসাদিকা
'বাম্নী'
দিব্যভাবের
অধিকারিণী
হইতে তখনও
সমর্থ হই নাই

সতী বা নটী কোন স্ত্রীমূর্তি দেখিবামাত্রই তাঁহার মনে শ্রীশ্রীজগদম্বার ফ্লাদিনী ও সন্ধিনী শক্তির কথার উদয় হইয়া তাঁহাতে সন্তানভাবই আনিয়া দেয় এবং কাঞ্চনাদি-ধাতুসংস্পর্শে সূপ্তাবস্থায়ও তাঁহার হস্তাদি অঙ্গ সঙ্কুচিত হইয়া যায়। এ

জলন্ত পাবকের নিকট থাকিয়া কাহার না ঈশ্বরানুরাগ প্রদীপ্ত হইয়া উঠে? কে না এই দুই দিনের বিষয়-বিভবাদের প্রতি বীতরাগ হইয়া ঈশ্বরকেই আপনার হইতে আপনার, চিরকালের আত্মীয় বলিয়া ধারণা না করিয়া থাকিতে পারে? এজন্যই ব্রাহ্মণীর জীবনের অবশিষ্টকাল তীব্র তপস্যায় কাটাঁইবার কথা আমরা শুনিতে পাইয়া থাকি।

ঠাকুর অপর কাহারও সহিত বেশী মেশামিশি করিলে বা অন্য কোন ঈশ্বরভক্ত সাধককে অধিক সম্মান প্রদর্শন করিলে ব্রাহ্মণীর মনে হিংসার উদয় হইত, একথাও আমরা ঠাকুরের

শ্রীমুখে শুনিয়াছি। গ্যাওটোঁ ছেলে বড় হইয়া
ঐ বিষয়ে
প্রমাণ

বাটার অপর কাহাকেও ভালবাসিলে বা আদর-

যত্ন করিলে তাহার ঠাকুরমা বা অন্য কোন-
বৃদ্ধা আত্মীয়ার (যাহার নিকটে সে এতদিন পালিত হইয়া আসিয়াছে) মনে যেরূপ ঈর্ষা, দুঃখ ও কষ্ট উপস্থিত হয়, ব্রাহ্মণীরও ঠাকুরের প্রতি ঐ ভাব যে সেই প্রকারের, ইহা আমরা বেশ বুঝিতে পারি। কিন্তু ব্রাহ্মণীর গ্যায় অত উচ্চদের সাধিকার

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

মনে ঐরূপ হওয়া উচিত ছিল না। যিনি ঠাকুরকে খাইতে, শুইতে, বসিতে, দিবারাত্র চব্বিশঘণ্টা এককাল ধরিয়া সকল অবস্থায় সকল ভাবে দেখিবার অবসর পাইয়াছিলেন, তাঁহার ঐরূপ হওয়া উচিত ছিল না। তাঁহার জানা উচিত ছিল যে, ঠাকুরের ভালবাসা ও শ্রদ্ধাদি অপরের গ্ৰায় 'এই আছে এই নাই' গোছের ছিল না। তাঁহার জানা উচিত ছিল যে, ঠাকুর তাঁহার উপর যে ভক্তি-শ্রদ্ধা একবার অর্পণ করিয়াছিলেন, তাহা চিরকালের মতই অর্পিত হইয়াছিল—তাহাতে আর জোয়ার-ভাঁটা খেলিত না। কিন্তু হায়, মাগিক ভালবাসা ও স্ত্রীলোকের মন, তোমরা সর্বদাই ভালবাসার পাত্রকে চিরকালের মত বাধিয়া নিজস্ব করিয়া রাখিতে চাও। এতটুকু স্বাধীনতা তাহাকে দিতে চাও না। মনে কর, স্বাধীনতা পাইলেই তোমাদের ভালবাসার পাত্র আর তোমাদের থাকিবে না, অপর কাহাকেও তোমাদের অপেক্ষা অধিক ভালবাসিয়া ফেলিবে। তোমরা বুঝ না যে, তোমাদের অন্তরের দুর্বলতাই তোমাদিগকে ঐরূপ করিতে শিখাইয়া দেয়। তোমরা বুঝ না যে, যে ভালবাসা ভালবাসার পাত্রকে স্বাধীনতা দেয় না—যাহা আপনাকে সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়া সে যাহা চাহে তাহাতে আনন্দানুভব করিতে জানে না বা শিখে না, তাহা প্রায়ই স্বল্পকালে বিনষ্ট হইয়া যায়। অতএব যদি যথার্থই কাহাকেও প্রাণের ভালবাসা দিয়া থাক, তবে নিশ্চিত থাকিও, তোমার ভালবাসার পাত্র তোমারই থাকিবে এবং ঐ শুদ্ধ স্বার্থ-সম্পর্কশূণ্য ভালবাসা শুধু তোমাকে নহে, তাহাকেও চরমে ঈশ্বর-দর্শন ও সর্ববন্ধনবিমুক্তি পর্য্যন্ত আনিয়া দিবে।

গুরুভাবে নিজ গুরুগণের সহিত সম্বন্ধ

ব্রাহ্মণী উচ্চদের প্রেমিক সাধিকা হইলেও যে পূর্বোক্ত
কথাটি বুঝিতেন না, বা বুঝিয়াও ধারণা করিতে সমর্থ হন নাই,

ইহা নিতান্ত আশ্চর্যের বিষয় বলিয়া মনে হয়।

ঠাকুরের কৃপায়
ব্রাহ্মণীর নিজ
আধ্যাত্মিক
অভাব-বোধ
ও তপস্যা
করিতে গমন

কিন্তু বাস্তবিকই তাঁহার ঐ ধারণার অভাব ছিল ;

এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেবের গুরুরূপে ভাগ্যক্রমে বৃত

হইয়া ‘তিনি সর্বাপেক্ষা বড়, তাঁহার কথা সকলে

সর্বদা মানিয়া চলুক, না চলিলে তাহাদের কল্যাণ

নাই’—এই প্রকার ভাবসমূহও তাঁহার মনে ধীরে-

ধীরে আসিয়া উপস্থিত হইতেছিল। আমরা শুনিয়াছি, ঠাকুর

শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীকে যে কখন কখন শিক্ষা প্রদান করিতেন,

তাহাতেও তিনি ঈর্ষান্বিতা হইতেন। শুনিয়াছি, শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী

তাঁহার ঐ প্রকার ভাবপ্রকাশে সর্বদা ভীতা, সঙ্কুচিতা হইয়া

থাকিতেন। যাহা হউক, পরিশেষে ঠাকুরের কৃপায় ব্রাহ্মণী

তাঁহার মনের এই দুর্বলতার কথা বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

বুঝিয়াছিলেন, এ অবস্থায় ঠাকুরের নিকট হইতে দূরে থাকিলেই

তবে তিনি তাঁহার এই মনোভাব-জয়ে সমর্থ হইবেন এবং

বুঝিয়াছিলেন যে, ঠাকুরের প্রতি তাঁহার এই প্রকার আকর্ষণ

সোনার শিকলে বন্ধনের গ্রায় হইলেও, উহা পরিত্যাগ করিয়া

স্বীয় অভীষ্ট পথে অগ্রসর হইতে হইবে। আমরা বেশ বুঝিতে

পারি, এজন্যই ব্রাহ্মণী পরিশেষে দক্ষিণেশ্বর ও ঠাকুরের সঙ্গ

পরিত্যাগ করেন এবং ‘রম্ভা সাধু ও বহুতা জল কখন মলিন হয়

না’^১ ভাবিয়া অসঙ্গ হইয়া তীর্থে তীর্থে পর্যটন ও তপস্যায়

১. সংসারবিরাগী সাধুদিগের। ভিতর প্রচলিত একটি উক্তি। ‘রম্ভা’—অর্থাৎ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

কালান্তিপাত করিয়াছিলেন। ঠাকুরের গুরুভাবসহায়েই যে ব্রাহ্মণীর এইপ্রকার চৈতন্যের উদয় হয়, ইহা আর বলিতে হইবে না।

ভোতাপুরী লম্বা-চওড়া সুদীর্ঘ পুরুষ ছিলেন। চল্লিশ বৎসর ধ্যান-ধারণা এবং অসঙ্গভাবে বাস করিবার ফলে তিনি নির্বিবকল্প

ভোতাপুরী
গোবামীর
কথা

সমাধিতে মন স্থির, বৃত্তিমাত্রহীন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তত্রাপি তিনি নিত্য ধ্যানানুষ্ঠান এবং সমাধিতে অনেককাল কাটাইতেন। সর্বদা

বালকের ন্যায় উলঙ্গ থাকিতেন বলিয়া ঠাকুর তাঁহাকে 'ল্যাংটা' নামে নির্দেশ করিতেন। বিশেষতঃ আবার গুরুর নাম সর্বদা গ্রহণ করিতে নাই, বা নাম ধরিয়া তাঁহাকে ডাকিতে নাই বলিয়াই বোধ হয় ঐরূপ করিতেন। ঠাকুর বলিতেন, 'ল্যাংটা' কখন ঘরের ভিতর থাকিতেন না এবং নাগাসম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন বলিয়া সর্বদা অগ্নিসেবা করিতেন। নাগা-সাধুরা অগ্নিকে মহা পবিত্রভাবে দর্শন করে এবং সেজন্য যেখানেই যখন থাকুক না কেন, কাষ্ঠাহরণ করিয়া নিকটে অগ্নি জ্বালাইয়া রাখে। ঐ অগ্নি সচরাচর 'ধুনি' নামে অভিহিত হয়। নাগা সাধু ধুনিকে সকাল সন্ধ্যা আরতি করিয়া থাকে এবং ভিক্ষালব্ধ আহাৰ্য্য-সমুদয় প্রথমে ধুনীরূপী অগ্নিকে নিবেদন করিয়া তবে স্বয়ং গ্রহণ করে। দক্ষিণেশ্বরে অবস্থানকালে 'ল্যাংটা' সেজন্য নিরন্তর যিনি একস্থানে না থাকিয়া ভ্রমণ করিয়া বেড়ান, এই প্রকার সাধুতে এবং যে জলে প্রবাহ বা নিরন্তর শ্রোত বহিতেছে, এইরূপ জলে কখনও মলিনতা দাঁড়াইতে পারে না। নিত্যপর্যটনশীল সাধুর মন কখনও কোন বস্তু বা ব্যক্তিতে আসক্ত হয় না, ইহাই অর্থ।

গুরুভাবে নিজ গুরুগণের সহিত সম্বন্ধ

পঞ্চবটার বৃক্ষতলেই আসন করিয়া অবস্থান করিতেন এবং পার্শ্বে ধুনি জ্বালাইয়া রাখিতেন। রৌদ্র হটুক, বর্ষা হটুক 'ল্যাংটার' ধুনি সমভাবেই জলিত। আহার বল, শয়ন বল 'ল্যাংটা' ঐ ধুনির ধারেই করিতেন। আর যখন গভীর নিশীথে সমগ্র বাহুজগৎ বিরামদায়িনী নিদ্রার ক্রোড়ে সকল চিন্তা ভুলিয়া মাতৃ-ক্রোড়ে শিশুর গায় সুখশয়ন লাভ করিত, 'ল্যাংটা' তখন উঠিয়া ধুনি অধিকতর উজ্জ্বল করিয়া অচল অটল সুমেরুবৎ আসনে বসিয়া নিবাত-নিষ্কম্প প্রদীপের গায় স্থির মনকে সমাধিমগ্ন করিতেন। দিনের বেলায়ও 'ল্যাংটা' অনেক সময় ধ্যান করিতেন, কিন্তু লোকে না জানিতে পারে এমন ভাবে করিতেন। মেজগ্ন পরিধেয় চাদরে আপাদমস্তক আবৃত করিয়া ধুনির ধারে শবের গায় লম্বা হইয়া 'ল্যাংটা'কে শয়ন করিয়া থাকিতে অনেক সময় দেখা যাইত। লোকে মনে করিত, 'ল্যাংটা' নিদ্রা যাইতেছেন।

'ল্যাংটা' নিকটে একটি জলপাত্র বা 'লোটা', একটি সুদীর্ঘ চিম্টা এবং আসন করিয়া বসিবার জগ্ন একখণ্ড চর্মমাত্র রাখিতেন এবং একখানি মোটা চাদরে সর্বদা স্বীয় ঠাকুর ও পুরী গোশ্বামীর পরম্পর ভাব-আদান-প্রদানের কথা 'ল্যাংটা' নিত্য মাজিয়া ঝকঝকে রাখিতেন। 'ল্যাংটা'র ঐরূপ নিত্য ধ্যানানুষ্ঠান দেখিয়া ঠাকুর একদিন তাঁহাকে জিজ্ঞাসাই করিয়া বসিলেন,

“তোমার ত ব্রহ্মলাভ হয়েছে, সিদ্ধ হয়েছে, তবে কেন আবার নিত্য ধ্যানাভ্যাস কর ?” 'ল্যাংটা' ইহাতে ধীরভাবে ঠাকুরের

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

দিকে চাহিয়া অনুলিনির্দেশ করিয়া লোটাটি দেখাইয়া বলিলেন, “কেমন উজ্জ্বল দেখ্ছ? আর যদি নিত্য না মাজি?—মলিন হয়ে যাবে, না? মনও সেইরূপ জানবে। ধ্যানাভ্যাস করে মনকেও ঐরূপে নিত্য না মেজে-ঘসে রাখলে মলিন হয়ে পড়ে।” তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিসম্পন্ন ঠাকুর ‘ল্যাংটা’ গুরুর কথা মানিয়া লইয়া বলিলেন, “কিন্তু যদি সোনার লোটা হয়? তা হলে তো আর নিত্য না মাজলেও ময়লা ধরে না।” ‘ল্যাংটা’ হাসিয়া স্বীকার করিলেন, “হ্যাঁ, তা বটে।” নিত্য ধ্যানাভ্যাসের উপকারিতা সম্বন্ধে ‘ল্যাংটা’র কথাগুলি ঠাকুরের চিরকাল মনে ছিল এবং বহুবার তিনি উহা ‘ল্যাংটা’র নাম করিয়া আমাদের নিকট বলিয়াছিলেন। আর আমাদের ধারণা—ঠাকুরের ‘সোনার লোটার ময়লা ধরে না’ কথাটি ‘ল্যাংটা’র মনেও চিরাক্ষিত হইয়া গিয়াছিল। ‘ল্যাংটা’ বুঝিয়াছিল, ঠাকুরের মন বাস্তবিকই সোনার লোটার মত উজ্জ্বল। গুরু-শিষ্যে এইরূপ আদান-প্রদান ইহাদের ভিতরে প্রথমাবধিই চলিত।

বেদান্তশাস্ত্রে আছে—ব্রহ্মজ্ঞান হইলেই মানুষ একেবারে ভয়শূন্য হয়; সম্পূর্ণ অভীঃ হইবার উহাই একমাত্র পথ। বাস্তবিক কথা।

যিনি জানিতে পারেন যে, তিনি স্বয়ং নিত্য-শুদ্ধ-ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের নির্ভীকতা ও বন্ধনবিমুক্তি সম্বন্ধে শান্ত
বুদ্ধ-স্বভাব, অথও সচ্চিদানন্দস্বরূপ সর্বব্যাপী অজরামর আত্মা, তাঁহার মনে ভয় কিসে, কাহারই বা দ্বারা হইবে? যিনি এক ভিন্ন দ্বিতীয় বস্তু বা ব্যক্তি জগতে নাই—ইহা সত্য সত্যই দেখিতে পান, সর্বদা প্রাণে প্রাণে অনুভব করেন, তাঁহার ভয় কি করিয়া, কোথায়ই বা

গুরুভাবে নিজ গুরুগণের সহিত সম্বন্ধ

হইবে? খাইতে, শুইতে, বসিতে, নিদ্রায়, জাগরণে, সর্বাবস্থায়, সকল সময়ে তিনি দেখেন—তিনি অখণ্ড সচ্চিদানন্দস্বরূপ; সকলের ভিতর, সর্বত্র, সর্বদা তিনি পূর্ণ হইয়া আছেন; তাঁহার আহার নাই, বিহার নাই, নিদ্রা নাই, জাগরণ নাই, অভাব নাই, আলস্য নাই, শোক নাই, হর্ষ নাই, জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, অতীত নাই, ভবিষ্যৎ নাই—মানব পঞ্চেন্দ্রিয় ও মন-বুদ্ধি সহায়ে যাহা কিছু দেখে, শুনে, চিন্তা বা কল্পনা করে, তাহার কিছুই নাই। এই প্রকার অনুভবকেই শাস্ত্র ‘নেতি নেতি’র বিরামাবস্থা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন এবং ইহারই পরে পূর্ণস্বরূপ আত্মার অবস্থান ও প্রত্যক্ষদর্শন বলিয়াছেন। এই আত্মদর্শন সদা-সর্বক্ষণ হওয়ার নামই ‘জ্ঞানে অবস্থান’ এবং এই প্রকার জ্ঞানে অবস্থান হইলেই সর্ববন্ধনবিমুক্তি আসিয়া উপস্থিত হয়। ঠাকুর বলিতেন—এই প্রকার জ্ঞানে অবস্থান সম্পূর্ণরূপে হইলে জীবের শরীর একুশ দিন মাত্র থাকিয়া শুষ্ক পত্রের ন্যায় পড়িয়া যায় বা নষ্ট হইয়া যায় এবং আর সে এ সংসারের ভিতর অহং-জ্ঞান লইয়া ফিরিয়া আসে না। জীবমুক্ত পুরুষদিগের মধ্যে মধ্যে স্বল্পকালের নিমিত্ত এই জ্ঞানে অবস্থান ও আত্মার দর্শন হইতে হইতে পরিশেষে পূর্ণ অবস্থান ও দর্শন আসিয়া উপস্থিত হয়। আর নিত্যমুক্ত ঈশ্বরকোটি পুরুষ, যাহারা কোন বিশেষ মতের প্রতিষ্ঠা করিয়া বহুজনের কল্যাণসাধন করিতেই জগতে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহারাও বাল্যাবধি মধ্যে মধ্যে স্বল্পকালের জন্য এই জ্ঞানে অবস্থান করেন এবং যে কর্মের জন্য আসিয়াছেন, সেই কর্ম শেষ হইলে পরিশেষে সম্পূর্ণরূপে জ্ঞানস্বরূপে

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

অবস্থান করেন। আবার, যাঁহাদের অলৌকিক আধ্যাত্মিক শক্তি দেখিয়া জগৎ এ পর্যন্ত ধারণা করিতে পারে নাই—তাঁহারা ঈশ্বর স্বয়ং মানব-কল্যাণের নিমিত্ত মূর্তিপরিগ্রহ করিয়া আসিয়াছেন, অথবা অত্যদ্ভুত শক্তিসম্পন্ন মানব; সেই অবতার পুরুষেরা এই পূর্ণ জ্ঞানাবস্থায় বাল্যাবধি ইচ্ছামাত্র উঠিতে, যতকাল ইচ্ছা থাকিতে এবং পুনরায় ইচ্ছামত লোককল্যাণের নিমিত্ত জন্ম-জরা-শোক-হর্ষাদির মিলনভূমি সংসারে আসিতে পারেন। ঠাকুরের শিক্ষাগুরু শ্রীমৎ তোতাপুরী গোস্বামী চল্লিশ বৎসর কঠোর সাধনার ফলে পূর্বোক্ত জীবমুক্তাবস্থা লাভ করিয়াছিলেন এবং সেজন্য তাঁহার আহার বিহার, শয়ন উপবেশন প্রভৃতি সকল কার্যই মানব-

সাধারণের ন্যায় ছিল না। নিত্যমুক্ত বায়ুর ন্যায়

তোতাপুরীর
উচ্চ অবস্থা

তিনি বাধাশূন্য হইয়া যত্র তত্র বিচরণ করিয়া

বেড়াইতেন; বায়ুর ন্যায়ই তাঁহাকে সংসারের

দোষ-গুণ কখনও স্পর্শ করিতে পারিত না এবং বায়ুর ন্যায়ই তিনি কখন একস্থানে আবদ্ধ হইয়া থাকিতে পারিতেন না। কারণ ঠাকুরের নিকট শুনিয়াছি, তোতা তিন দিনের অধিক কোথাও অবস্থান করিতে পারিতেন না। ঠাকুরের অদ্ভুতাকর্ষণে কিন্তু তোতা দক্ষিণেশ্বরে একাদিক্রমে এগার মাস কাল অবস্থান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ঠাকুরের কি অদ্ভুত মোহিনী শক্তিই ছিল!

তোতার নির্ভীকতা সম্বন্ধে ঠাকুর অনেক কথা আমাদের বলিয়াছিলেন। তন্মধ্যে একটি ভূতুড়ে ঘটনাও বলেন; তাহা এই—গভীর নিশীথে তোতা একদিন ধূনি উজ্জল করিয়া ধ্যানে

গুরুভাবে নিজ গুরুগণের সহিত সম্বন্ধ

বসিবার উপক্রম করিতেছেন ; জগৎ নীরব, নিস্তব্ধ ; বিলম্বী ও মধ্যে মধ্যে মন্দির-চূড়ায় অবস্থিত পেচকের গস্তীর নিঃশ্বন ভিন্ন আর কোন

শব্দই শ্রুতিগোচর হইতেছে না। বায়ুরও সঞ্চারণ
তোতার
নির্ভীকতা—
শৈরব-দর্শনে
শব্দই শ্রুতিগোচর হইতেছে না। বায়ুরও সঞ্চারণ
নাই। সহসা পঞ্চবটীর বৃক্ষশাখাসকল আলোড়িত
হইতে লাগিল এবং দীর্ঘাকার মানবাকৃতি

এক পুরুষ বৃক্ষের উপর হইতে নিম্নে নামিয়া
তোতার দিকে স্থির দৃষ্টিতে দেখিতে দেখিতে ধীর পদবিক্ষেপে পুরী
গোস্থামীর ধূনির পার্শ্বে আসিয়া বসিলেন। ‘ল্যাংটা’ নিজেই
শ্রায় উলঙ্ঘ্য সেই পুরুষপ্রবরকে দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা
করিলেন, ‘কে তুমি?’ পুরুষ উত্তর করিলেন, ‘আমি দেবযোনি,
ভৈরব ; এই দেবস্থানরক্ষার নিমিত্ত বৃক্ষোপরি অবস্থান করি।’
‘ল্যাংটা’ কিছুমাত্র ভীত না হইয়া বলিলেন, ‘উত্তম কথা ; তুমিও
যা, আমিও তাই—তুমিও ব্রহ্মের এক প্রকাশ, আমিও তাই ;
এস, বস, ধ্যান কর।’ পুরুষ হাসিয়া বায়ুতে যেন মিলাইয়া গেলেন।
‘ল্যাংটা’ও ঐ ঘটনায় কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া ধ্যানে মনো-
নিবেশ করিলেন। পরদিন প্রাতে ‘ল্যাংটা’ ঠাকুরকে ঐ ঘটনা
বলেন। ঠাকুরও শুনিয়া বলিলেন, “হাঁ, উনি ঐখানে থাকেন
বটে ; আমিও উহার দর্শন অনেকবার পেয়েছি। কখন কখন
কোন ভবিষ্যৎ ঘটনার বিষয়ও উনি আমাকে বলে দিয়েছেন।
কোম্পানি বারুদখানার (Powder Magazine) জন্ত পঞ্চবটীর
সমস্ত জমিটি একবার নেবার চেষ্টা করে। আমার তাই শুনে
বিষম ভাবনা হয়েছিল ; সংসারের কোলাহল থেকে দূরে নির্জন
স্থানটিতে বসে মাকে ডাকি, তা আর হবে না—সেই জন্ত।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

মথুরা তো রাণী রাসমাণির তরফ থেকে কোম্পানির সঙ্গে খুব মামলা লাগিয়ে দিলে, যাতে কোম্পানি জমিটি না নেয়। সেই সময়ে একদিন ঐ ভৈরব গাছে বসে আছেন দেখতে পাই; আমাকে সঙ্কেতে বলেছিলেন, ‘কোম্পানি জায়গা নিতে পারবে না, মামলায় হেরে যাবে।’ বাস্তবিকও তাহাই হ’ল।”

‘ল্যাংটা’র জন্মস্থান পশ্চিমে কোন্ স্থানে ছিল, ঠাকুরের নিকট সে সম্বন্ধে আমরা কিছু শুনি নাই। ঠাকুরও হয়ত ঐ বিষয়ে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিবার কোন আবশ্যকতা বিবেচনা করেন নাই। বিশেষতঃ আবার পূর্ব নাম-ধাম-তোতাপুরীর গুরুর কথা

গোত্রাদি বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলে সন্ন্যাসীরা উহার উল্লেখ করেন না; বলেন, ‘সন্ন্যাসীকে ঐ সকল

বিষয়ে প্রশ্ন করা এবং সন্ন্যাসীর তদ্বিষয়ে উত্তর দেওয়া—উভয়ই শাস্ত্রনিষিদ্ধ!’ ঠাকুর হয় তো সেইজন্যই ঐ প্রশ্ন ‘ল্যাংটা’কে কখন করেন নাই। তবে বেলুড় মঠস্থ ঠাকুরের সন্ন্যাসী শিষ্যগণ ঠাকুরের দেহান্তের পর ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে পরিভ্রমণকালে প্রাচীন সন্ন্যাসী-পীরমহংসগণের নিকট জিজ্ঞাসায় জানিতে পারিয়াছিলেন যে, সম্ভবতঃ পুরী গোস্বামী পাঞ্জাব প্রদেশের নিকটবর্তী কোন স্থানের লোক ছিলেন। তাঁহার গুরুর স্থান বা গুরুর আবাস কুরুক্ষেত্রের নিকট লুধিয়ানা নামক স্থানে ছিল। তাঁহার গুরুও একজন বিখ্যাত যোগী পুরুষ ছিলেন এবং ঐ স্থানে একটি মঠ স্থাপন করিয়াছিলেন। উক্ত মঠটি তিনি নিজে স্থাপন করেন বা তাঁহার গুরুর গুরু কেহ স্থাপন করেন, সে বিষয়ে ঠিক জানা যায় নাই। তবে শ্রীমং

গুরুভাবে নিজ গুরুগণের সহিত সম্বন্ধ

তোতাপুরীর গুরু যে ঐ মঠের মোহন্ত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার সম্মানে এখনও যে ঐ স্থানে বৎসর বৎসর চতুর্দশগ্রামবাসীদের একটি মেলা হইয়া থাকে, তদ্বিষয়ে প্রাচীন সাধুগণ তাঁহাদের বলিয়াছিলেন। তিনি তামাক খাইতেন বলিয়া গ্রামবাসীরা মেলার সময় তামাক আনিয়া তাঁহার 'সমাজে' এখনও উপহার দিয়া থাকে। গুরুর দেহান্তে শ্রীমৎ তোতাপুরীই ঐ মঠের মোহন্তপদে প্রতিষ্ঠিত হন।

শ্রীমৎ তোতাপুরীর নিজের কথাতেও মনে হয়, তিনি সন্ন্যাসিমণ্ডলীর অধীশ্বর নিজ গুরুর নিকট বাল্যেই বেদান্ত-শাস্ত্রোপদেশ পাইয়াছিলেন এবং বহুকাল তাঁহার অধীনে বাস করিয়া স্বাধ্যায়রত থাকেন ও সাধন-রহস্য অবগত হন। কারণ ঠাকুরকে

তিনি বলিয়াছিলেন, তাঁহাদের মণ্ডলীতে সাত শত

নিজ গুরুর মঠ
ও মণ্ডলীসম্বন্ধে
তোতাপুরীর
কথা

সন্ন্যাসী বাস করিয়া গুরুর আদেশমত বেদান্তনিহিত
সত্যসকল জীবনে অনুভবের জগু ধ্যানাদি
নিত্যানুষ্ঠান করিত। উক্ত মণ্ডলীতে ধ্যান-

শিক্ষাদিমানও যে বড় সুন্দর প্রণালীতে অনুষ্ঠিত হইত, এ
বিষয়েও 'ল্যাংটা' ঠাকুরকে কিছু কিছু আভাস দিয়াছিলেন।

ঠাকুর ঐ কথা অনেক সময়ে আমাদের নিকট গল্প বা উপদেশ-
চ্ছলে বলিতেন। বলিতেন, "ল্যাংটা বলত, তাদের দলে সাতশ
ল্যাংটা ছিল। যারা প্রথম ধ্যান শিখতে আরম্ভ করচে, তাঁদের
গদির উপর বসিয়ে ধ্যান করাত। কেননা কঠিন আসনে বসে
ধ্যান করলে পা টন্ টন্ করবে; আর ঐ টন্টনানিতে অনভ্যস্ত
মন ঈশ্বরে না গিয়ে শরীরের দিকে এসে পড়বে। তারপর তার

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

যত ধ্যান জমত ততই তাকে কঠিন হতে কঠিনতর আসনে বসে ধ্যান করতে দেওয়া হ'ত। শেষ কালে শুধু চর্ম্মাসন ও খালি মাটিতে পর্য্যস্ত বসে তাকে ধ্যান করতে হ'ত। আহাৰাদি সকল বিষয়েও ঐরূপ নিয়মে অভ্যাস করাত। পরিধানেও শিষ্যদের সকলকে ক্রমে ক্রমে উলঙ্গ হয়ে থাকতে অভ্যাস করান হত। লজ্জা, ঘৃণা, ভয়, জাত, কুল, শীল, মান ইত্যাদি অষ্টপাশে মানুষ জন্মাবধি বন্ধ আছে কি না? এক এক করে সেগুলোকে সব ত্যাগ করতে শিক্ষা দেওয়া হত। তারপর ধ্যানাদিতে মন পাকা হয়ে বসলে তাকে প্রথম অপর সাধুদের সঙ্গে, তারপর একা একা, তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়িয়ে আসতে হ'ত। ল্যাংটারদের এই রকম সব নিয়ম ছিল।” ঐ মণ্ডলীর মোহন্ত-নির্বাচনের প্রথাও ঠাকুর পুরীজীর নিকট শুনিয়াছিলেন। প্রসঙ্গক্রমে ঐ সম্বন্ধে আমাদের একদিন এইরূপ বলেন, “ল্যাংটারদের ভেতর যার ঠিক ঠিক পরমহংস অবস্থা হয়েছে দেখতো, গদি খালি হলে তাকেই সকলে মিলে মোহন্ত করে ঐ গদিতে বসাত। তা না হলে টাকা, মান, ক্ষমতা হাতে পড়ে ঠিক থাকতে পারবে কি করে? মাথা বিগড়ে যাবে যে? সে জন্ম যার মন থেকে কাঞ্চন ঠিক ঠিক ত্যাগ হয়েছে দেখতো, তাকেই গদিতে বসিয়ে টাকা-কড়ির ভার দিত। কেননা, সে-ই ঐ টাকা দেবতা ও সাধুদের সেবায় ঠিক ঠিক খরচ করতে পারবে।”

পুরী গোস্বামীর ঐসকল কথায় বেশ বুঝা যায়, তিনি বাল্যাবধি সংসারের মায়া-মোহ-ঈর্ষা-দেহাদি হইতে দূরে যেন এক স্বর্গীয় রাজ্যে গুরুর স্নেহে লালিত-পালিত হইয়াছিলেন। উত্তর-

গুরুভাবে নিজ গুরুগণের সহিত সম্বন্ধ

পশ্চিমাঞ্চলে প্রথা আছে যে, যে দম্পতির যথাসময়ে সন্তান জন্মে

তোতাপুরীর
পূর্বপরিচয়
না, তাঁহারা দেবস্থানে কামনা করেন যে, তাঁহাদের
প্রণয়ের প্রথম ফলস্বরূপ সন্তানকে সন্ন্যাসী করিয়া
ঈশ্বরের সেবায় অর্পণ করিবেন এবং কার্যেও
ঐরূপ অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। পুরী গোস্বামী কি সেইরূপে
গুরুর নিকট অর্পিত হইয়াছিলেন? কে বলিবে! তবে তাঁহার
পূর্বাশ্রমের পিতা-মাতা, ভ্রাতা-ভগ্নী প্রভৃতির কোন কথা ঠাকুরের
নিকট কখনও উল্লেখ না করাতে ঐরূপই অনুমিত হয়।

পূর্বকৃত পুণ্যসংস্কারের ফলে গোস্বামীজীর মনটিও তেমনি
সরল, বিশ্বাসী ও শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিল। আচার্য্য শঙ্কর তৎকৃত 'বিবেক-

তোতাপুরীর
মন
চূড়ামণি' গ্রন্থের প্রারম্ভেই বলিয়াছেন, 'জগতে
মনুষ্যত্ব, ঈশ্বরলাভেচ্ছা এবং সদগুরু-আশ্রয়—

এই তিন বস্তু একত্রে লাভ করা বড়ই দুর্লভ ;
ভগবানের অনুগ্রহ ব্যতীত হয় না।' পুরী গোস্বামী শুধু যে ঐ
তিন পদার্থ ভাগ্যক্রমে একসঙ্গে পাইয়াছিলেন তাহা নহে, কিন্তু
এই সকলের যথাযথ ব্যবহারের সুযোগ পাইয়া মানবজীবনের
চরমোদ্দেশ্য মুক্তিলাভেও সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার গুরু তাঁহাকে
যেমন যেমন উপদেশ করিতেন, তাঁহার মনও ঠিক ঠিক উহা
ধারণা করিয়া সর্বদা কার্যে পরিণত করিত। মনের জুয়াচুরি
ভণ্ডামিতে তাঁহাকে কখনও বেশী ভুগিতে হইয়াছিল বলিয়া বোধ
হয় না। বৈষ্ণবদিগের ভিতর একটি কথা আছে—

“গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণব তিনের দয়া হ’ল।

একের দয়া বিনে জীব ছারেখারে গেল ॥”

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

—‘একের’ অর্থাৎ নিজ মনের দয়া না হওয়াতে জীব বিনষ্ট হইল। পুরী গোস্বামীকে এরূপ পাজি মনের হাতে পড়িয়া কখনও ভুগিতে হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না। তাঁহার সরল মন সরলভাবে ঈশ্বরে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া গুরুনির্দিষ্ট গন্তব্য পথে ধীরপদে অগ্রসর হইয়াছিল, যাইতে যাইতে একবারও পশ্চাতে সংসারের পাপ-প্রলোভনাদির দিকে অতৃপ্ত লালসার কটাক্ষপাত করে নাই। কাজেই গোসাইজী নিজ পুরুষকার, উদ্যম, আত্মনির্ভরতা ও প্রত্যয়েই সর্বেসর্বা বলিয়া জানিয়াছিলেন। মন বাঁকিয়া দাঁড়াইলে ঐ পুরুষকার যে প্রবল প্রবাহের মুখে তৃণশুষ্কের ন্যায় কোথায় ভাসিয়া যায়, আত্মনির্ভরতা ও আত্মপ্রত্যয়ের স্থলে যে আপনার ক্ষমতার উপর ঘোর অশ্বাস আসিয়া জীবকে সামান্য কীটাপেক্ষা দুর্বল করিয়া তুলে—একথা গোসাইজী জানিতেন না। ঈশ্বররূপায় বহির্জগতের সহস্র বিষয়ের অমুকুলতা না পাইলে জীবের শত-সহস্র উদ্যমও যে আশামুরূপ ফল প্রসব না করিয়া বিপরীত ফলই প্রসব করিতে থাকে এবং তাহাকে বন্ধনের উপর আরও ঘোরতর বন্ধন আনিয়া দেয়, পুরী গোস্বামী নিজ জীবনের দিকে চাহিয়া একথা কখন স্বপ্নেও ভাবেন নাই। কেনই বা ভাবিবেন? তিনি যখনই যাহা ধরিয়াছেন—আজন্ম তখনই তাহা করিতে পারিয়াছেন; যখনই যাহা মানবের কল্যাণকর বলিয়া বুঝিয়াছেন তখনই তাহা নিজ জীবনে কার্যে পরিণত করিতে পারিয়াছেন। কাজেই ‘মন বুঝেছে, প্রাণ বুঝে না’ এমন একটা অবস্থা যে মানবের হইতে পারে, ‘মন মুখ এক’ করিতে না পারিয়া সে যে

গুরুভাবে নিজ গুরুগণের সহিত সম্বন্ধ

শত বৃশ্চিকের দংশনজ্বালা ভিতরে নিরন্তর অনুভব করিতে পারে, মনের ভিতর সহস্রটা কর্তা এবং শরীরের প্রত্যেক ইন্দ্রিয়টা স্ব স্ব প্রধান হইয়া কেহ কাহারও কথা না মানিয়া চলিয়া তাহাকে যে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়া হতাশার অন্ধতামিস্রে ফেলিয়া ঘোর যন্ত্রণা দিতে পারে—একথা গৌসাইজী কখনও কল্পনায়ও আনিয়াছিলেন কি না সন্দেহ। অথবা আনিতে পারিলেও শুনে শিখা, দেখে শিখা ও ঠেকে শিখার ভিতর অনেক তফাৎ। কাজেই পুরী গোস্বামীর মনে অবস্থিত মানবের ঐরূপ অবস্থার ছবিতে এবং যে ঐ প্রকারে বাস্তবিক নিরন্তর ভুগিতেছে, তাহার মনের ছবিতে ঐরূপ আকাশ-পাতাল প্রভেদ ছিল। পুরী গোস্বামী সেজন্য পরমেশ-শক্তি অনাঢ়বিদ্যা মায়ার দুরন্ত প্রভাববিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞই ছিলেন এবং সেজন্য দুর্বল মানব-মনের কার্যকলাপের প্রতি তিনি কঠোর ঘেষ-দৃষ্টি ভিন্ন কখন করুণার সহিত দেখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন কিনা সন্দেহ। ঠাকুরের গুরুভাবে সম্পর্কে আসিয়াই তাহার এই অভাব অপনীত হয় এবং তিনি পরিশেষে মায়ার শক্তি মানিয়া ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তি অভেদ জানিয়া ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে অবনত মস্তকে দক্ষিণেশ্বর-কালীবাটী হইতে বিদায়গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। আমরা এক্ষণে ঐ বিষয়েই বলিতে আরম্ভ করিব।

ব্রাহ্মণী ভৈরবী ঠাকুরকে যেমন বলিয়াছিলেন, আকুমার ব্রহ্মচারী কঠোর যতি তোতার বাস্তবিকই ভগদুক্তিমার্গকে একটা কিস্তুকিমাকার পথ বলিয়া ধারণা ছিল! ভক্তি-ভালবাসা

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

যে মানবকে ভালবাসার পাত্রের জগৎ সংসারের সকল বিষয়, এমন কি আত্মতৃপ্তি পর্য্যন্ত ধীরে ধীরে ত্যাগ করিতে শিখাইয়া চরমে ঈশ্বর-দর্শন আনিয়া দেয়, যথার্থ ভক্তসাধক

তোতাপুরীর
ভক্তিমাৰ্গে
অনভিজ্ঞতা

যে ভক্তির চরম পরিণতিতে শুদ্ধাষ্টেতজ্ঞানেরও
অধিকারী হইয়া থাকেন এবং সেজগৎ তাঁহারও
সাধনসহায় জপ-কীর্তন-ভজনাদি যে উপেক্ষার
বিষয় নহে—এ কথা তোতা বুঝিতেন না। না বুঝিয়া গৌসাইজী
ভক্তের ভাববিহ্বল চেষ্টাদিকে সময়ে সময়ে বিদ্রুপ করিতেও
ছাড়িতেন না। অবশ্য এ কথায় পাঠক না বুঝিয়া বসেন যে,
পুরী গৌস্বামী এক প্রকার নাস্তিক গোছের ছিলেন বা তাঁহার
ঈশ্বরানুরাগ ছিল না। শমদমাদিসম্পত্তিসহায় শাস্ত্রপ্রকৃতি
গৌসাইজী স্বয়ং ভক্তির শাস্ত্রভাবের পথিক ছিলেন এবং অপরে
ঐ ভাবের ঈশ্বরভক্তিই বুঝিতে পারিতেন। কিন্তু কল্পনাসহায়ে
জগৎকর্তা মহান্ ঈশ্বরকে নিজ সখা, পুত্র, স্ত্রী বা স্বামি-ভাবে
ভজনা করিয়াও সাধক যে তাঁহার দিকে দ্রুতপদে অগ্রসর হইতে
পারে, একথা পুরীজীর মাথায় কখন ঢোকে নাই। ঐরূপ
ভক্তের নিজ ভাবপ্রণোদিত ঈশ্বরের প্রতি আবদার-অনুরোধ,
তাঁহাকে লইয়া বিরহ, ব্যাকুলতা, অভিমান, অহঙ্কার এবং ভাবের
প্রবল উচ্ছ্বাসে উদ্দাম হাস্য-ক্রন্দন-নৃত্যাদি চেষ্টাকে তিনি
পাগলের খেয়াল বা প্রলাপের মধ্যই গণ্য করিতেন এবং
উহাতে যে ঐরূপ অধিকারী সাধকের আশু অভীষ্ট ফল-লাভ
হইতে পারে, একথা তিনি কল্পনায়ও আনিতে পারিতেন না।
কাজেই ব্রহ্মশক্তি জগদম্বিকাকে হৃদয়ের সহিত ভক্তি করা এবং

গুরুভাবে নিজ গুরুগণের সহিত সম্বন্ধ

ভক্তিপথের ঐরূপ চেষ্টাদির কথা লইয়া পুরীজীর সহিত ঠাকুরের অনেক সময় ঠোকাঠুকি লাগিয়া যাইত।

ঠাকুর বাল্যাবধি সকাল-সন্ধ্যায় করতালি দিতে দিতে এবং সময়ে সময়ে ভাবে নৃত্য করিতে করিতে ‘হরিবোল হরিবোল’,

ঐ বিষয়ে
প্রমাণ—
‘কেঁও রোটা
ঠোকতে হো’
‘হরি গুরু, গুরু হরি’, ‘হরি প্রাণ হে, গোবিন্দ মম
জীবন’, ‘মন কৃষ্ণ—প্রাণ কৃষ্ণ—জ্ঞান কৃষ্ণ—ধ্যান
কৃষ্ণ—বোধ কৃষ্ণ—বুদ্ধি কৃষ্ণ’, ‘জগৎ তুমি—জগৎ
তোমাতে’, ‘আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী’ ইত্যাদি

উচ্চৈঃস্বরে বার বার কিছুকাল বলিতেন। বেদান্তজ্ঞানে অদ্বৈতভাবে নির্বিকল্প সমাধিলাভের পরও নিত্য ঐরূপ করিতেন। এক-দিন পঞ্চবটীতে পুরীজীর নিকট অপরাহ্নে বসিয়া নানা ধর্মকথা-প্রসঙ্গে সন্ধ্যা হইল। সন্ধ্যা সমাগত দেখিয়া ঠাকুর বাক্যলাপ বন্ধ করিয়া করতালি দিয়া ঐরূপে ভগবানের স্মরণ-মনন করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে ঐরূপ করিতে দেখিয়া পুরীজী অবাক হইয়া ভাবিতে লাগিলেন—যিনি বেদান্তপথের এত উত্তম অধিকারী, যিনি তিন দিনেই নির্বিকল্প সমাধি লাভ করিলেন, তাঁহার আবার হীনাধিকারীর মত এ সব অশুষ্ঠান কেন? প্রকাশ্যে বিদ্রূপ করিয়া বলিয়াও ফেলিলেন, ‘আরে, কেঁও রোটা ঠোকতে হো?’—অর্থাৎ, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে স্ত্রীপুরুষে অনেক সময়ে চাকি-বেলুন প্রভৃতির সাহায্য না লইয়া ময়দার নেচি হাতে লইয়া পটাপট আওয়াজ করিতে করিতে চাপ্ড়ে চাপ্ড়ে যেমন রুটি তৈয়ার করে, সেই রকম কেন কর্চ? ঠাকুর শুনিয়া হাসিয়া বলিলেন, “দূর শালা! আমি ঈশ্বরের নাম কর্চি,

শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গ

আর তুমি কিনা বলছ—আমি কুটি ঠুক্টি!” পুরীজীও ঠাকুরের বালকের গায় কথায় হাসিতে লাগিলেন এবং বুঝিলেন ঠাকুরের ঐরূপ অকুষ্ঠান অর্থশূন্য নহে; উহার ভিতর এমন কোনও গুঢ়-ভাব আছে, যাহা ঠাকুর কচিকর নয় বলিয়া তিনি ধরিতে-বুঝিতে পারিতেছেন না। উহার ঐরূপ কার্যে প্রতিবাদ না করাই ভাল।

আর একদিন সন্ধ্যার পর ঠাকুর পুরীজীর ধূনির ধারে বসিয়া আছেন। ঈশ্বরপ্রসঙ্গে ঠাকুর এবং গৌসাইজী উভয়ের মন

তোতাপুরীর খুব উচ্চে উঠিয়া অদ্বৈতজ্ঞানে প্রায় তন্ময়ত্ব
ক্রোধভ্যাগের অনুভব করিতেছে। পার্শ্বে ধক্ ধক্ করিয়া
কথা জলিয়া জলিয়া ধূনির অগ্নিমধ্যস্থ আত্মাও যেন

ঠাকুরের আত্মার সহিত একত্বানুভব করিয়া আনন্দে শত জিহ্বা প্রকাশ করিয়া হাসিতেছেন! এমন সময় বাগানের চাকরবাকর-দিগের একজনের তামাক খাইবার বিশেষ ইচ্ছা হওয়ায় কল্কেতে তামাক সাজিয়া অগ্নির জন্ত সেখানে উপস্থিত হইল এবং ধূনির কাঠ টানিয়া অগ্নি লইতে লাগিল। গৌসাইজী ঠাকুরের সহিত বাক্যালাপে ও অন্তরে অদ্বৈত ব্রহ্মানন্দানুভবেই মগ্ন ছিলেন, ঐ লোকটির আগমন ও ধূনি হইতে অগ্নি লওয়ার বিষয় এতক্ষণ জানিতেই পারেন নাই। হঠাৎ এখন সেদিকে লক্ষ্য পড়ায় বিষম বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে গালিগালাজ করিতে লাগিলেন—এমন কি চিম্টা তুলিয়া তাহাকে দুই এক ঘা দিবার মতও ভয় দেখাইতে লাগিলেন। কারণ পূর্বেই বলিয়াছি, নাগা সাধুরা ধূনিরূপী অগ্নিকে পূজা ও বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকেন।

গুরুভাবে নিজ গুরুগণের সহিত সম্বন্ধ

ঠাকুর পুরীজীর ঐরূপ ব্যবহারে অর্ধবাহুদশায় হান্তের রোল তুলিয়া তাঁহাকে বলিয়া উঠিলেন, “হুর্ শালা, হুর্ শালা!” ঐ কথা বার বার বলেন ও হাসিয়া গড়াগড়ি দেন। তোতা ঠাকুরের এই ভাব দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, “তুমি অমন করচ যে? লোকটির কি অণ্যায় দেখ দেখি?” ঠাকুর হাসিতে হাসিতে বলিলেন, “তা ত বটে, সেই সঙ্গে তোমার ব্রহ্মজ্ঞানের দৌড়টাও দেখচি। এই মুখে বল্ছিলে—ব্রহ্ম ভিন্ন দ্বিতীয় সত্তাই নেই, জগতে সকল বস্তু ও ব্যক্তি তাঁরই প্রকাশ, আর পরস্পরেই সব কথা ভুলে মানুষকে মারতেই উঠেছ। তাই হাস্ছি যে, মায়ার কি প্রভাব!” তোতা ঐ কথা শুনিয়াই গস্তীর হইয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন, পরে ঠাকুরকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “ঠিক বলেছ, ক্রোধে সকল কথা বাস্তবিকই তুলিয়া গিয়াছিলাম। ক্রোধ বড় পাজি জিনিস। আজ থেকে আর ক্রোধ করবো না, ক্রোধ পরিত্যাগ কর্ণুম।” বাস্তবিকই স্বামীজিকে সেদিন হইতে আর ক্রুদ্ধ হইতে দেখা যায় নাই।

ঠাকুর বলিতেন, “পঞ্চভূতের ফাঁদে ব্রহ্ম পড়ে কাঁদে—চোখ বুজে তুমি ‘কাঁটা নেই, খোঁচা নেই’ যতই কেন মনকে বুঝাও না,

মায়া কৃপা	কাঁটায় হাত পড়লেই প্যাঁট করে বিঁধে গিয়ে
করিয়া পথ	উছ উছ করে উঠতে হয়; তেমনি, যতই কেন
না ছাড়িলে	মনকে বুঝাও না—তোমার জন্ম নেই, মৃত্যু নেই,
মানবের	পাপ নেই, পুণ্য নেই, শোক নেই, দুঃখ নেই, ক্ষুধা
ঈশ্বরলাভ	নেই, তৃষ্ণা নেই—তুমি জন্ম-জরা-রহিত নির্বিকার
হয় না	

সচ্চিদানন্দস্বরূপ আত্মা, কিন্তু ঘাই শরীরে অসুস্থতা এল, ঘাই মন

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

সংসারের রূপ-রসাদি প্রলোভনের সামনে পড়ল, যাই কাম-কাঙ্ক্ষনের আপাত সুখে ভুলে কোন একটা কুকাজ করে ফেলে, অমনি মোহ, যন্ত্রণা, দুঃখ সব উপস্থিত হয়ে বিচার-আচার ভুলিয়ে একেবারে তোমাকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলবে! সেজন্য ঈশ্বরের কৃপা না হলে, মায়া দোর ছেড়ে না দিলে কারুর আত্ম-জ্ঞানলাভ ও দুঃখের নিবৃত্তি হয় না—জান্‌বি। চণ্ডীতে আছে শুনিস নি?—‘সৈবা প্রসন্ন বরদা নৃগাং ভবতি মুক্তয়ে’ অর্থাৎ মা কৃপা করে পথ ছেড়ে না দিলে কিছুই হবার যো নেই।”

“রাম, সীতা ও লক্ষ্মণ বনে যাচ্ছেন। বনের সরু পথ, এক জনের বেশী যাওয়া-আসা যায় না। রাম ধনুকহাতে আগে আগে

ঐ বিষয়ে

দৃষ্টান্ত—

রাম, সীতা ও

লক্ষ্মণের বনে

পর্যটনের

কথা

চলেছেন; সীতা তাঁর পাছু পাছু চলেছেন; আর

লক্ষ্মণ সীতার পাছু পাছু ধনুকবাণ নিয়ে যাচ্ছেন।

লক্ষ্মণের রামের উপর এমনি ভক্তি-ভালবাসা

যে, সর্বদা মনে মনে ইচ্ছা নবঘনশ্যাম রামরূপ

দেখেন; কিন্তু সীতা মাঝখানে রয়েছেন, কাজেই

চললে চলতে রামচন্দ্রকে দেখতে না পেয়ে ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। বুদ্ধিমতী সীতা তা বুঝতে পেরে তাঁর দুঃখে কাতর হয়ে চলতে চলতে একবার পাশ কাটিয়ে দাঁড়িয়ে বললেন, ‘এই দ্যাখ।’ তবে লক্ষ্মণ প্রাণভরে একবার তাঁর ইষ্টমূর্তি রামরূপ দেখতে পেলেন। সেই রকম জীব আর ঈশ্বরের মাঝখানে এই মায়ারূপিণী সীতা রয়েছেন। তিনি জীবরূপী লক্ষ্মণের দুঃখে ব্যথিতা হয়ে পথ ছেড়ে পাশ কাটিয়ে না দাঁড়ালে জীব তাঁকে দেখতে পায় না জান্‌বি। তিনি যাই কৃপা করেন,

গুরুভাবে নিজ গুরুগণের সহিত সম্বন্ধ

অমনি জীবের রামরূপী নারায়ণের দর্শন হয় ও সে সব যন্ত্রণার হাত থেকে এড়ায়। নৈলে, হাজারই বিচার-আচার কর না কেন, কিছুতে কিছু হয় না। কথায় বলে—এক একটি জোয়ানের দানায় এক একশটি ভাত হজম করিয়ে দেয়, কিন্তু যখন পেটের অস্থখ হয়, তখন একশটি জোয়ানের দানাও একটি ভাত হজম করাতে পারে না—সেই রকম জান্‌বি।”

তোতাপুরী স্বামীজি ৩৬জগদম্বার আজন্ম কুপাপাত্ত ; সংসংস্কার, সরল মন, যোগী মহাপুরুষের সঙ্গ, বলিষ্ঠ দৃঢ় শরীর বাল্যাবধিই লাভ করিয়াছিলেন। ভাগবতী মায়া জগদম্বার কুপার তাঁহার উচ্চাবস্থা— তোতা একথা বুঝেন নাই— তোতা তাঁহাকে কখন তাঁহার করাল, বিভীষিকাময়ী, মৃত্যুর ছায়ার গায় সর্বগ্রাসী মূর্তি দেখান নাই— তাঁহার অবিদ্যারূপিণী মোহিনী মূর্তির ফাঁদে তোতা কখন ফেলেন নাই, কাজেই গৌসাইজীর নিকট পুরুষকার ও চেষ্টাসহায়ে অগ্রসর হইয়া নির্বিকল্প সমাধিলাভ, ঈশ্বরদর্শন, আত্মজ্ঞান সব সোজা কথা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সে পথে অগ্রসর হইবার ষত কিছু বিঘ্ন-বাধা, যা যে সে-সব নিজ হস্তে সরাইয়া তাঁহাকে পথ ছাড়িয়া দিয়াছিলেন—একথা তিনি বুঝিবেন কিরূপে ? এতদিনে সে বিষয় পুরী স্বামীজিকে বুঝাইবার জগদম্বার ইচ্ছা হইল। এতদিনে তিনি মনের ঐ ভ্রম বুঝিবার অবসর পাইলেন।

পুরীজীর পশ্চিমী শরীর ; রোগ, অজীর্ণ, শরীরে শতপ্রকার অস্থস্থতা কাহাকে বলে তাহা কখন জানিতেন না। যাহা খাইতেন তাহাই হজম হইত ; যেখানেই পড়িয়া থাকিতেন

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

স্বনিদ্রার অভাব হইত না। আর ঈশ্বর-জ্ঞানে ও দর্শনে মনের
উল্লাস ও শান্তি শতমুখে অবিকার্য ধারে মনে
তোতাপুরীর
অস্থিত।
প্রবাহিত থাকিত। কিন্তু বাজালার জল, বাজালার
বাম্পকণাপূরিত গুরুভার উত্তপ্ত বায়ুতে ঠাকুরের
শ্রদ্ধাভালবাসায় মোহিত হইয়া কয়েক মাস বাস করিতে না
করিতেই সে দৃঢ় শরীরে রোগ প্রবেশ করিল। পুরীজী কঠিন
রক্তমাশয়-রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়িলেন। দিবারাত্র পেটের
মোচড় ও টন্টনানিতে পুরীজীর ধীর, স্থির, সমাধিস্থ মনও অনেক
সময়ে ব্রহ্মসত্তাব হইতে বিচ্যুত হইয়া শরীরের দিকে আসিয়া
পড়িতে লাগিল। ‘পঞ্চ ভূতের ফাঁদে’ ব্রহ্ম পড়িয়াছেন, এখন
সর্বেশ্বরী জগদম্বিকার কৃপা ব্যতীত আর উপায় কি ?

অস্থিত হইবার কিছুকাল পূর্ব হইতেই তাঁহার সতর্ক ব্রহ্মনিষ্ঠ
মন তাঁহাকে জানাইয়াছিল যে, এখানে শরীর ভাল থাকিতেছে
না, আর এখানে থাকা যুক্তিযুক্ত নয়। কিন্তু
তোতার
নিজ মনের
সঙ্কেত অগ্রাহ
করা
ঠাকুরের অদ্ভুত সঙ্গ ত্যাগ করিয়া শরীরের মায়ায়
তিনি চলিয়া যাইবেন ? ‘শরীর হাড়-মাসের
খাঁচা’—রস-রক্তপূর্ণ, কুমিকুলসঙ্কুল, দুই দিন মাত্র
স্থায়ী দেহ—যেটার অস্তিত্বই বেদান্তশাস্ত্রে ভ্রম বলিয়া নিদ্রিষ্ট
হইয়াছে, তাহার প্রতি মমতা-দৃষ্টি করিয়া তিনি কি না অশেষ-
আনন্দ-প্রসূ এই দেব-মানবের সঙ্গ সহসা ত্যাগ করিয়া যাইবেন ?
যেখানে যাইবেন সেখানেও শরীরের রোগাদি তা হইতে পারে ?
আর রোগাদি হইলেই বা তাঁহার ভয় কি ? শরীরটাই ভুগিবে,
কৃশ হইবে, বড় জোর বিনষ্ট হইবে—তাহাতে তাঁহার কি আসে

গুরুভাবে নিজ গুরুগণের সহিত সম্বন্ধ

যায়? তিনি তো প্রত্যক্ষ জানিয়াছেন, দেখিয়াছেন—তিনি অসঙ্গ নির্ঝিকার আত্মা, শরীরটার সহিত তাঁহার কোনও সম্বন্ধই নাই, তবে আবার ভয় কিসের? এইরূপ নানা কথা ভাবিয়া পুরীজী যনকে ব্যস্ত হইতে দেন নাই।

ক্রমে রোগের যখন সূত্রপাত ও কিছু কিছু যন্ত্রণার আরম্ভ হইল, তখন পুরীজীর স্থানত্যাগের ইচ্ছা মধ্য মধ্য প্রবলতর হইতে লাগিল। ঠাকুরের নিকট হইতে বিদায়

তোতার
ঠাকুরের
নিকট বিদায়
লইতে যাইয়াও
না পারা ও
রোগবৃদ্ধি

লইবেন ভাবিয়া কখন কখন তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন, কিন্তু অল্প সংপ্রসঙ্গে মাতিয়া সে কথা বলিতে ভুলিয়াই যাইলেন। আবার যদি বা বিদায়ের কথা বলিতে মনে পড়িল তো তখন যেন কে ভিতর হইতে তাঁহার সে সময়ের

জন্য বাক্য রুদ্ধ করিয়া দিল; বালতে বাধ বাধ করায় পুরীজী ভাবিলেন, ‘আজ থাক, কাল বলা যাইবে।’ এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে স্বামীজি ঠাকুরের সহিত বেদান্তালাপ করিয়া ঘুরিয়া-ফিরিয়া পঞ্চবটীতলে আসনে ফিরিলেন। দিন কাটিতে লাগিল। স্বামীজির শরীরও অধিকতর দুর্বল এবং ক্রমে রোগ কঠিন হইয়া দাঁড়াইল। ঠাকুর স্বামীজির শরীর ঐ প্রকার দিন দিন শুষ্ক হইয়া যাইতেছে দেখিয়া বিশেষ পথ্য ও সামান্য ঔষধাদি-সেবনের বন্দোবস্ত ইতিপূর্বেই করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতেও ফলোদয় না হইয়া রোগ বাড়িয়াই যাইতে লাগিল। ঠাকুরও মথুরকে বলিয়া তাঁহার আরোগ্যের জন্য ঔষধপথ্যাদির বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়া তাঁহাকে যথাসাধ্য সেবা-যত্ন করিতে লাগিলেন। এখনও

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

পর্যন্ত স্বামীজি শরীরেই বিশেষ যন্ত্রণানুভব করিতেছিলেন, কিন্তু চিরনিয়মিত মনকে ইচ্ছামাত্রেই সমাধিমগ্ন করিয়া দেহের সকল যন্ত্রণার কথা এককালে ভুলিয়া শান্তিলাভ করিতেছিলেন।

রাত্রিকাল—আজ পেটের যন্ত্রণা বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

স্বামীজিকে স্থির হইয়া শয়ন পর্য্যন্ত করিয়া থাকিতে দিতেছে

না। একটু শয়ন করিয়া থাকিবার চেষ্টা করিয়াই

মনকে আয়ত্ত

করিতে না

পারিয়া

তোতার গঙ্গায়

শরীর বিসর্জন

করিতে যাওয়া

ও বিশ্বরূপিণী

জগদম্বার

দর্শন

তিনি আবার উঠিয়া বসিলেন। বসিয়াও সোয়াস্তি

নাই। ভাবিলেন, মনকে ধ্যানমগ্ন করিয়া রাখি,

শরীরে যাহা হইবার হউক। মনকে গুটাইয়া

শরীর হইতে টানিয়া লইয়া স্থির করিতে না

করিতে পেটের যন্ত্রণায় মন সেই দিকেই ছুটিয়া

চলিল। আবার চেষ্টা করিলেন, আবার তদ্রূপ

হইল। যেখানে শরীর ভুল হইয়া যায়, সেই সমাধি-

ভূমিতে মন উঠিতে না উঠিতে যন্ত্রণায় নামিয়া পড়িতে লাগিল।

যতবার চেষ্টা করিলেন, ততবারই চেষ্টা বিফল হইল। তখন

স্বামীজি নিজের শরীরের উপর বিষম বিরক্ত হইলেন। ভাবিলেন

—এ হাড়-মাসের খাঁচাটার জ্বালায় মনও আজ আমার বশে নাই।

দূর হ'ক, জানিয়াছি তো শরীরটা কোনমতেই আমি নই, তবে এ

পচা শরীরটার সঙ্গে আর কেন থাকিয়া যন্ত্রণা অনুভব করি? এটা

আর রাখিয়া লাভ কি? এই গভীর রাত্রিকালে গঙ্গায় এটাকে

বিসর্জন দিয়া এখনি সকল যন্ত্রণার অবসান করিব। এই

ভাবিয়া 'ল্যাংটা' বিশেষ যত্নে মনকে ব্রহ্মচিন্তায় স্থির রাখিয়া

ধীরে ধীরে জলে অবতরণ করিলেন এবং ক্রমে ক্রমে গভীর

গুরুভাবে নিজ গুরুগণের সহিত সম্বন্ধ

জলে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কিন্তু গভীর জাগীৰ্থী কি আজ সত্য সত্যই শুকা হইয়াছেন! অথবা তোতা তাঁহার মনের ভিতরের ছবির বহিঃপ্রকাশে ঐরূপ দেখিতেছেন? কে বলিবে? তোতা প্রায় পরপারে চলিয়া আসিলেন, তত্রাচ ডুব-জল পাইলেন না। ক্রমে যখন রাত্রির ঘনাক্ষকারে অপর পারে বৃক্ষ ও বাটীসকল ছায়ার মত নয়নগোচর হইতে লাগিল, তখন তোতা অবাক হইয়া ভাবিলেন, 'একি দৈবী যাত্রা! ডুবিয়া মরিবার পর্য্যাপ্ত জলও আজ নদীতে নাই! একি ঈশ্বরের অপূৰ্ব লীলা!' অমনি কে যেন ভিতর হইতে তাঁহার বুদ্ধির আবরণ টানিয়া লইল। তোতার মন উজ্জ্বল আলোকে ধাঁধিয়া যাইয়া দেখিল—মা, মা, মা, বিশ্বজননী মা, অচিন্ত্যশক্তিরূপিণী মা; জলে মা, স্থলে মা; শরীর মা, মন মা; যত্নমা, সূস্থতা মা; জ্ঞান মা, অজ্ঞান মা; জীবন মা, মৃত্যু মা; যাহা কিছু দেখিতেছি, শুনিতেছি, ভাবিতেছি, করণা করিতেছি—সব মা! তিনি হয়কে নয় করিতেছেন, নয়কে হয় করিতেছেন! শরীরের ভিতর যতক্ষণ, ততক্ষণ তিনি না ইচ্ছা করিলে তাঁহার প্রভাব হইতে মুক্ত হইতে কাহারও সাধ্য নাই—মরিবারও কাহারও সামর্থ্য নাই! আবার শরীর-মন-বুদ্ধির পারেও সেই মা—তুরীয়া, নিওঁণা মা!—এতদিন যাহাকে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করিয়া তোতা প্রাণের ভক্তি-ভালবাসা দিয়া আসিয়াছেন, সেই মা! শিব-শক্তি একাধারে হৃদগৌরী মূর্তিতে অবস্থিত!—ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তি অভেদ!

গভীর নিশীথে তোতা ভক্তিপূরিত চিত্তে অগদম্বার অচিন্ত্য অসামান্য বিরাট রূপের রূপন করিতে করিতে গভীর অস্বাভবে

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

দিকসকল মুখরিত করিয়া তুলিলেন এবং আপনাকে তৎপদে
 সম্পূর্ণরূপে বলি দিয়া পুনরায় যেমন আসিয়াছিলেন
 তেমনি জল ভাঙ্গিয়া ফিরিয়া চলিলেন! শরীরে
 যন্ত্রণা হইলেও এখন আর তাহার অসুভব নাই।
 প্রাণ সমাধি-স্বতির অপূর্ব উল্লাসে উল্লসিত। ধীরে-ধীরে
 স্বামীজি পঞ্চবটীতলে ধূনির ধারে আসিয়া বসিয়া সমস্ত রাত্রি
 জগদম্বার নামে ও ধ্যানে কাটাইলেন।

প্রভাত হইলেই ঠাকুর স্বামীজির শারীরিক কুশল-সংবাদ
 জানিতে আসিয়া দেখেন যেন সে মাহুদই নয়! মুখমণ্ডল আনন্দে
 উৎফুল্ল, হাস্তপ্রস্ফুটিত অধর, শরীরে যেন কোন
 রোগই নাই! তোতা ঠাকুরকে ইঙ্গিতে পার্শ্বে
 বসিতে বলিয়া ধীরে ধীরে রাত্রের সকল ঘটনা
 বলিলেন। বলিলেন, রোগই আমার বন্ধুর কাজ
 করিয়াছে, কাল জগদম্বার দর্শন পাইয়াছি এবং তাহার কৃপায়
 রোগমুক্তও হইয়াছি। এতদিন আমি কি অজ্ঞই ছিলাম! বাহা
 হউক, তোমার মাকে এখন বলিয়া-কহিয়া আমাকে এ স্থান হইতে
 যাইতে বিদায় দাও। আমি এখন বুঝিয়াছি, তিনিই আমাকে
 এই শিক্ষা দিবার জন্ত এতদিন ঘুরাইয়া-ফিরাইয়া আমাকে এখানে
 আবদ্ধ রাখিয়াছেন। নতুবা আমি এখান হইতে অনেক কাল
 পূর্বে চলিয়া যাইব ভাবিয়াছি, বিদায় লইবার জন্ত তোমার কাছেও
 বার বার গিয়াছি, কিন্তু কে যেন প্রতিবারেই বিদায়ের কথা
 বলিতে দেয় নাই! অল্প প্রসঙ্গে তুলাইয়া, ঘুরাইয়া-ফিরাইয়া
 রাখিয়াছে। ঠাকুর শুনিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, “মাকে যে

গুরুভাবে নিজ গুরুগণের সহিত সম্বন্ধ

আগে মানতে না, আমার সঙ্গে যে শক্তি মিথ্যা 'বুট্' বলে তর্ক করতে ! এখন দেখলে, চক্ষু-কর্ণের বিবাদ ঘুচে গেল ! আমাকে তিনি পূর্বেই বুঝিয়েছেন 'ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ, অগ্নি ও তার দাহিকা শক্তি যেমন পৃথক নয়, তেমনি !'

অনন্তর প্রভাতী সুরে নহবৎ-ধ্বনি হইতেছে শুনিয়া শিব-
রামের স্তায় গুরুশিষ্য-সম্বন্ধে আবদ্ধ উভয় মহাপুরুষ উঠিয়া
জগদম্বার মন্দিরে দর্শনার্থ যাইলেন এবং শ্রীমূর্তির
তোতার সম্মুখে প্রণত হইলেন। উভয়েই প্রাণে প্রাণে
জগদম্বাকে সন্মুখে বুঝিলেন, যা তোতাকে এইবার এখান হইতে
যান। ও বিদায়গ্রহণ যাইতে প্রসন্ন মনে অনুমতি দিয়াছেন। ইহার
কয়েক দিবস পরেই তোতা ঠাকুরের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া
দক্ষিণেশ্বর কালীবাটী পরিত্যাগ করিয়া পশ্চিমে রওনা হইলেন।
দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীর ইহাই তাহার প্রথম ও শেষ দর্শন—কারণ
ইহার পর পুরী গোস্বামী আর কখনও এদিকে ফিরেন নাই।

আর একটি কথা বলিলেই তোতাপুরীর সম্বন্ধে আমরা যত
কথা ঠাকুরের শ্রীমুখে শুনিয়াছিলাম, তাহার সকলই প্রায়
পাঠককে বলা হয়। পুরী গোস্বামী 'কিমিয়া'
তোতার 'কিমিয়া' বিচার বিশ্বাস করিতেন। শুধু যে বিশ্বাস করি-
বিতার তেন তাহা নহে, ঠাকুরকে বলিয়াছিলেন তিনি
অভিজ্ঞতা ঐ বিচ্যাপ্রভাবে তাম্রাদি ধাতুকে অনেকবার
স্বর্ণে পরিণত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তোতা বলিতেন,
তাঁহাদের মণ্ডলীর প্রাচীন পরমহংসেরা উক্ত বিচ্যা অবগত
আছেন এবং গুরুপরম্পরায় তিনি উহা পাইয়াছেন। আরও

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

করিতেন, 'ঐ বিস্তারপ্রভাবে নিজের স্বার্থসাধন বা ভোগবিলাস করিতে একেবারে নিবেদ আছে, উহাতে গুরুর অভি-
বন্ধাত আছে। তবে মণ্ডলীতে অনেক সাধু থাকে, উহাদের
লাইয়া কখন কখন মণ্ডলীখরকে তীর্থ হইতে তীর্থান্তরে গমনাগমন
করিতে হয় এবং উহাদের সকলের আহাৰাদির বন্দোবস্ত
করিতে হয়। গুরুর আদেশ—ঐ সময়েই অর্থের অনটন হইলে
ঐ বিস্তার প্রয়োগ করিয়া উহাদের সেবার বন্দোবস্ত করিতে
পারি।'

এইরূপে ঠাকুরের গুরুভাবসহায়ে ভৈরবী ব্রাহ্মণী ও ব্রহ্মজ্ঞ
তোতাপুরী নিজ নিজ গন্তব্য পথে পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইয়া ধন্য
হইয়াছিলেন। ঠাকুরের অশ্রান্ত শিক্ষাগুরুগণও
উপসংহার
যে উহার সহায়ে এইরূপে অধ্যাত্মিক উদারতা
লাভ করিয়াছিলেন, সে বিষয়ও আমরা ইহাতেই বেশ অনুমান
করিতে পারি।

ওঁমিতি—

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ—গুরুভাবপর্বে

পূর্বার্ধ সম্পূর্ণ। ওঁ।

STATE LIBRARY

CALCUTTA

